দাম্পত্য কলহ

১

সঙ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ॥ ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬১

প্রচ্ছদ ঃ দেবাশীষ দেব

মুদ্রক ঃ
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি কলেজ রো, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

আমার পরমশ্রদ্ধেয়
মণ্টুদাকে
যাঁর জীবন সিদ্ধেশ্বরী মাকে
চির নিবেদিত

লেখকের অন্যান্য বই

সুখের দিন

ইতিহাসের মেকসিকোয়

অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে,
সায়াহ্নে মেঘডম্বরে,
দাম্পত্য কলহে চৈব
বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥

দুটো ছাগল শিঙে শিঙে খুব লড়ছে। ঠুস ঠাস। সামনের দুটো পা তুলে হুঁউ শব্দে নেমে আসে, মাথা বেঁকিয়ে পরস্পরে পরস্পরের মাথায় ঢুঁ মারছে। মনে হবে, রক্তারক্তি পরিণতি হল বুঝি; কিন্তু কিছুই হবে না। সামান্য পরেই দেখা যাবে, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আধবোজা চোখে জাবর কাটছে।

সেই রকম ঋষিশ্রাদ্ধ। বিরাট কাণ্ড হবে। এই আন, সেই আন। নানা ফিরিস্তি। শেষে দেখা যাবে কিছুই হল না তেমন — নমো নমো।

সন্ধ্যার মেঘ। আকাশ ছেয়ে এল। ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষ। প্রলয় বুঝি আসন্ন। দেখা গেল, দু চার ফোঁটা চোখের জলের মতো বৃষ্টিতে সব আয়োজন কাতর।

এই তিনের সঙ্গে তুলনীয় দাম্পত্য কলহ। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে; কি দিন তিনেক আগেই। সব কাজও চলছে কর্তার দাড়ি কামানো, রান্নাঘরে গিন্নির ছ্যাঁক ছোঁক। 'এই রইল চা।' ঠকাস। 'খেয়ে উদ্ধার করো।' ঘাড় না ঘুরিয়ে কর্তা - 'চা চাই না, নিয়ে গেলেই হয়, দোকানে পয়সা ফেললে কাপ কাপ চা।' গিন্নি দূর থেকে, 'আজ দুপুরেই বাপের বাড়ি চলে যাব, সংসার বুঝে নেওয়া হোক।' 'আমার একার সংসার! আমিও আজ চললুম। যার ম্যাও সেই সামলাক। যেতে হয়, তালা ঝুলিয়ে যাবে, আমার হলে তালা খুলে ঢুকবে। আমার পয়সাই তালা।' 'অসুখ করলে কে দেখবে?' 'ভগবান।' 'ভগবানের দায় পড়েছে। নেড়ি কুকুরে দেখবে।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দেখবে। মানুষের চেয়ে ঢের ভালো। দিল আছে, প্রেম আছে।' 'দেবে যখন খ্যাঁক করে প্রেম বেরোবে। তলপেটে চব্বিশটা।'

অন্তে: ঘনীভূত প্রেম। দাম্পত্য কলহ প্রেমের হাতুড়ি। পেরেক আরো গভীরে গিয়ে গেড়ে বসে। বরং,

মেষযুদ্ধে নৃপশ্রাদ্ধে,
প্রভাতে মেঘডম্বরে,
সাপত্ন্য কলহে চৈব,
লঘ্বারম্ভে বহুক্রিয়া ॥

ভেড়ার লড়াই, রাজার শ্রাদ্ধ, সকালের মেঘ, আর দুই সতীনের কলহ শুরুতে সামান্য, অন্তে কাটাকাটি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সাত টাকা বারো আনা

বেশ পাকা পকেটমাররাই মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রী হয়ে জন্মায়। এই মহাসত্য আমার অজানাই থেকে যেত যদি না আমি বিবাহ করতুম। এর মধ্যে আবার আর একটি সত্য আছে। সেটাও আমার আবিষ্কার। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মতই আকস্মিক। অথচ সাংঘাতিক। বেদান্ত বলেছেন সত্য গুহায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনতে হয়। যে স্বামী নাড়ুগোপালের মত হামা দিয়ে প্রাক-বিবাহ পর্বে স্ত্রীরূপী নাড়ুটিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরই এই ফাউ সত্যটি লাভ হয়। কি সেই সত্য! প্রেমিকা যদি স্ত্রী হয়ে জীবন-আঙিনায় নৃত্য করতে আসেন, তাহলে তিনি ত নেত্যকালী হবেনই, সেই সঙ্গে 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মত শুধু পকেটমার নন, চোরও হবেন। অনেকটা অ্যালসেসিয়ান চোরের মত। অ্যালসেসিয়ান চোর জিনিসটা কি? একটু ব্যাখ্যার দরকার। ছিঁচকে চোর আছে, সিঁদেল চোর আছে, যে বস্তুটি বলছি সেটি কি? অ্যালসেসিয়ানের ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি খুব প্রখর এবং বিশ্বস্ত। সেই অ্যালসেসিয়ান যদি চোর হয় তাহলে প্রেম করে বিয়ে করা বউয়ের মত হবে। এমন বউয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় বড় সাংঘাতিক।

বুক পকেটে সাত টাকা আর পাশ পকেটে বারো আনা। জামা ঝুলছে হ্যাঙারে। সংসার খরচের টাকা, আলুকাবলি, ঘুগনি, ফুচকা খাবার টাকা, সিনেমা দেখার টাকা, সবই সেই মহীয়সীর হাতে জমা করে দিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটা টাকায় লেংচে লেংচে আমার মাস চলে। লোকলৌকিকতা হলে সেই অর্থেও সংসার খাবলা মারে। তখন টিফিনে মুড়ি আর গুটিকয়েক বাদামদানা খেয়ে দিন চালাতে হয়। প্রেমের তুফানে অর্থনীতির নৌকোর তলা ফেঁসে গেছে। মনকে বোঝাই, ওরে মন, পস্তাও মাৎ, প্রেম বড় পবিত্র মাল। লায়লা-মজনুর কথাই স্মরণ কর। রামী-চণ্ডীদাসের কথা ভাব। বিল্বমঙ্গলের উদ্দেশে প্রণাম কর। প্রেম যুগে যুগে। পচা বাদাম চিবিয়ে মুখের বারোটা বেজে গেছে। কুছ পরোয়া নেহি। অধর সুধা পানে চাঙ্গা হয়ে যাবে।

অফিসবারে সকালের দিকেই যত ফ্যাঁকড়া বেরবে। হঠাৎ জগন্নাথবাবু আসবেন। বললেন, আচ্ছা মশাই সিমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আপনার কেউ জানাশোনা আছে? নেই! হেলথ ডিপার্টমেন্টে? তাও নেই! মোটর ভিহিকলস? তাও নেই! কি আছে আপনার? খালি আপনি আছেন আর আপনার ছায়া আছে? সমাজের কোনও কাজেই লাগবেন না? সমাজবন্ধু হতে পারেন না? ওয়ার্থলেস বাঙালী।

অথবা কাকে স্টেনলেস স্টিলের চামচে ঠোঁটে করে নিয়ে নিম গাছের বাসায় গিয়ে ছেলেকে পুডিং খাওয়াচ্ছে। একটু পেড়ে এনে দাও না গো। জীবনে যে টুলে উঠে বাল্‌ব পরাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয়ে মরে, সে উঠবে নিম গাছে! বলো কি ম্যাডাম! আহা তুমি উঠবে কেন? রকে গোবিন্দ বসে আছে। তাকে গোটা দুই টাকা দিলেই পেড়ে এনে দেবে।

বারো আনা দামের চামচের জন্যে দু'টাকা খরচ।

তা ত বলবেই। তুমি যে সোনার চামচে মুখে দিয়ে জন্মেছিলে! আমি বলে কত কষ্ট করে পাঁচ কেজি কাপড় কাচার গুঁড়ো কিনে চামচেটা ফিরি পেয়েছিলুম। সুন্দর চামচে! আমার চামচে!

তোমার চামচে ত কি হয়েছে, ওটা ত নেতার চামচে নয়। যে কাকে ..য়ে গেছে বলে, চলবে না, চলবে না করার লোক কমে যাবে!

মাদ্রাজী মহিলা হলে আমি তোমাকে আজই তালাক দিতুম। জান কি, তাদের স্টেনলেস স্টিলের প্রাণ। কিংবা, আমার সেই প্রেমাঙ্গিনী বাথরুম থেকে বিকচ্ছ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, ওগো শুনছ!

একি? তুমি যে হিন্দী ছবির নায়িকা হয়ে আছ, একেবারে সত্যম শিবম সুন্দরম্‌। সেনসার না কেটে ছেড়ে দিলে কি করে? এখুনি সামনের আসনের দর্শকরা যে সিটি মারবে!

আঃ রসিকতা রাখ। কি হবে?

হাউসফুল হবে।

রসিকতা কোরো না। সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার আঙুল থেকে এক ভরির আঙটিটা সিলিপ করে প্যানে পড়ে গেছে।

বাঁচা গেছে।

ওমা সে কি! আমার বিয়ের আঙটি! একবার দেখ না, হরিয়াকে যদি ধরতে পার। হাত ঢুকিয়ে বের করে এনে দিতে পারে কিনা দেখুক।

আজ সেই রকম একটা দিন। শ্যালক আসছেন শোলাপুর থেকে। তিনি চিংড়ির মালাইকারি ছাড়া আর কিছু খান না। ক্ষার সহযোগে খানছয়েক ফুলকো লুচি চলতে পারে। আর নতুন ফুলকপি উঠেছে। ভাপিয়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। শ্যালকের মালমশলা যোগাড় করতে গিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঝুলে গেল। তেড়েকুঁড়ে রাস্তায় বেরোতেই পিতার বয়সী শশাঙ্কবাবু গুপ্ত প্রেস আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে এক কূটকচালে প্রশ্ন করে বসলেন। গাদী খেলার কায়দায় ঝুল কেটে পালাতে চাইছি। পথ পাচ্ছি না। সাবেক কালের মানুষ, আমার চেয়ে ভাল খেলেন। কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে দিচ্ছেন না।

মুক্তি যখন পেলুম, তখন আর বাসে যাবার সময় নেই। এদিকে আজই ইনকামট্যাক্সের হিয়ারিং-এর দিন। অনেক চেষ্টায় একটা ট্যাকসি ধরে ফেললুম। আগে চাকরি, পরে খরচের হিসেব। গাড়িতে উঠেই মনে পড়ল, পকেটে পড়ে

আসে সাত টাকা বারো আনা। সাত টাকা বারো আনায় চার চাকায় চাপা যায় না। ঝাঁকামুটের চার্জও অনেক বেশি।

গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলুম। গোটা পঞ্চাশ টাকা পকেটে রাখা উচিত। যেতে হবে বাম্বুভিলা। সেখানেও কিছু পূজা অর্চনা আছে। আসতে আসতে পকেটটা একবার চেক করার ইচ্ছে হল। সাত টাকা আছে না গেছে। বুকপকেটটা আমি ইচ্ছে করেই হরেক রকম কাগজে ঠেসে রাখি। একে বলে 'অ্যান্টি-পকেটমার ডিভাইন'। টুক করে টাকা তুলে নোব, তা হবে না। বিশল্যকরণীর সন্ধানে জাম্বুবানের মত গন্ধমাদন ঘাড়ে করতে হবে। স্ত্রী মোরে করিয়াছে জ্ঞানী।

লন্ড্রির বিল বেরুচ্ছে, র‍্যাশানের ক্যাশমেমো, কোষ্ঠীর ছক; বাজারের হিসেব, যাবতীয় ভেজাল, সবই ঠিকঠাক বুক পকেটে বহাল, টাকা সাতটাই নেই। সর্বনাশ! পাশ পকেটেও তেমন ঝঙ্কার উঠছে না। আধুলি আর সিকি সরব দম্পতির মত সাড়া দিচ্ছে না। সিকি আধুলিকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তার মানে পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে কলকাতা শহরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বেরিয়েছিলুম। আমি কি নাগা সন্ন্যাসী। কুম্ভমেলায় নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াব। মেজাজের এই অবস্থাকেই বলে, বাবু একেবারে ফায়ার।

যে কেশদামে একদা হাত বোলাতে বোলাতে বলতুম চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, সেই কেশভারে তিনি চিরুনি চালাচ্ছিলেন বেশ আয়েস করে, আমাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন, একি ফিরে এলে?

ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ। হুম করে গলা দিয়ে বাঘের মত গর্জন বেরুল।

কি, বড় বাইরে পেয়েছে!

মাঝে মাঝেই আমাকে অসময়ে নিম্নচাপে কাহিল হয়ে ফিরে আসতে হয় ঠিকই, তবে আজ যে অন্য কারণ। দাঁত চেপে বললুম, আজ্ঞে না। সব ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছ, তোমার কি কোন কালেই আক্কেল হবে না, বলতে কি হয় যে, তোমার পকেট সাফ করে দিয়েছি।

বাইরে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে, শোবার ঘরে ঢুকে গুপ্তধন খুঁজছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন এক এক জায়গায় টাকা রাখি! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোমেলের ট্যাকটিস। একে বলে ম্যানুভার। যুদ্ধক্ষেত্রে আর সংসারে কোনও তফাৎ নেই। তিন পাট বিছানার যে-কোনও এক পাটে খামে ভরা গোটা কতক কুড়ি টাকার নোট থাকা উচিত। খাটের চার পাশ। চার পাশের কোন পাশে আছে? মাথার দিকে না পায়ের দিকে? ডান পাশে না বাঁ পাশে। প্রথম পাটে, না দ্বিতীয় পাটে, না তৃতীয় পাটে। সাত ঝামেলায় স্মৃতি এখন এতই বিপর্যস্ত, কিছুই মনে থাকে না। কোথায় টাকা রাখলুম ডায়েরীতে লিখে রাখতে হয়। কম্বিনেশান তালার কোডের মত। এক জায়গায় পর পর দুদিন ত আর রাখা যাবে না।

—কি খুঁজছ অমন হন্যে হয়ে বল না। হয়ত সাহায্য করতে পারি।

—থাক তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই, তুমি এখন সরে পড়।

—বিছানাপত্তর অমন ওলট-পালট করছ কেন ? বিছানায় ছারপোকা নেই।

—কি খুঁজছি তুমি ভালই জান। যদি সরিয়ে থাক, দয়া করে খামটা দিয়ে দাও। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—মাইরি বলছি আমি নিই নি। আমি নিলে বলে নি।

ভাল মানুষের মত মুখ করে তিনি সরে পড়লেন। এখন ডায়েরী ভরসা। সাত তারিখে রেখেছিলুম মায়ের ছবির পেছনে। আট তারিখে বিভূতি গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের আটশ পাতায়। ন তারিখে দেরাজের তলায়। দশ তারিখে কাপড়ের আলমারির তৃতীয় তাকে হলদে শাড়ির ভাঁজে। মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকতে হয়। ভুলেও ভাবতে পারবে না, তস্করের ডেরায় মাল সাজানো। এগার তারিখে বাথরুমে সেভিংসেটের ভেতরে। বারো তারিখে পুরনো খবরের কাগজের গাদায়। তেরো তারিখে রেকর্ডপ্লেয়ারের স্পিকারের তলায়। কাল কোথায় রেখেছি। মরেছে, কোনও এনট্রি নেই।

সারা ঘর তোলপাড়। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া। গাড়ি হর্ণ দিয়ে অধৈর্য প্রকাশ করছে। এখন তিনিই ভরসা। আমারই টাকা আমাকে চাইতে হবে ভিখিরির মত। এখন আর খোঁজার সময় নেই। পরে এক জায়গায় চোখ বুজিয়ে বসে ধীরে ধীরে ভাবতে হবে। অফিস থেকে এলুম, জুতো খুললুম, অবিনাশ বাইরের ঘরে বসেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। তারপর, তারপর কি হল ! দেশলাই কোথায়, বাতি কোথায় ? হই হই, রই রই। তারপর ? আর মনে পড়ছে না।

হ্যাঁগা, কোথায় গেলে ?

বলো, কি বলছ ?

গোটা কুড়ি টাকা দেবে ?

কোথায় পাব ?

কোথায় পাব মানে ! আজ ত সবে পনের তারিখ। সংসার খরচের টাকা নেই।

তোমাকে আমি টাকা দোব না। তুমি নিলে আর দিতে চাও না। শেষ মাসে বড় বিপদে পড়তে হয়। আগে দুচার টাকা এদিক ওদিক থেকে সরাতুম, পুষিয়ে যেত। এখন কোথায় যে রাখ খুঁজে পাই না।

ও এখন আর সরাও না ! আমার দু'টাকার নোটের বাণ্ডিল থেকে রোজই সরছে। জান কি, আমি নম্বর লিখে রাখি !

তোমার সন্দেহ বাতিক।

ও তাই নাকি। তাহলে সকালে সাত টাকা চার আনা সরল কি করে। ক্লিন হাপিস্। একবার বলার ভদ্রতাটাও হল না। পথে বেরিয়ে বিপদের একশেষ।

ভুলে গেছি। তুমি সব আনলে, একটু মিষ্টি আনলে না। ওই টাকায় মিষ্টি আসবে।

আবার হর্ষের শব্দ। কি টাকা তাহলে দেবে না?

দিতে পারি এক শর্তে।

ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে?

ও তো তোমার ঘড়ি নয়। বাবার দেওয়া।

বেশ, তাহলে আমার বাবার দেওয়া এই সোনার তাবিজ।

ওসব তাবিজ-মাবিজ নয়, কথা দাও আজ রাতেই ফিরিয়ে দেবে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, তোমার ওই ন্যাজে খেলা চলবে না।

বেশ তাই হবে। ফিরে এলে কান ধরে আদায় করে নেবে।

ট্যাকসিচালক বললেন, কি মশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি?

না না, ঘুমবো কেন? টাকা খুঁজছিলুম। কোথায় যে রেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

আপনি ব্যাগ ব্যবহার করেন না?

না।

ভালই করেন। ব্যাগ মানেই পকেটমার। ও হবেই হবে।

আমার আবার দু-জায়গাতেই ভয়, ভেতরে বাইরে।

আরে মশাই, ভেতরের পকেটেই রাখুন, আর বাইরের পকেটেই রাখুন, পকেটমারের হাত থেকে রেহাই নেই।

আমার বাড়িতেও পকেটমার হয়।

ছেলে বুঝি বড় হয়েছে! হিন্দী সিনেমা যতদিন না দেশ থেকে যাচ্ছে ততদিন বাপের পকেট গড়ের মাঠ হবেই।

ছেলে নয় মশাই, স্ত্রী। সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস।

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। ওকেই বলে খাল কেটে কুমির আনা। আপনি আমার মত করতে পারেন।

কি বলুন তো?

সেরেফ চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যেমন?

আপনিও চুরি করে ফাঁক করে দিন।

ও বাব্বা, সে একবার দুবার চেষ্টা করে দেখেছি। কোথায় যে রাখে! রান্না ঘরে শ'খানেক কৌটো। কোনটার মধ্যে যে মাল আছে, কে জানে?

ওদের টাকা রাখার ফিকসড কতকগুলো জায়গা আছে, যেমন মিটসেফ, চালের টিন। ছাড়া শাড়ির আঁচল। বালিশের খোল। একটু চেষ্টা করলেই সন্ধান পয়ে যাবেন।

আমি তো খুচরো পয়সা কোনোদিন চোখেই দেখতে পাই না। এই আছে, এই নেই।

খুচরো বাড়িতে ঢোকাবেন না। শেষ নয়া পয়সা শেষ করে বাড়ি ঢুকবেন। অন্যের হাতে যাওয়ার চেয়ে নিজের হাতেই যাওয়া ভাল! খরচ করার আর কোনও রাস্তা না পেলে শেষ দশ পয়সায় একটা ওজন নিয়ে নেবেন।

সময় বিশেষে অন্যের কাছে নিজের স্ত্রীর নিন্দে করতে পারলে মনটা বেশ হালকা হয়ে যায়। সর্বক্ষণ আমার সেই এক কাজ, নিজেকে অনুসরণ করা অবিনাশ। কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। দেশলাই, বাতি, আমার জামা ছাড়া তারপর পকেট থেকে টাকার খাম বের করে কোথায় রাখলুম। কোথায় যেন রাখলুম। বাথরুমে?

ইনকাম ট্যাকস অফিসার কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, খেয়াল করিনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মশাই ভাবসমাধি হয়ে গেল নাকি?

কি বলতে কি বললুম, কোথায় রেখেছি বলুন ত?

কি রেখেছেন? কালো টাকা? ধমকের সুর।

আজ্ঞে না, সাদা টাকা।

সাদা টাকা আর নেই। সবই কালো। কই দেখি, রেন্ট রিসিটটা দিন।

বাম্বুভিলা থেকে বেরিয়ে অফিসে আসার পথে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। নাও, বোঝো ঠ্যালা। ট্যাকসি ভাড়া মেটাবার পর পকেটে মাত্র ছটা টাকা পড়ে আছে। যাই হোক চটিটাকে টানতে টানতে এক মেরামতঅলার কাছে নিয়ে এলুম। আজকাল যা বাজার পড়েছে, দেড়টা টাকা খসে গেল। কোন কোন পেশায় মানুষের বিপদটাই হল মূলধন। চাপ দিয়ে রস বের করার মত, নিঙড়ে টাকা বের করে নাও। ট্যাকসের ফাঁড়া কাটতে না কাটতেই আর এক ফাঁড়া। ছেঁড়া চটি। চটি সারাতে বিদ্যুৎ চমকের মত পূর্ব রাতের জায়গা। কারুর বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে। আমার নিউকাট জুতোর শুকতলার ভেতরে। এমন একটা জায়গা অন্য কারুর কল্পনায় আসবে না। যাক, এখন আমার কাজে মন আসবে। ঘিনঘিনে চিন্তাটা চলে গেল। সারা মাসের রসদ। হারালেই হাতে হারিকেন।

সন্ধ্যের পরে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলুম। আসতে আসতে ভাবছি, শ্যালক মহারাজ এতক্ষণে তোফা চিঁড়ে, বাদাম ভাজা খাচ্ছেন। একটু পরেই ফুলকো লুচি চিংড়ির মালাইকারি। কিন্তু কোথায় সেই দশাসই ঘরজোড়া নয়নলোভন, ব্যাঘ্রলালাউৎপাদনকারী শ্যালক মহোদয়! আমার স্ত্রী রত্নটিই বা কোথায় গেলেন!

মানুর মা বললে, জামা কাপড় ছাড়ুন চা করে দিচ্ছি।

ওরা কোথায় গেল?

বউদিরা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। বেলাবেলিই গেছেন। ফিরে আসার সময় হয়েছে।

যাক বাবা, ওরা আসার আগে গুপ্ত স্থান থেকে টাকাটা বের করে রাখি। দেখতে পেলে হাসাহাসি করবে। জুতোর র‍্যাকে ছেঁড়াখোঁড়া জুতো, জুতোর

বাকসের অভাব নেই। এক জোড়া বাইশ শো বাইশ হাফ-বুট শ্যালকের মতই খুশ মেজাজে বসে আছে। কিন্তু আমার নিউকাট জোড়া কোথায় ? জুতো কি মালিক ছাড়াই বেড়াতে বেরিয়ে গেল !

মানুর মা, এখানে আমার এক জোড়া জুতো ছিল, কোথায় গেল জান কি ?

জুতো ! মনে হয়ে দাদাবাবু পরে গেলেন। বউদি আপনার ধুতি পাঞ্জাবি বের করে দিলেন, তারপর জুতোটা পায়ে গলিয়ে দাদাবাবু বললেন, বেশ ফিট করেছে। বউদি বললেন, তাহলে ওইটাই পরে চল। বেশ জামাই জামাই দেখাচ্ছে।

সেকি ? জুতো আর চশমা, হ্যাঁ আর একটি বস্তু, স্ত্রী, যার যার, তার তার, এই রকমেই ত শুনে এসেছি এতকাল। নয়া জমানায় স্ত্রী হাত পালটাপালটি হয়, আজকাল হামেশাই হচ্ছে। জুতোটা ফিট করেছে বলে পরে চলে গেল। যেমন বউ তার তেমনি ভাই। সব যেন গামছা হাতে জন্মেছে। গামছাবতার। লম্বা গলা দেখলেই লাগাও আর মারো টান। পঁয়তাল্লিশ টাকার জুতোর শুকতলায় পাঁচখানা কুড়ি টাকার নোট। জুতো ছেড়ে মন্দিরে ঢুকবে। জুতো চোর মুখিয়ে থাকবে। ধর্মের স্থানেই যত অধার্মিকের উৎপাত হয়ে গেল। একেই বলে গ্রহ। পেয়েও হারালুম।

সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটা বাজল। খবর শেষ হয়ে গেল। দুই মালের তবু দেখা নেই। গেছে ত গেছেই। মানুর মা বসে বসে ঢুলছে। দুধ ওতলানর মত একশো টাকার শোক মনে উতলে উতলে উঠছে। উদাসীনতার পাখার বাতাস মারছি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

পৌনে ন'টা নাগাদ গাড়ি থামার শব্দ হল ! উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। শ্যালকের জন্যে নয়, জুতোর জন্যেই উতলা হয়ে দরজা খুলে বাইরে ছুটে গেলুম। রোমান্সের সবুজ পাতা কবে শুকিয়ে ঝরে গেছে জীবন-তরু থেকে। চলতে গেলে মচমচ শব্দ হয় ! জীবনসঙ্গিনী না ফিরলেই সুখী হতুম। কেউ পারে নিয়ে যাক না। দিন কতক পরেই বাপ বাপ বলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আমার সেই জুতো জোড়ার মত। পরলেই ফোসকা। ভেসলিন, গ্লিসারিন, তুলো, সব হার মেনে গেল। জুতোয় টক দই, কেরোসিন, স্বভাব আর কিছুতেই নরম হয় না। প্রেমের কোন লক্ষণই নেই। যে জগাই মাধাই, সেই জগাই মাধাই। দেখলেই কলসির কানা ছোঁড়ে। শেষে জুতো বিশেষজ্ঞরা বললেন, ও মশাই খাঁটি গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই কিছু হবে না। পা গলিয়ে আর পিরিতের দরকার নেই। স্বভাব না যায় মলে। পরম ভট্টারকের জুতো করে তাকে তুলে রাখ। শান্তি পাবে। এক জোড়া চপ্পল কিনে নাও, আর লেংচে লেংচে চলতে হবে না। তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে ভেঙে যায় মা। জুতো তাকে তুলে রাখা যায়। বউকে তো আর তুলে রাখা যাবে না, ঠিক নেমে আসবে।

শ্যালক সূর্যবাবু নেমে আসছেন। আমার ধুতির ফুলপাড় কেমন ঝিলিক

মারছে। আমার নজর পায়ের দিকে। যাক জুতো জোড়া পায়েই আছে। শ্যালকের পেছন পেছন আমার সহধর্মিণী নামছেন। চলন বলন দেখে মনে হচ্ছে, বেশ বল পেয়েছেন। এমনিই খুব বলবতী। যখন বলতে শুরু করেন তখন আর সহজে থামান যায় না। এ ত আর প্রেস ফ্রীডম নয়। যে অর্ডিনানস করে চেপে দেওয়া যাবে। এ হল নারী স্বাধীনতা, যার শুরু আছে, শেষ নেই। বাপের বাড়ির লোক পেয়ে আজ একটু বেশি খরখর করছেন।

গাড়ি থেকে মালপত্তর নামছে ত নামছেই। বাবা কত কি কিনেছে। সারা দক্ষিণেশ্বরটাই কিনে এনেছে। ক্লিং করে মিটার তুলে গাড়ি চলে গেল। অন্ধকারে এবার তেমন দেখতে পাচ্ছি না। শ্যালকের পায়ে সেই জুতো জোড়াই ত?

সূর্যবাবু বললে, কি দেখছেন অমন করে! আপনার জুতো আমার পায়ে দারুণ ফিট করেছে। সেম সাইজ। আপনি বাঁ দিকে কেতরে চলেন, আমিও বাঁ দিকে কেতরে চলি। আপনিও প্রেমিক আমিও প্রেমিক। আপনি ফেঁসেছেন, আমি ফাঁসিনি।

স্ত্রী বললেন, ধরো, ধরো।

কাগজে মোড়া বেশ ভারি একটা কি হাতে এসে গেল। স্পর্শে মনে হচ্ছে, কাপ ডিশ। অনেক স্বামীই তোয়ালে জড়ান ছেলে ধরে, বোকা বোকা মুখে স্ত্রীর পেছন পেছন সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসেন। সামনে বেটার হাফ চলেছেন বুক ফুলিয়ে। বেশ মূল্যবান উপহার দিয়ে লোক যেভাবে বিয়ে বাড়িতে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। ইনিও সেই ভাবেই চলেছেন। আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতুম, আমাকেও নিদারুণ বুদ্ধুর মত দেখাচ্ছে। মন কেবলই উসখুস করছে, কখন তুমি জুতো জোড়া খুলবে, আমি অমনি তাক বুঝে নোট ক'খানা বের করে নোব। পায়ের চাপে ভেপসে কি অবস্থা হয়েছে কে জানে!

খাবার টেবিলের ওপর একে একে কেনা জিনিস সাজাতে সাজাতে আমার শ্যালকের বোন বললেন, আজ একেবারে প্রাণ খুলে কিনেছি। তোমার সঙ্গে বেরলে কেনাকাটা করে তেমন সুখ হয় না। যা কিনতে যাব তুমি অমনি বলবে, উঁহু, উঁহু, বাজে খরচ। এই দেখ কেমন কাপডিস কিনেছি। পাথরের চাকি বেলন। আঃ লুচি বেলেও সুখ। আজই উদ্বোধন হবে। এই নাও তোমার অ্যাশট্রে। আর এখানে সেখানে ছাই ফেলবে না। বুদ্ধ মূর্তিটা দেখ, আহা তুমি যদি ওই রকম শান্তশিষ্ট, ধ্যানস্থ হতে! সংসারের চেহারাই পাল্টে যেত। অমন গুলিখোরের মত মেজাজ করেছ কেন? বাইরে মনে হয় তোমার কোনও মেয়েছেলে আছে!

হ্যাঁ, এক মেয়েছেলেতেই চক্ষু চড়ক গাছ!

আমার মত মেয়ে তুমি পাবে না গো! পড়তে অন্যের পাল্লায়, হৃদয়ে হাফশোল লাগাতে হত। এই দেখ, দু ডজন চুড়ি কিনেছি, শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। এবার যখন তোমার সঙ্গে সেজেগুজে বেরব না, তখন দেখবে, চড়চড়

করে সকলের বুক ফাটবে। ফিস ফিস করে বলবে, দ্যাখ দ্যাখ, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

আমি বাঁদর!

মানুষের মত ত কিছুই দেখি না, সব সময় দাঁত খিচোচ্ছ।

স্বামীকে বাঁদর বললে কি হয় জান?

নরকে যেতে হয়। তোমার সঙ্গে সংসার করার চেয়ে নরকে গিয়েও সুখ। তোমার ড্যাঙোস আর খেতে পারি না। এই নাও তোমার ফুলদানি আর ধূপদানী। নাও হাত পাত। ভক্তি ভরে মায়ের প্রসাদ খাও, মনে মনে বলো, মা আমার স্বভাবটা একটু ভাল করে দাও মা। বলো, আমি যেন একটা মানুষ হতে পারি। অমানুষ করে রেখেছ মা!

হাতের তালুতে গোল মত একটা প্যাঁড়া বসিয়ে দিয়ে, তিনি হুট-পাট করে হেঁসেলে গিয়ে ঢুকলেন। আমার নয়, শ্যালকের বড় খিদে পেয়েছে।

শ্যালক সূর্যকান্তের জামা, কাপড়, জুতো ছাড়ার তেমন কোনও ইচ্ছেই দেখা যাচ্ছে না। এলিয়ে বসে আছেন সোফায়। বড় ক্লান্ত। মনটা বড় ছটফট করছে। জামা কাপড় না ছাড়ুক, জুতোটা অন্তত খোল! তোমার পদতলে আমার অর্থ দলিত হচ্ছে।

সূর্য, জামা কাপড় ছেড়ে, পাজামা পরে, মুখে হাতে জল দিয়ে বেশ ফ্রেশ হয়ে বোসো না। ভাল লাগবে। সূর্যকান্ত ডান থেকে বাঁ পাশে এলিয়ে পড়ে বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না জামাইবাবু। গেলুম ট্যাকসিতে, এলুম ট্যাকসিতে, কি আর এমন পরিশ্রম। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এত আমার নিজের বাড়ির মত।

প্রথম দিনেই তোমার তা হলে বেশ চোট হয়ে গেল! কি বল?

এইভাবেই খেজুরে আলাপে মনটা ঘুরিয়ে রাখি! কখন বাবু উঠবেন। কখন বাবু জুতো ছাড়বেন। বাবুই জানেন। বউয়ের ভাইয়ের হালচালই আলাদা। জামাইয়ের চেয়ে আদর বেশি। একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধের ভূত কান ধরে মোচড় মারবে।

সূর্যকান্ত একগাল হেসে বললেন, আমার একপয়সাও খরচ হয়নি। দিদি কার হাতে পড়েছে, দেখতে হবে ত! যেই টাকা বের করতে যাই, অমনি বলে, টাকার গরম তোর বউকে দেখাস!

মনে মনে বললুম, আচ্ছা, তাই নাকি? সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। সারা মাসের সংসার খরচ হাওয়ায় উড়ছে। যত টানাটানি রোজ মাছের বেলায়, একটু এদিক-ওদিক খাওয়ার বেলায়।

হেঁসেল থেকে আদরের সুর ভেসে এল। সূর্য জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। গরম গরম ভাজছি। আমার জন্যে কোনও মধুর নির্দেশ এল না। আমি ত কাঙাল। খেতে বোস, না হাত ধুয়ে বসে আছি।

দেখতে দেখতে বেশ রাত হয়ে গেল। চারপাশ নিশুতি। বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেলরে দিদি, বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেল, বলতে বলতে সূর্যকান্ত বেশ পরিতৃপ্ত বাঘের মত গোটাকতক হাই তুলে ফুলতোলা চাদরে লটকে পড়ল। বোন এলেন মশারি গুঁজতে! আমার ওপর হুকুম হল, ঘরের মশারিটা ফেলে ভাল করে গোঁজো, হাঁ করে বসে আছ কেন? দেখছ ত, আমি একটা কাজ করছি।

যো হুকুম! আমি তো আর তোমার শ্যালক নই!

দালানে ঘুটঘুট করে ঘড়ি চলছে। বাইরে সূর্যকান্তর নাক ডাকছে। আমার পাশে তার বোন যে ভাবে এলিয়ে আছে, মনে হচ্ছে জেগে নেই। এই তো সুযোগ। এই তো চোরেদের বেরবার সময়। যাই, নিজের টাকা, নিজেই চুরি করে আনি।

ডান পাটির সুখতলা তুলে ফেললুম। ফাঁকা। তবে কি বাঁ পাটিতে। সে পাটিতেও বিধবার হাহাকার। যাঃ টাকা নেই। মহারাজ হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই। মাঝরাতে পা ছড়িয়ে বসে আছি, সামনে দুপাটি নিউকাট। পেছন থেকে কাঁধের ওপর দুটো হাত এসে পড়ল। কে রে বাবা, ভূত নাকি!

না, আমার সহধর্মিণী।

কি গো, মাঝরাতেই জুতো পালিশ করতে বসলে কেন?

ঘুম আসছে না। তাই ভাবলুম কাজটা একটু এগিয়ে রাখি! সকালে তো একেবারেই সময় পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে, যেতে আসতে সূর্য তো এই জুতোটাই পরবে। বলছিল, পায়ে বেশ ফিট করেছে।

দেখেছ, প্রসাদের কি গুণ! তুমি কি ভাল হয়ে গেছ গো, শোনো, বৃথাই খুঁজছ, মাল আর ওখানে নেই। কাপ, ডিশ, অ্যাশট্রে, চুড়ি হয়ে গেছে। এ পিঠ ও পিঠ, দু পিঠ ট্যাকসি ভাড়া হয়েছে। গোটা পঁচিশ পড়ে আছে। কুড়ি টাকা আমার ধার শোধ। পাঁচ টাকা কাল সকালে তোমাকে দিয়ে দোব। জুতোর তলায় কেউ টাকা রাখে! ছিঃ! মা লক্ষ্মী। জুতোর তলায় চোরা চালানকারীরা সোনার বিস্কুট রাখে। চলো শোবে চল। ঝাড়তে গিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম।

তুমি জুতো ঝাড়তে গিয়ে, সারা মাসের হাত খরচ ঝেড়ে দিলে! আমার মাস চলবে কি করে?

ও তুমি ভেব না, যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামনি।

সূর্যর নাক গাঁক করে ডেকে উঠল।

আমি অদৃশ্য কাত্যায়নের দিকে কবজি তুলে ধরে মনে মনে বললুম, কাত্যায়ন নাড়ীটা একবার দেখ তো, বেঁচে আছি না মরে গেছি!

বাপের চা

তোর বাপের চা-টা নিয়ে যা।

রোজ সকালে রান্নাঘরের দিক থেকে এই কথাটি ছোট পাখির ডানার ঝাপটার মত উড়ে আসে। রমেন নিজের ঘরে কুটকুটে কম্বলের আসনে বসে শোনে। দিনের প্রথম কাকের ডাকের মত বউয়ের হাঁক-ডাক।

স্ত্রী নীপা মোটামুটি শিক্ষিতা, তবু কেন যে বাপ বলে। বাপ শব্দটার মধ্যে এমন একটা তাচ্ছিল্য আছে, শুনলেই গা রি-রি করে। বহুবার বলেছে, সোজা করে বলেছে, বাঁকিয়ে বলেছে, কোনোও কাজ হয় নি। নীপার দৃষ্টি-ভঙ্গি অনেকটা সরকারের মত, বিদ্যুৎ অথবা দুগ্ধসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মত, কি পুলিশ বিভাগের মত, চলছে চলবে। রমেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর কি হবে ভ্যাজার ভ্যাজার করে। জীবন তো প্রায় মেরে এনেছে। আর কটা বছর। পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ষাটে চাকরি থেকে বসে যাবে। বাষট্টিতে অথর্ব। তেষট্টিতে ফৌত। মিটে গেল ঝামেলা। সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছে। ফার্স্ট থিং ইন দি মরনিং, হাত-মুখ ধুয়ে চোখ বুজিয়ে ১০৮ বার। জপ করতে করতে কিছু কানে না আসাই উচিত। তবু এসে যায়। এই তো সবে হাতেখড়ি হয়েছে। জপ সিদ্ধ হতে সময় লাগবে। তাই কানে আসে— তোর বাপের চা-টা নিয়ে যা। শোনে, আর চমকে ওঠে। ভাবে, আহা ! সংসারে এই তার খাতির। মাসে প্রায় তিন হাজারের মত ঢালে। ঢেলে ঢেলে দেউলে হয়ে যাবার দাখিল। নিজের একজোড়া জুতো কিনতে হলে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গাদি খেলার অবস্থা। ঢুকবো কি ঢুকবো না। দু'পা যায় তো তিন পা পিছিয়ে আসে। নেশা করে কেনাকাটা করতে পারলেই ভালো হয়। যা হবার ঘোরে হয়ে যাক। একটা মারিজুয়ানার ট্যাবলেট খেয়ে দোকানে ঢোকো। জামা কেনো, জুতো কেনো, ছাতা কেনো যা সব দাম হয়েছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। অথচ ওপক্ষের মুখ থেকে কথা খসা মাত্র, শাড়ি, স্লিপার, শ্যাম্পু, সেন্ট, সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট, মায় সপ্তাহে একটি করে লটারির টিকিট এসে যাচ্ছে। অ্যাতো তেল ঢেলেও সংসারে স্নেহের বড় অভাব।

নীপাকে রমেন একদিন বুঝিয়ে বলেছিল, দ্যাখো আমি হলুম তোমার সেই রাজহংস, যে ডেলি একটা করে সোনার ডিম পাড়ে। আমাকে একটু স্নেহ-যত্ন করলে, তোমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হবে না গো।

নীপা উত্তর দিয়েছিল, তুমি আমার একটি অশ্ব। সারা জীবন অশ্বডিম্বই পেড়ে গেলে।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই। মাথা গোঁজার একটি আস্তানা আজও হলো না। আজও উত্তর ভারত, হিমালয় ঘোরা হলো না। হীরের একটা আংটির শখ ছিল হলো না। যাকে বিয়ে করব ভেবেছিলুম, তার বউয়ের ভাগ্য শুনবে? আমেরিকায় গিয়ে বসে আছে। বছরে একবার প্লেনে চেপে দেশে আসে। সেই ছেলে এখন বিশ হাজার টাকা মাইনে পায়।

আমেরিকা, বিশ হাজার! রমেন হাঁ হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ।

হাঁ-টা বুজিয়ে ফেল, বলে নীপা উঠে গিয়েছিল বিছানা থেকে।

আর একদিন রমেন বলেছিল, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলে না নীপা। নীপা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, দাঁত আজকাল বাঁধানো যায়, সে দাঁতে কড়মড় করে মাংসর হাড়ও চিবনো যায়।

রমেন অবাক হয়ে ভেবেছিল, সে মরলে, এই মহিলা শ্রাদ্ধের বদলে কি করবে? মনে হয় সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে।

রমেন জপ করে আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে অতীতের ঘটনায় চলে যায়। সেই সময় নীপার যে কথায় যে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাথায় আসে নি, এখন সেই সব মানানসই চোখা উত্তর খুঁজে বের করে। যতক্ষণ জপ-ধ্যান ততক্ষণই নীপার সঙ্গে মনে মনে ধুম ঝগড়া। শেষে বিরক্ত হয়ে আসন পাট করে উঠে পড়ে। ইষ্ট-দেবী আর গুরুদেবের ছবির সামনে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ভেউ ভেউ করে বলে, প্রভু, কিছুই হলো না, কিছুই হলো না আমার। কামিনী-কাঞ্চনে একেবারে লেবড়ে আছি।

গুরু বলেছিলেন, রমেন্দ্রনাথ, এইবার ধীরে ধীরে মনটাকে সংসার থেকে তুলে নাও। ঢুকে পড়েছ বেশ করেছ, বেরোবার কৌশলটাও এবার শিখতে হবে। সংসার বের করে দেবার আগে নিজে বেরিয়ে এসো সসম্মানে। সব সময় ভাববে, ওরা আমার কে! গালাগাল দিয়েই ভাববে ও শালারা, আমার কেউ নয়। মনে মনে গাইবে—

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
দু'চার দিনের জন্য ভবে
কর্তা বলে সবাই মানে
সেই কর্তারে দেবে ফেলে
কালাকালের কর্তা এসে।
যার জন্যে মরো ভেবে
সে কি তোমার সঙ্গে যাবে!
সে প্রেয়সী দেবে ছড়া
অমঙ্গল হবে বলে॥

রমেন কিছুক্ষণ, হায় প্রভু, হায় প্রভু করে, চারপাশে তাকিয়ে দেখে বাপের চা কেউ নিয়ে আসে নি। রান্নাঘরের সামনে, কেলে মিটসেফের মাথার ওপর স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে খোলা পড়ে আছে।

প্রত্যাশাই মানুষের দুঃখের কারণ। নীপা চা বয়ে আনবে না, জানা কথা, কিন্তু মেয়ে বুমার আনতে কি হয়! প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যায়? রান্নাঘরের দিকে যেতে আজকাল আর ইচ্ছে করে না। ওদের মুখ দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। অকৃতজ্ঞ স্বার্থপরের দল। নীপা মুখে জর্দাপান পুরে জদ্দন বাঈয়ের মত চাকা-পানা মুখ নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। যেন ভীমরুলের চাক। খোঁচালেই ঝাঁক ঝাঁক কথার ভীমরুল উড়ে আসবে। আর বুমা মনে হয় বিশ্বসুন্দরী হবার সাধনা করছে। সারা মুখে দুধের সর মেখে আয়নার সামনে এলোচুলে দাঁড়িয়ে। রমেনের কাছে সিক্রেট খবর আছে, বুমার দামড়া দামড়া অনেক ছেলে বন্ধু জুটেছে। তাই সব সময় কেমন একটা উড়ু উড়ু রোমাণ্টিক ভাব। আর ছেলে! তিনি তো পরহিতব্রতে ব্যস্ত। নাইবার, খাবার, লেখাপড়া করার অবসর নেই। তেনার আবার এক প্রেমিকা জুটে গেছে। শহরের সেই এলাকার রাস্তা জরিপের পুণ্য কর্তব্যে তিনি ব্রতী। গোঁফ আর চুলের চেকনাই নিয়ে ভীষণ বিব্রত। বোম্বের মডেলের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছে। প্রেম-সেবা করতে গিয়ে পিতা-মাতার সেবার তিলার্ধ সময় নেই।

স্টিলের গেলাসটা তুলে নিতে নিতে রমেন মেয়েকে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, এইটা আর এগিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না মা?

মেয়ে সুর করে বললে, তুমি তো আহ্নিক করছ বাবা?

এখনও করছি?

আহা করছিলে তো!

অন্য সময় নীপার সঙ্গে বুমার ঝটাপটি লেগেই থাকে। নীপা হয়তো বললে, কি রে, পটের বিবি হয়ে বসে আছিস, আটাটা মেখে দিয়ে একটু উপকার করতে কি হয়!

নীপার মুখের ওপর বুমার উত্তর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল, যাও তো তোমার কেবল বসে বসে হুকুম। আমি পারছি না, পারব না। নিজে মেখে নাও।

পারবি না?

না, না, না।

আচ্ছা, নিজের দরকারের সময় তুই আসিস আমার কাছে। তখন একেবারে অন্য সুর।

সংসারের কাজ নিয়ে, শাড়ি পরা নিয়ে, বিছানা করা নিয়ে, কলেজ থেকে সোজা বাড়ি না ফেরা নিয়ে দুজনে অনবরতই চুলোচুলি হচ্ছে। কিন্তু বাঙালী দল পাকাতে ওস্তাদ। যেই রমেন কিছু বলবে অমনি নীপা বুমার দলে।

নীপা বললে, তোমার ভণ্ডামি কোনদিন কতক্ষণ চলবে ও জানবে কি করে। তখন তো আবার কেউ ঘরে ঢুকলে পরেও পরে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।

রমেন বললে, ভণ্ডামি! ধ্যান, জপ ভণ্ডামি!

কার ধ্যান, কিসের ধ্যান সে তো আমি জানি।

এরপর আর কথা বাড়ানো চলে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন পেট আলগা হয়, সেইরকম মুখও আলগা হয়। নীপার মুখের এখন আর কোনও রাখঢাক নেই। মেয়ের সামনে নরক গুলজার না হওয়াই ভালো।

রমেনের একটা দুর্বলতা নীপা জানে। আর শেষমেশ সেইটা চেপে ধরেই নীপা জিতে যায়। মানুষের সব দুর্বলতাই গোটাকতক 'ম'-এর মধ্যে ঢুকে আছে। হয় এই 'ম' না হয় ওই 'ম'।

এক পাড়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি, একটা মেলামেশা গড়ে ওঠেই। কারুর সঙ্গে খুব হলায়-গলায়, কারুর সঙ্গে দেঁতো হাসি, আর প্রশ্নোত্তর, কি কেমন আছেন, ভালো আছি।

সাতাশ নম্বর বাড়ির হাসিদির সঙ্গে প্রথম হলায়-গলায় হয়েছিল নীপার। আসা-যাওয়া। তরকারি চালাচালি। একসঙ্গে সিনেমা দেখা। শাড়ি পাল্টাপাল্টি। রমেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কি কেমন আছেন-এর। একটু হাসি। প্রতি হাসি। রমেন মাঝে-মধ্যেই বউ ভালো মুডে থাকলে দু-একটা মন্তব্য করত, আহা এই বয়সেও হাসিদির চুল দেখেছ? হাসিদির রঙ দেখেছ? হাসিদির ঠমক দেখেছ? শাড়ি পরার ধরন দেখেছ?

মুড ভালো থাকলে নীপা বলত, যাও না, কাজল-টাজল পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দি রাতটা কাটিয়ে এসো। ভদ্রমহিলার স্বামী সপ্তাহে একবার বাড়ি আসেন। একটি মাত্র ছেলে হস্টেলে পড়ে।

আর-এক মুডে থাকলে তেড়ে উঠত, বউকে সেবা করতে জানলে ওইরকম ঠমক-ঠামকই থাকে। বউ আর বিলিতি কুকুর একজাতের জিনিস। তোয়াজে রাখতে হয় বুঝলে? তোয়াজে।

যার বরাতে যা ঘটে। রমেন একদিন গাড়ি করে বাড়ি ফিরছে। পথে হাসির সঙ্গে দেখা। বউবাজারের মোড়ে, বাস-স্টপে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। রমেনের ভেতরটা ছলকে উঠল। থার্মোমিটারের পারার মত ঝট ঝট করে বয়েস নেমে গেল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললে, উঠে আসুন। উঠে আসুন।

একগাল হেসে, গালে টোল ফেলে, শরীর দুলিয়ে, একপাশে বুকের আঁচল খসিয়ে, গাড়ি কাঁপিয়ে, হাসি রমেনের পাশে ধপাস করে বসল। ঘুরে দরজা বন্ধ করার সময় রমেনের গায়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল। ল্যাত্ করে খোঁপার ধাক্কা লেগে গেল নাকে।

সারাটা পথ হাসির হাসি, আর নানা গল্পে রমেন একেবারে মশগুল। হাসির আবার থেকে-থেকে মাইরি বলার অভ্যাস। তেমন মজার কথা হলে, যান বলে

দু-হাত দিয়ে ঠেলাও মারে। মাত্র আধ ঘণ্টার পথ, তার মধ্যেই নিবিড় আলাপ। কাঁধে কাঁধ লেগে গেল। হাতে হাত ঠেকল। মনের কথা, প্রাণের কথা। সিনেমা, থিয়েটারের শখের কথা। ভালো লাগার কথা। সব কথাই হলো। একবারও নীপার প্রসঙ্গ এলো না। দু-জনের কারুরই মনে রইল না, আলাপের সূত্রপাত নীপাকে দিয়েই। রমেনের কেবলই মনে হতে লাগল, তার বিয়ে-টিয়ে হয় নি।

হাসি বেশ চালাক মেয়ে। মাতাল কিন্তু তালে ভুল হয় না। বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে মোড়ের মাথায় বললে, আমাকে এইখানেই নামিয়ে দিন।

রমেন হাঁ হাঁ করে উঠল, কেন, কেন?

হাসি মুচকি হেসে বললে, কারণ আছে মশাই। আমাদের দু-জনকেই সংসার করে খেতে হবে।

সেই কেস গড়াতে গড়াতে প্রায় ফ্র্যাকচার-কেস হবার দাখিল। দুপুরে হাসি একদিন রমেনের অফিসে গিয়ে হাজির। অফিস থেকে কেটে সিনেমায়। সিনেমার পর রেস্তোরাঁ। পরে একদিন গঙ্গার ধার। তারপর একদিন ট্যাক্সি ভ্রমণ। রমেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলে আর খরচ করে।

আর রাতে শুয়ে শুয়ে নানা উদ্ভট পরিকল্পনা। হাসিকে নিয়ে দূর কোনোও দেশে পালিয়ে গেলে কেমন হয়। ইলোপমেন্ট। এই একঘেয়ে জীবন আর ভালো লাগে না। কোনোও রোমান্স নেই। অ্যাডভেঞ্চার নেই। বউ যেন টেরিলিনের প্যান্ট। ছেঁড়ে না, ফাটে না, ফুটো হয় না। মাঝে মাঝে সেলাই খুলে যায়। শেষের দিকে রঙটা একটু চটে যায়। না ফেলে দিলে, সারা জীবনই শরীরে লেপ্টে থাকবে।

সারা বিশ্বে স্ত্রীদের গুপ্তচর ছড়ানো থাকে। রমেন একদিন ধরা পড়ে গেল। পাড়াতুতো ঠাকুরপো এসে খবর দিয়ে গেল নীপাকে। দাদাকে দেখেছে, কলকাতার ভূতঘাটে বসে, হেসে হেসে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। কোলের কাছে হাসি বউদি।

রাতে রমেনের খুব ঝাড়ফুঁক হলো। নীপা তাড়াতাড়ি খাইয়ে স্বামীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দোরে খিল দিলে। রমেন ভাবলে, আহা অনেকদিন পরে আজ বুঝি প্রেম ওতলাল। এমন চাঁদিনী রাত! পিউ কাঁহা পাখি ফুকরোচ্ছে আকাশে।

আলো নিবল। তারপর ঝাড় কাকে বলে। বুড়ো দামড়া! প্রেম হচ্ছে, প্রেম! তুমি আমার পাঁঠা। ধড়ে কাটলে ধড়ে, ন্যাজে কাটলে ন্যাজে। ইয়ারকি পেয়েছ? নীপা ভয় দেখালে — আত্মহত্যা করে, পুলিশকে স্রেফ দুটি লাইন লিখে যাব। তখন বুঝবে, কত ধানে কত চাল। এই বউ মারার যুগে সোজা চালান হয়ে যাবে হাজতে। চোদ্দ বছর ঘোরাও ঘানি।

পরের দিন হাসিকেও ঝেড়ে এলো নীপা।

হয়ে গেল পরকীয়া। প্রেমের সমাধি তীরে রমেন বসে রইল মনমরা হয়ে।

স্ত্রী হলো মোচা, পরস্ত্রী হলো রেজালা। মনের দুঃখে রমেন শেষে দীক্ষা নিয়ে নিল। সংসার থেকে রমেনের মন উঠে গেছে। সে এখন হারিয়ে যেতে চায়। হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে দেখতে চায়, নীপা অ্যাণ্ড হার পার্টি কোন্ সুরে সানাই বাজায়! রোজ টিভিতে দেখে কত ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি কেমন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে! কোথায় যায়, কিভাবে যায়। টেকনিকটা কি? কাকে জিজ্ঞেস করে? লালবাজারের মিসিং পার্সন্স স্কোয়াডে লোক নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে যায়, সে কি একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ মশাই বলতে পারেন, কিভাবে হারিয়ে যেতে হয়?

সন্ধেবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে রোজই ভাবে, আজ চলার মুখটা ঘুরিয়ে দেবে। পারে না কিছুতেই। ভয় হয়, এই অচেনা পৃথিবী। কোথায় যাবে! কে দেখবে! তবু নীপা তাকে চেনে। সে নীপাকে চেনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, নীপাকে সে ভালোই বাসে। লঙ্কা না পড়লে তরকারীর রঙ খোলে না, স্বাদ আসে না। রোজ সকালে, বিশ বছরের পরিচিত গলায়, ওরে তোর বাপের চা-টা নিয়ে যা—না শুনলে মনেই হয় না বেঁচে আছে, আর একটা দিন শুরু হয়েছে।

বড়ি ও শ্বশুরমশাই

'এই শীতকাল, এমন মিঠে রোদ, একটু বাড়িটড়ি ত দিতে পার।' ডাল দিয়ে ভাত চটকাতে চটকাতে অসীম ব্যাজার ব্যাজার মুখে কথা ক-টা স্ত্রীকে মিহি করে বলল। হুকুম-টুকুম নয়। একটা সামান্য অভিলাষ। এইটুকু বলে থেমে থাকলে ক্ষতি ছিল না। সে আর একটু এগিয়েই বিপদ ডেকে আনল। 'মাও গেছেন খাবার বারোটাও বেজে গেছে।'

মনোরমা মাথা নীচু করে সরষের তেল দিয়ে আলুভাতে মাখছিল। মুখ না তুলেই বলল, 'রাখো রাখো, মা যে তোমাকে রোজ পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়াতেন তা আমার দেখা আছে। মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাটানি কোর না।'

'হ্যাঁ, মায়ের কথা বললেই ত তোমার গায়ে জ্বালা ধরবে। সেই লাস্ট নাইনটিন সেভেনটি সেভেনে একবার নারকোল, ছোলাটোলা দিয়ে মোচা হয়েছিল, সেভেনটি ফাইভে হয়েছিল থোড়। তারপর থেকে লাগাতার চলছে, ভাত, ডাল, আলুভাতে, মাছের ঝাল; মাছের ঝাল, আলুভাতে, ভাত, ডাল। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।'

'আমারও।'

'হ্যাঁ আমার যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও তাই হবে। শুধু হবে না, ডবল ডোজে হবে। বেশ কৌশল শিখেছ। তোমার ঘেন্না ধরার কারণটা কি ?'

'কেঁচো খুঁড়তে যেও না সাপ বেরোবে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। মোচা, নারকোল, থোড় না নিয়ে এলে আমি কি জন্ম দেবো ?' ধপাস করে আলুভাতের একটা টেনিস বল পাতে ফেলে দিয়ে মনোরমা উঠে গেল। রান্নাঘরে গনগনে উনুনে মাছ ভাজা হচ্ছে। সাঁড়াশি দিয়ে কড়াটা উনুন থেকে উপড়ে নিয়ে এল। গরম তেলে মাছ বিজবিজ করছে মনোরমার মেজাজের মত। একবার যদি সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া দুম করে মেঝেতে পড়ে মনোরমার ঠোঁট ফসকে বেরোনো বাক্যের চেয়েও অসীম আহত হবে। বড় ভয় পায় এই মুহূর্তকে। মনোরমা থালার সামনে উবু হয়ে বসে ভীত অসীমের পাতে একটি চারাপোনা ফেলে দিল। ন্যাজের দিকটা নুনের ওপর গিয়ে পড়ল। ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ আগের কথার যে উত্তরটা মনে মনে মকশ করছিল তা বলা যেতে পারে।

'গর্ভে মোচা ধারণ করতে গেলে কলা গাছের বীজ চাই, সে কথা আমি জানি ; কিন্তু ওই তিন বস্তু বাজারের ঝোলা থেকে বেরোলে তোমার মুখ ত তোলো হাঁড়ির মত হবে। এ ত আর তোমার ড্রেসিং নয়। ঘাড়ে পাউডার, ভুরুতে পেন্‌সিল, কপালে কুমকুম। মোচা ড্রেস করার একটা আলাদা আর্ট আছে। সে আমার মা জানতেন।'

কড়াটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মনোরমা বললে, 'হ্যাঁ তোমার মা সব জানতেন। কবিরাজের মেয়ে ছিলেন ত। শেকড়-বাকড়, পাতা-মাতা, কচু-ঘেঁচু।'

'আর তুমি হলে অ্যালোপ্যাথের মেয়ে মাছ, মাংস, লিভার পিলে।'

'আমি কার মেয়ে সে ত ভালো করেই জানো। অত ঠেস দিয়ে কথা বলার কি আছে ? ডাক্তারের মেয়ে হলে তোমার মত মোচা-খেকোর গলায় কি আর মালা দিতুম। টাকার জোরে ব্যারিস্টার জুটত।'

অসীম হেসে ফেলল। দুজনের ঝগড়া এই ভাবেই শুরু হয়ে হাসিতে শেষ হয়। মনোরমা বড় ভাল মেয়ে। একা সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে। সহজ সরল মেয়ে। বেশি খাটাতে চায় না বলে অসীম সাবেক কালের খাবার ফ্যাচাং বাড়িতে ঢোকাতে চায় না আবার সুযোগ পেলে বলতেও ছাড়ে না।

অসীম অফিস চলে গেল। মনোরমা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ঠিক করে ফেলল, যা থাকে বরাতে আজ সে সারা দুপুর বসে বসে বড়ি দেবে। কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার ! ডাল বেটে, নুন দিয়ে ফেটিয়ে একটা সাদা কাপড়ের ওপর টুকুস টুকুস করে পেড়ে যাওয়া। সমস্যা নাক নিয়ে। নাক উঁচু উঁচু না হলে বড়ি দেখে নাক-উঁচু মানুষের মন ভরে না। থ্যাবড়া নাকী মেয়ে যেমন বিয়ের বাজারে অচল, চ্যাপ্টা নাক বড়িও তেমনি সমঝদারের সমালোচনার বস্তু।

শঙ্করীর মা বাড়িতে কাজ করে। সেই হল মনোরমার উপদেষ্টা। উপদেষ্টা

বললে, 'আজ ত হবে না মা। ও রাতের বেলা ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে বাটতে হবে। তুমি আজ ভিজিয়ে রেখ, কাল সকালে আমি বেটে দেব।' কাল মানে রবিবার। সেই ভাল। রবিবার ছুটির দিন। অসীমের সাহায্যও পাওয়া যাবে।

রবিবার বেলা একটা নাগাদ ডালবাটা রেডি হয়ে গেল। কালো জিরে ভাজছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ। এইবার শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ডুরে শাড়ি পরে মনোরমা ছাদে বসে বড়ি দেবে।

'তোমার এই ধুতিটা নিচ্ছি।'

অসীম লাফিয়ে উঠল, 'কেন ? আমার ওই সাধের নতুন ধুতিটা তোমার কোন কম্মে লাগবে ?'

'বড়ি দোব।'

'বড়ি দেবে আমার ধুতিতে ? মামার বাড়ি ! নিজের শাড়িতে দাও।'

'আটপৌরে নতুন শাড়ি নেই। তোলা শাড়ি একটা দেড়শো-দুশো টাকা দাম। সোনার বড়ি হলে দেওয়া যেত। ডালের বড়ি কি ফুল ভয়েলে দেওয়া যায় ?'

'তাহলে বিছানার চাদরে।'

'চাদরে ? অপবিত্র জিনিস। তোমার কোনও ভয় নেই। বড়ি খুলে নিয়ে কেচে দোব, ইস্তিরি করে নিলেই যেমন নতুন তেমনি নতুন। ধুতিটা ত পড়েই থাকে। তুমি ত প্যান্ট আর পাজামা পরেই সারা জীবন কাটালে।'

রাজি না হয়ে উপায় কি ! বড়ির হুজুক সেই তুলেছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ সার সার বড়ি অসীমের কাঁচি ধুতির ওপর থেবড়ে থেবড়ে বসে গেল। তেমনি টিকোলো নাক সবকটার হল না। শঙ্করীর মা জ্ঞান দিলে, 'ভগবানের সৃষ্টিতেই মা কত খুঁত। মানুষের হাতে সব কি সমান হয়। পাড়া বড়ির নাক ধরে আর টানাটানি করুনি ; জন্মের পর মানুষেরই আর কিছু করা যায় না। এ-তো ডালের বড়ি।'

বড়ির পুংলিঙ্গ বড়া। কিছু বড়া হল, কিছু বড়ি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। মনোরমা এসে অসীমকে বললে, 'এই যে মশাই। তোমার কাগজপত্র নিয়ে ছাতে উঠে যাও। ইজিচেয়ার পেতে বসে বসে পড় আর বড়ি পাহারা দাও।'

'যথা আজ্ঞা।' ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে অসীম কাগজ পড়ছে। কিছু দূরেই কাপড়ে সত্যাগ্রহীর মত বসে আছে সার সার বড়ি। মিঠে রোদ, মিষ্টি হাওয়া, পাখির ডাক। কেমন যেন ঘুম এসে যাচ্ছে। চোখ জুড়ে আসছে। দু-একটা কাক মাঝে মাঝে পাশে হেঁটে হেঁটে খড়খড় করে বড়ি ঠোকরাতে আসছে।

অসীম হুস করলেই উড়ে পালাচ্ছে। এ এক ভাল জ্বালা যা হোক। একেই কি বলে, যমে মানুষে টানাটানি। কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়। অসীমের চোখ বুজতে বুজতে বুজেই গেল।

মনোরমার চিৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। 'এ কি ? আমার বড়ি কোথায় ?' মনোরমার হাতে বিকেলের চা। অসীম চোখ মেলে দেখলে, ফাঁকা ছাদ। কোথাও বড়ির নামগন্ধ নেই।

'তুমি তুলে নিয়ে গেছ।'

'তুলে নিয়ে যাব কি! ভাল করে শুকনোই হল না।'

'ভৌতিক ব্যাপার ত ? আচ্ছা রসিকতা! আর কেউ এসেছিল ?'

'কে আবার আসবে ? তোমাকে পাহারায় রেখে গেলুম তাহলে কি জন্যে ?'

'কাকের ত এত ক্ষমতা হবে না দশহাত ধুতি ঠোঁটে করে নিয়ে পালাবে।'

'পারে, ওরা সব পারে। এক সঙ্গে একশো কাক ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে...।' মনোরমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'ওই দেখ ? আমগাছের ডালে ওটা কি ঝুলছে।'

অসীম আমগাছের মগডালের দিকে তাকাল, সাদা একটা কাপড় ঝুলছে।

'হ্যাঁ, ওই ত তোমার সেই বড়ি। ওই ত আমার সেই নতুন কাপড়। ওখানে গেল কি করে ?' হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পাতার আড়ালে তিনি বসেছিলেন ন্যাজ ঝুলিয়ে। কাঁপড়-সমেত এ ডাল থেকে ও ডালে লাফ মারলেন, হুপ করে।

'আরে এ ত সেই বীর হনুমানটা।'

'আমার কাপড়! সর্বনাশ হয়ে গেল মনোরমা। টেনে টেনে ফর্দাফাঁই করে দিলে।'

'আমার বড়ি ? আমার এতক্ষণের পরিশ্রম। মুখপোড়া হনুমানে খেয়ে নিলে! কার জন্যে বড়ি দিলুম আর কার ভোগে গেল!'

'একছড়া কলা আনো, কলা। কাপড়টা অন্তত উদ্ধার করি।'

'কলা কোথায় পাব ?'

'তাহলে ?' তাহলে, দু-জনে ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সাধ্যসাধনা করলে। 'হে বাবা রামের বাহন! হে পবনসুত। হে বাবা গান্ধীজীর চেলা। হে ভগবান হনুমান।' হনুমানের কোনও সুমতি দেখা গেল না। অসীম রেগে বলল, 'ঠিক আমার শ্বশুরমশাইয়ের মত একগুঁয়ে।'

'অ্যাঁ, কি বললে ?'

'তখন তোমাকে কি বলেছিলুম ? কাপড়ে দিও না। কাপড়ে দিও না। শুনলে ?'

'কে বড়ি বড়ি করে লাফিয়েছিল ?'

'ওই যে আমার শ্বশুরমশাই কাঁচি ধুতি পরে খাচ্ছেন।'

আবার ভীষণ ঝটাপটি হয়ে গেল দু-জনে। আর সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ধুতিটা আমগাছের ডালে ঝুলে রইল একটা সিজন ধর্মঠাকুরের নিশান হয়ে।

অনশন

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। ধারালো ছুরির ফলা নিয়ে ঘ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর করলে হাত কেটে যায়। বোমা নিয়ে লোফালুফি করলে ফেটে যায়। এইসবই হল ব্যবহারিক জ্ঞান। মানুষ হাতে-নাতে শিখে ফেলে। বই পড়ার দরকার হয় না। মানুষ বিয়ে করে। করে করে শেখে। অনেক কিছু শেখে। নানা রকমের ফুল, লতাপাতা, গাছ আছে। এক একরকম বর্ণ, গন্ধ। যেমন বিছুটি। লাগলেই চুলকোয়। যেমন লঙ্কা, চিবোলেই ঝাল। সেই রকম আমার অর্ধাঙ্গিনীর স্বভাব হল, কিঞ্চিৎ রাগপ্রধান। তা সঙ্গীতের যেমন বিভিন্ন ধারার রাগপ্রধানও আমাদের ভাললাগে, সেইরকম রাগপ্রধান স্ত্রীকেও আমরা আমাদের জীবনে সইয়ে নি। সাবধানে নাড়াচাড়া করি। করলেও দু-একবার বেসামাল হয়ে যেতে পারেই ; তখন ভুলের মাশুল দিতে হয়। ভুল করাই তো মানুষের ধর্ম।

অ্যামোনিয়ার বোতলের গায়ে লেখা ছিল--কোনওক্রমে চোখে দু-এক ফোঁটা যদি ছিটকে লাগে, তাহলে চোখে ঠাণ্ডা জলের প্রচুর ঝাপটা মারবে। কি হলে, কি করতে হবে জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়। অনেক দিন এই-সংসার করার ফলে, ফেটে গেলে কি করতে হয় আমার জানা হয়ে গেছে, আর কি করলে ফাটবে তাও জানি। লেজ ধরে টেন না। বাঘের একটা লেজ। আমার স্ত্রীর অনেক লেজ। বড় লেজ হল, শ্বশুরবাড়ির লেজ। শ্বশুরবাড়ির কারোর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা চলবে না। সে বাড়ির ইট ভাল, পলেস্তারা ভাল, এমন কি সিড়িঙ্গে বেড়ালটাও আসল কাবুলি বেড়াল। শ্বশুর মশাইয়ের গোঁফ জোড়া, একেবারে খোদ স্ট্যালিনের গোঁফ। হাসিটা মোনালিসার পুংঃসংস্করণ। শ্বশ্রূমাতার ধরাধরা গলায় পারস্যের বুলবুল। তাঁরা দানধ্যানে কর্ণ, জ্ঞানে ভীষ্ম, ধর্মে যুধিষ্ঠির, বীরত্বে অর্জুন। শ্যালক শ্রীকৃষ্ণ। আমার নিজের ধারণা সকলেই অল্পবিস্তর পাগল। দিনে রাতে এক একজন বার চারেক স্নান করে। একই সযে, টি ভি, রেডিও-প্লেয়ার ও হইচই গল্প বলে। সকলেই বলতে চায়, কেউ কিছু শুনতে চায় না। যে কেউ যখন খুশি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আবার জেগে থাকার মেজাজ এসে গেলে বিছানার সঙ্গে তিন রাত কোনও সম্পর্ক থাকে না। সকলেরই স্বাস্থ্য বাতিক। অসুখ হবার আগেই ওষুধ খেয়ে বসে থাকে। সব ভিটামিন-পাগল। শীতকালে খরগোসের মত বাঁধাকপি আর গাজর কাঁচা চিবোয়। কথায় কথায় সকলকে উপদেশ—খুব শাক-সব্জি খাও, গ্রিন ভেজিটেবলস। ফলে এই হয়েছে, নিমন্ত্রিতদের ভাবতে হয়—ওই বাড়িতে পাত পাতবে কি না!

সবাই তো আর ছাড়া গরু নয়, যে আস্ত একটা বাগান খেয়ে ফেলবে! শ্বশ্রূমাতা একটার সময় আহারে বসে দুটোর সময় ওঠেন—চিবিয়ে যাচ্ছেনতো, চিবিয়েই যাচ্ছেন, ডাঁটা। শ্যালক শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতে বলতে ব্যায়াম করে। কব্জি ঘোরাচ্ছে, ঘুরিয়েই চলেছে। এদিকে কথাও বলছে। রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করছেন, কে কেমন আছে। ওই পাঁচটা মিনিটও যেন বৃথা না যায়—পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে দেহটাকে ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। পায়ের গুলির ব্যায়াম। যিনি কথা বলছিলেন অবাক হয়ে বলছেন—'ওরকম করছ কেন?' শ্যালক বলবে—'আপনি বলে যান। মাইন্ড করবেন না।' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসবে। হঠাৎ গোটাপঞ্চাশ বৈঠক মেরে দিলে ঝপাঝপ্। ডেনটিস্টের চেম্বারে বসে আছে, হঠাৎ কি মনে হল পায়ের ব্যায়াম করতে গিয়ে সেন্টার টেবিল উল্টে গেল। ম্যাগাজিন-ফ্যাগাজিন সব ছত্রাকার। অন্য যাঁরা বসেছিলেন. তাঁরা শুধু অবাক হলেন না বিরক্তও। একগাল হেসে বললে, 'লেগ-স্ট্রেট করতে গিয়ে উল্টে গেল।' 'আমরা মরছি দাঁতের যন্ত্রণায় আর আপনি করছেন লেগ-স্ট্রেট।' 'আজ্ঞে, আমারও তো একই অবস্থা। দাঁত থেকে পায়ের দিকে মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছিলুম আর কি!'

সকলেরই যে মাথার স্ক্রু ঢিলে তার প্রমাণ. আমার সহধর্মিণীকে একবার পাগল বললেই হল। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তখন একেবারে অন্য চেহারা। নাকের পাতা ফুলে উঠল। চোখ-মুখ লাল। তখন বয়েসটাও যেন কমে যায় অনেক। রাতের সমুদ্রের ফসফরাসের মত দেহ-ত্বক জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আমি ভুলেও পাগল বলি না। স্বামী হলেও বোকা-পাঁঠা নই। কি থেকে কি হয়, আমার সব জানা আছে। আমি জানি, স্ত্রী হল চীনে মাটির বাহারী ফুলদানি। সেই ফুলদানিতে জীবনের যত দুঃখসুখের ফুল সাবধানে সাজিয়ে রাখতে হয়। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে ইয়ার্কি চলে। ইয়ার্কি চলে পুলিস-সার্জেন্টের সঙ্গে। এমনকি চিড়িয়াখানার বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে চুমখুড়ি মারা যায়; কিন্তু ইয়ার্কি চলে না স্ত্রীর সঙ্গে। সব সময় মন যুগিয়ে চলতে হয়। খুশ মেজাজে রাখতে হয়। দেশলাই কাঠি আর খোলের সম্পর্ক বেশি ঘষলেই ফ্যাঁস। মাঝে মধ্যে পাগল বলে তারই পেটের ছেলে। একালের শ্যায়না ছেলে, সে পিতা স্বর্গও বোঝে না, বোঝে না জননী জন্মভূমিশ্চ। তার স্বার্থে ঘা লাগলেই সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়, আর রোজ হয় প্রাতে না হয় সায়াহ্নে মায়ের সঙ্গে বাক্য-যুদ্ধ লাগবেই লাগবে, আর ঠিক হেরে যাবার মুহূর্তে ছাড়বে সেই পশুপাত অস্ত্র—তুমি একটা পাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মা ফসফরাসের মত জ্বলে উঠবে—তুই পাগল, তোর বাপ পাগল, তোর ঠাকুরদা পাগল, তোর চোদ্দ-পুরুষ পাগল। আমার তখন লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, কোলা ব্যাঙের মত; কিন্তু লাফাই না। আমি তখন মনে মনে বলি—পাগল আর নারীতে কি না বলে, ছাগলে কিনা খায়! অর্থাৎ পাগল শব্দটি হল মধ্যম লেজ। কর্ণে

প্রবেশমাত্রই বহ্নিমাত্র অবস্থা। আমার চতুর্দশ পুরুষকে পাগল প্রমাণের পর অধস্তন চৌদ্দ পরুষকে ধরে টানাটানি। আমার ছেলে— তস্য ছেলে তস্য ছেলের ছেলে। মানে ছেলে লেলে। চৌদ্দ ভুবনের মত—মাঝে ভুঃ মানে আমি, এই প্রতিবেদক। ঊর্ধ্বে, ভূঃ, স্বঃ, জন, তপঃ, সত্য। ছটি স্বর্গলোক। অধে পাতাল, তারও সাত ভাগ অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল। সমস্ত তছনছ করে, নিজের রক্তের চাপ দুশ'দশে তুলে অবশেষে সত্যিই তিনি সাময়িক পাগল হলেন। ডাক্তার, বদ্যি, কড়া ঘুমের ওষুধ। পনের দিনের মত শয্যাশায়ী।

তৃতীয় লেজটি হল, অন্যের বউয়ের প্রশংসা। যদি কোনও ভাবে একবার বলে ফেলেছি আহা অমুকের বউটি কেমন সুন্দর, যেমন দেখতে তেমন স্বভাব। মিষ্টি মুখ। মিষ্টি কথা। শ্বশুর বাড়িটিও ভারি সুন্দর। তিন ভাই, তিনজনেই ডাক্তার। একজন দাঁতের। একজন কানের। একজন মাথার। গোটা পরিবারটাই মানুষের মুণ্ডু নিয়ে পড়ে আছে। ওর নিচে কেউ আর নামেনি। বউটি আবার শিল্পী। তুলির এক আঁচড়ে একটা মুখ। নিমেষে ঝরনা, পাহাড়, বনস্থলী। এইসব কথা, মধ্যরাতে, একান্তেই হতে পারে। অনেকটা আমার স্বগতোক্তির মত। অলস মুহূর্তে মানুষ এই রকম করতেই পারে। তার করার হক আছে। কি পেয়েছি, আর কি পাইনি। এ মত উক্তির পর যে কোনও বাঙালি, গলায় সুর থাকুক আর না থাকুক গুনগুন করে গাইবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গান—

কি পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি॥

এই মধ্যরাতের একান্ত বিলাসিতাটুকু সব মানুষই প্রশ্রয় দিতে পারে। শ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস এই নিয়েই তো জীবন। যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না, এইটাই তো সত্য। সত্যেও ভদ্রমহিলার অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে বলবে যাও না, তার কাছেই যাও না। আমার কাছে কেন। কি কথা! এমন কথা কোনও ভদ্রলোক বলে। ভদ্রমহিলারাই বলতে পারে। আমি যেন পরস্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করার জন্যে এই সব কথা বলছি! আমার কি ভীমরতি হয়েছে। আমার এমন সোনার চাঁদ বউ থাকতে হুলো বেড়ালের মত অন্যের হেঁসেলে ছোঁক ছোঁক করতে যাবো কেন। গিয়ে ধোলাই খেয়ে মরি আর কি! এরপর শুরু হয়ে গেল লং-প্লেয়িং—'জেনে-শুনে, দেখে-শুনেই তো বিয়ে করেছিলে। আমার জামরুলের মত নাক, প্যাঁচার মত চোখ, ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত গায়ের রঙ। শিরিষ কাগজের মত গলা। বিয়েটা তখন না করলেই পারতে! আহা, কত কষ্টই না আমার জন্যে করেছিলে। ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরেছিলে ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়। আড়াই হাত লম্বা এক একটা চিঠি। ধার করে উপহার। গাছতলায় বসে বসে ঘাসে টাক। তখন অত কসরৎ না করলেই পারতে। কে বলেছিল আমার জন্যে

হেদিয়ে মরতে।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস। তারপর খচমচ করে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে ধপাস। কিছুক্ষণ পরেই আমার সাধ্য-সাধনা। একবার করে হাত ধরে টেনে তুলি পরক্ষণেই ল্যাৎ করে নেতিয়ে পড়ে। যেন প্ল্যাষ্টিক গার্ল। দায় তো আমার। সারারাত মেঝেতে পড়ে থাকলে, পরের দিনই মিনিটে পঞ্চাশটা করে হাঁচি। ডাক্তার-বদ্যি। কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ। নিজে বাঁচার জন্যে বউকে বাঁচাতে ছুটি। কে বলেছে তোমার জামবুলের মত নাক, প্যাঁচার মত চোখ। অমাবস্যার মত রঙ। তুমি আমার 'সায়রাবানু।'

আমি জানি, বড় লেজটা ধরে টানলে, একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। মধ্যম লেজে টান মারলে সাতদিন। ছোট লেজে টান মারলে গোটা রাত সাধ্য-সাধনা। টেনে তুলি, আবার তুলি। ভীম ভবানী হলে পাঁজাকোলো করে মেঝে থেকে বিছানায় ফেলে ঠেসে ধরতে পারতুম। শরীরে সে-শক্তি নেই। অবাক হয়ে ভাবি, হিন্দি ফিলমের নায়করা আস্ত একটা নায়িকাকে কেমন করে পাঁজাকোলা করে ঘুরে ঘুরে সাড়ে সাতশো ফুট লম্বা একটা গান গায়। ওইরকম হিম্মৎ না থাকলে ব্যাচেলার হওয়াই ভাল।

সংসারে মোটামুটি সবই ভাল। দুঃখ, সুখ, অসুখ-বিসুখ, টানাটানি-ছাড়াছাড়ি সবই সহ্য করা যায়, অসহ্য স্ত্রীর গোমড়া মুখ। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে আকাশ ছেয়ে যায় মেঘে। সূর্যের মুখ ঢেকে যায় ; অন্ধকার, বিষণ্ন দিন। দিনের পর দিন। স্ত্রী যেন সেই বঙ্গোপসাগর। সব সময়েই নিম্নচাপ তৈরি হয়ে আছে। সদা মেঘলা। সেই মুখে এক চিলতে হাসির জন্যে কি সাধ্যসাধনা ! যত তেল স্ত্রীকে ঢালা হয়, সেই তেল কড়ায় ঢাললে একটা তেলে ভাজার দোকান সারা বছর অক্লেশে চালানো যায়। সব চেয়ে মারাত্মক হল, কথায় কথায় খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। সামান্য একটু ঠুকঠাক হল, কি খাওয়া বন্ধ। গোটা সংসারকে খাইয়ে, খাবার দাবার সব তুলে রেখে, একটা বই কি বোনা নিয়ে বসে পড়লেন। অন্য সময় বই কি বোনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। একটা সোয়েটার—সে যেন ধারাবাহিক উপন্যাস। বছরের পর বছর চলছে তো চলছেই। ছিড়িক ছিড়িক ইনস্টলমেন্ট। অন্য সময় ঘর-দোর এলোমেলো টেবিলে চেয়ারে ধুলো, দেয়ালের কোণে কোণে ঝুলের ঝালর। এই সময় তিনি মহাকর্মী। যত কাজের ধুম। উদ্দেশ্য দেখানো, দেখো অনশনে আছি, কিন্তু কাজে দেহপাত করছি। আমি এক পেট খেয়ে বিছানায় চিৎপটাং তিনি শুয়ে আছেন পাশে খালি পেটে। দাঁতের ফাঁকে বড় এলাচের দানা। অন্ধকার ঘর। নীল মশারির ঘেরা টোপ। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু দাঁতে বড় এলাচের দানা কাটার কুট কুট শব্দ। অনেকটা আমার বিবেকের দংশনের মত। স্বার্থপর দামড়া। নিজে পেট ফুলিয়ে পড়ে আছে। পাশে তোমার স্ত্রী অনশনে, তোমারি দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দাঁতে দাঁতে বড় এলাচের দানার কিটিস কিটিস নয়, আমার বিবেক ইঁদুর আমারই জীবনকাব্য কাটছে মাঝরাতের

অন্ধকারে। এই এক চালেই আমার মত খেলোয়াড় কাত হয়ে যায়। প্রথমটায় বোঝা যায় না, মানে বুঝতেই দেয় না যে, খাওয়া বন্ধ হবে। নদীতে জল মাপার জন্যে ব্রিজের পিলারে স্কেল লাগানো থাকে। জল বিপদসীমা লঙ্ঘন করছে কি-না বোঝা যায়। স্ত্রী-নদীতে রাগ বিপদসীমা ছুঁয়েছে কি-না বোঝার উপায় নেই। সামান্য কথা কাটাকাটি এই ইলেকট্রিক বিল নিয়ে, কি চিনির খরচ বেশি বলে, কি হয় তো বলেই ফেললুম 'আমার কি তেলকল আছে।' আমার বাপের তেলকল দেখেছ বলিনি কারণ নিজেই নিজের বাপ তুলবো, এমন ছোটলোক আমি নই। বা হয়তো বললুম 'আমার কি চা বাগান আছে।' বলতে পারতুম আমার শ্বশুরের কি চা বাগান আছে মাসে সাত কিলো চা, রোজ সাতটা মোষ এসে চা খেয়ে গেলেও এত খরচ হত না। এইসব অভিযোগ যে কোনও স্বামীই, যে কোনও স্ত্রীকে করতে পারে। না-ই যদি পারবে তাহলে বিয়ে করা কেন? এই তো আমার তিন বন্ধু, তিন জাঁদরেল মহিলাকে বিয়ে করেছেন, জজ, প্রিনসিপ্যাল আর শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নেত্রী, যে কোনও নির্বাচনে এম এল এ বা এম পি হয়ে যাবেন অক্লেশে, হেসে হেসে। আমার সেই তিনবন্ধু কি নতজানু হয়ে থাকে? কাঁধে তোয়ালে ফেলে 'যো হুকুম মেমসাব বলে স্ত্রীকে প্রদক্ষিণ করে! কোর্টে তুমি জজ। রোজ একটা করে আসামীকে তুমি ফাঁসিতে লটকাও, কিন্তু বাড়িতে তুমি গদাইয়ের স্ত্রী। কথায় কথায় ক্ষেপে বোম হলে সংসার তো ভেটকে যাবে। দড়ির ওপর ব্যালান্স করে কতক্ষণ হাঁটা যায়। হয় তো একটু চড়া গলায় বলেই ফেললুম 'বাথরুম থেকে বেরোবার পর আলোটা নেভাতে হয়, তা না হলে হাতে হ্যারিকেন হয়। সংসার করার এই এ-বি-সি-টা তোমার মা শেখাননি। এর জন্যে তো ডিগ্রি-ডিপ্লোমার প্রয়োজন হয় না।' মাসে মাসে পাঁচশো টাকা করে ইলেকট্রিক বিল এলে, কোনও আদমি কোনও অওরতকে, সোনা আমার, মানু আমার, খেয়াল করে আলোটা একটু নিভিও; অকারণে পাওয়ার খরচ করো না, বলতে পারে কি? আমি তাও বলে দেখেছি 'দয়া করে আলোটা নেভাও।' আমার এমনই নিখাদ নাইট্রিক অ্যাসিড ধোয়া প্রেম। তাও দেখি মুখের চেহারা জামবাটির মত হয়ে গেল। টেবিলে কাপ নামাল যেন আহাম্মদ জান থেরকুয়ার তবলায় শেষ তেহাই। ব্যাপারটা কি? না ওই দয়া শব্দটি। ওই শব্দটিতে হিমের মত জমাট বেঁধে আছে, শ্লেষ আর ব্যঙ্গ। এ-তো মহা জ্বালা। ভাষাতাত্ত্বিক চমস্কির কাছে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞান শিখে এসে সংসার করতে হবে। পাঁচশো টাকা বিলটা বড় কথা নয়। ওটা তোমার ম্যাও। তুমি মা তুললে কেন? কেন বললে, এ-বি-সি-শিখিনি? আর ফার্ষ্টবুকের এ-বি-সি বলিনিরে ভাই। সংসারের এ-বি-সির কথা বলেছি। আর মা তুলবো কেন? বাপ তুললে গালাগাল হয়। সে বুদ্ধিটা আমার অছে। তোমার মত নই। তুমি তো সারা দিন বার দশেক আমাকে তোলো আর ফ্যালো। ছেলে যখনই মুখের ওপর চোটপাট করে, বলে, পারবো না

যাও। তুমি অমনি বলো ; তোর বাপ পারবে ? তা তুমি যখন ছেলের বাপ তোলো, তখন বেশ প্রেম প্রেম লাগে।

কত বড় ডিপ্লোম্যাট। সংসারে যত পাকছে ডিপ্লোম্যাসিটা তত বাড়ছে। রাত সাড়ে নটা-কি দাশটার সময় হাঁক পড়ল—'সব খাবে এস।' আমরাও বাধ্য ছেলের মত বসে পড়লাম যে যার জায়গায়। সন্ধ্যের দিকে একটু কথাকাটাকাটি হয়েছিল, বিষয়টা খুবই তুচ্ছ, একটা গেঞ্জি। আমার একটা গেঞ্জি আমিই কেচে ছাদের তারে শুকোতে দিয়েছিলুম। একদিন গেল, দু-দিন গেল, সাতদিন হয়ে গেল কেউ আর তোলে না ; যেন রাস্তার ইলেকট্রিক তারে আটকানো সুতো, ছেঁড়া ঘুড়ি। আমিও তুলি না। দেখছি। টেস্ট করছি, সংসারে আমার জন্যে কতটা ভালবাসা আর কর্তব্যবোধ জমা আছে! কে কতটা ভাবে আমার কথা! দেখলুম, ভাঁড়ে মা ভবানী। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। দৌড়-ঝাঁপ চলছে। সহজে তুমি টাঁসছ না। টাকার পাইপ লাইন ঠিকই চালু থাকবে। তবে আবার কি। স্োস্যাল সার্ভিসের কি প্রয়োজন ? মোটা দাগের সেবাই যথেষ্ট। গজাল সার্ভিস। বাসের আসনে ছোট একটা পেরেক উঠে থাকলে কে আর নিজের থেকে সার্ভিসিং করতে যাচ্ছে। যতক্ষণ পাবলিক না চ্যাঁচাচ্ছে। এঞ্জিনটা তো সব। বাস গড়াচ্ছে গড়গড়িয়ে। দানাপানি দিয়ে টাট্টুকে ছেড়ে দাও। যা ব্যাটা রোজ্‌গার করে আন। তার গেঞ্জি তিনমাস কেন, অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া তক ঝুলবে। পাজামার লজ্জাস্থান, ফেঁড়ে থাকবে। সেলাই আজও হচ্ছে, কালও হচ্ছে। বললেই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, তোমার ওটা ছাড়া আর কোনও পাজামা নেই ; জামা কিনে আনার পর যে কদিন বোতাম থাকে। তারপর একটা একটা করে ঝরতে থাকে। বোতাম তো আর ঝরাপাতা নয়, জামাও গাছ নয়, যে শীতে ঝরিয়ে বসন্তে বোতাম সাজিয়ে দেবে। প্রথমে গেল গলা, পরে গেল পেট, শেষ গেল বুক। সব হাওয়া। আর তো চলে না। জামা তো ব্লাউজ নয় যে, গোটা গোটা সেফটিপিন লাগিয়ে ম্যানেজ করে নোবো। মেয়েদের আটপৌরে ব্লাউজে বোতাম থাকে না। কে বসাবে। আবার বসাবে। ওই গজালই সহজ রাস্তা। মেয়েদের তো বউ হয় না, যে বসিয়ে দেবে। তারা নিজেরাই বউ। আর বউ হবার পর তাদের কাজ এতো বেড়ে যায়, যে তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। মা কালীর গলায় মুণ্ডমালা মেয়েদের বুকে সেফটিপিনের মালা। বললেই বলবে পরোপকার প্রবৃত্তি। ওখানে না কি স্পেয়ারও থাকে। প্রয়োজনে অন্যকে ধার দিতে পারে। সাবেকি ধারণা নিয়ে বিয়ে করলে অনেক দুর্ভোগ! জামা, প্যান্ট, ইস্ত্রি, সেলাই, বোতাম বসানো, ফিতে পরানো, মাথা টেপা ইত্যাদি নিম্নবর্গের কাজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এসেই খতম। প্রায়ই শুনতে হয়—নিজে করে নিতে পারো না। আমি একটা কেমিস্ট্রির লোক টেলারিং তো শিখিনি। সিউয়িং, কুকিং, নার্সিং এই সব আমার ছেলেকে শেখাতে হবে, তা না হলেই মরবে। গৃহকর্মে সুনিপুণা বিশেষণ ঘুরে গিয়ে ছেলেদের গায়ে লাগবে

গৃহকর্মে সুনিপুণ। বলবে, কি রকম স্বামী ? গ্যাস ফুরিয়ে গেলে তোলা উনুনও ধরাতে পারে। কেরোসিন স্টোভে পলতে পরাতে জানে। পোড়া কড়া মাজতে পারে। ছেলে ধরাও জানে। সবই যেন উল্টেপাল্টে গেল।

তা ওই তুচ্ছ-গেঞ্জি। যাকে বলে তিল থেকে তাল। সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে বুক ধড়ফড় করে। আচ্ছা করে। কিন্তু ট্যাং ট্যাং করে এখানে, ওখানে ঘোরার সময় বুক ধড়ফড় করে না। ও সেটা হল সমতলে। ভাইয়ের বিয়ের সময় একতলা, তিনতলা দাপিয়ে বেড়ালে ? বেড়াতেই হল কর্তব্য। গেঞ্জিটা নিজেও তো তুলতে পারতে ? এইটুকু দয়া তো করা যেত ? দেখছিলুম, তুমি কর কি না ? না, তোমার তো কিছুই করা হয় না। তোমার আর একটা বউ এসে করে দেয়। সে বউ আছে কোথায় ? কোথায় পুষছো তুমিই জানো ? তা না হলে মাসে মাসে এত খরচ হচ্ছে কি করে ? টাকায় থই পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার বুঝি সেইরকমই ধারণা। তোমার বয়সের কোনও পুরুষকে বিশ্বাস নেই।

তারে ঝোলা একটা গেঞ্জি। কোথাকার জল কোথায় গড়াল। আমাদের পরিবেশন করা হয়ে গেল। সকলেই বসে গেল, তিনি বসলেন না। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হল, তুমি বসলে না ?' গম্ভীর মুখে, খুব পসারঅলা ডাক্তারের মত বললে, 'ক্ষিদে নেই। পরে খাবো।' সেই পর আর সে রাতে হল না, পরের রাতেও এল না। ব্যাপারটা লাগাতারের দিকে চলে গেল। শেষে যা হয়, দুহাত তুলে সারেণ্ডার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা, এও তো এক ধরনের অপমান, সেই ছাত্রজীবনের মত, প্রায় কান ধরে নিলডাউনের অবস্থা। এমন কাজ আর করব না। যা হচ্ছে হোক। সংসার ভেসে যাক চুলোয় যাক, আমাকে কেউ দেখুক, না দেখুক, চোখ-কান বুজিয়ে থাকবো। বয়েস হচ্ছে। রক্তের আর সে জোর নেই। দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে পারলেই হল। বধূ-হত্যার যুগ পড়েছে, অনশনে প্রাণ বিয়োগ হলে পুলিশে আর পাবলিকে পিটিয়ে লাশ করে দেবে।

বেশ সাবধানে তেল দিয়ে, তা দিয়ে, মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটছিল। যাকে বলে ট্যাকটফুলি। অনেক প্ররোচনা এসেছিল ও তরফে থেকে। ফাঁদে পা দিই নি। তবু মানুষ তো, হঠাৎ একদিন লেজে পা পড়ে গেল। পড়ল, ছেলেকে উপলক্ষ্য করে। ঘটনাটা সেই ঘটালো। মায়ে-ছেলেতে অনেকক্ষণ চুলোচুলি হচ্ছিল বাজারের হিসেব নিয়ে। হিসেব না-কি মিলছে না। একেবারে দশ টাকার তঞ্চকতা। শেষে সেই। ছেলে বললে এটা একটা পাগল। বদ্ধ পাগল। সঙ্গে সঙ্গে কোপ পড়ল আমার ঘাড়ে—'কি শুনতে পাচ্ছ না ! না এখন কালা হয়ে গেছ ?' পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যে আমি গান গেয়ে উঠলুম—'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে। তার প্রতিবাদ করি আমি। যখন তুমি আমায় পাগল বলো। ধন্য যে হয় সে পাগলামি।' ফল আরো খারাপ হল ! যেন আগুনে

ঘি পড়ল। একটু ভাঙচুর হল। তরতরিয়ে ছাদে উঠে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পড়ে রইল সংসার।

যখন আমার যৌবন ছিল, প্রেমে যখন টইটম্বুর হয়ে আছি, রসে পড়া রসগোল্লার মত, সেই সময় এমত অবস্থায়, পাইপ বেয়ে, কার্নিস বেয়ে, যাক প্রাণ থাক পণ করে ছাদে গিয়ে ল্যাণ্ড করতুম। স্করোমুশের মত। সে বয়েস তো আর নেই। সে মনও নেই আর। এখন মনে বাজছে ধ্যাত্ তেরিকা সুর। অনেক খোশামোদ করেছি, আর না। হয় ওসপার না হয় এসপার। থাকো বসে ছাদের গোঁসাঘরে। মানভঞ্জন পালা আর গাইব না। তোমারও অনশন, আমারও অনশন। অনশনের লড়াই চলুক। দেখি, কে হারে আর কে জেতে! হেঁকে বলে দিলুম—আমিও খাবো না। ঢ্যাং করে যেন একটা শব্দ হল কোথাও। যাত্রার দলে যুদ্ধ শুরুর আগে যেমন বাজে। যে যতই সিটি মারুক, এবার আমি কৃতসঙ্কল্প। প্রথম রাতে যে বেড়াল কাটা হয় নি, সেই বেড়াল আমি না হয় কাটবো শেষ রাতে। মরতে হয় মরবো। এ মরণ আমার আধ্যাত্মিক আখ্যা পাবে। আমি শহিদ হবো। পথের ধারে বেদী না হয় না-ই হল। না-ই হল মঠ।

ছেলে পরোক্ষে বললে, 'যত সব বয়েস বাড়ছে ততই যেন খোকা হচ্ছে। দু-দিন, তিন দিন অন্তর অন্তর দামামা বাজালেই হল। নাও, সব না খেয়ে মরো, আমি চীনে রেস্তোরাঁয় চাওমিন মেরে আসি।' মনে মনে বললুম, 'তুমি আর বুঝবে কি, সেদিনকার ছোকরা! বিবাহিত মানুষের আমরণ সংগ্রাম স্ত্রীর সঙ্গে। বাঁকা লেজকে সোজা করতেই জীবন শেষ। যাবার ক্ষণে শেষ কথা—আমি আর পারলাম না। হেরে মরে ভূত হয়ে ঘাড় মটকাবো স্বামীদের এমন বরাত করেই সোজা স্বর্গে। নরক-যন্ত্রণা স্ত্রীর হাতেই হয়ে যায় কি না! ভূত হতে পারলে কত স্ত্রীর যে ঘাড় মটকে যেত!

স্নানটান করে শুদ্ধ শরীরে, শুদ্ধ বস্ত্রে, মহাত্মা গান্ধীর 'আত্মজীবনী' বের করে আনলুম খুঁজে পেতে বইয়ের তাক থেকে। সেই মৃত মহামানবই এখন আমার শক্তি। তিনি ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে কতবারই না অনশন করেছিলেন। কোনওবার তিনদিন, কোনওবার সাত দিন একবার বোধ হয় পনের দিন গড়িয়েছিল। আমার সঙ্গে তাঁর তফাৎ, আমার অনশন স্ত্রীর শাসনের বিরুদ্ধে। তফাৎই বা বলি কেন। একই তো : স্ত্রীরাও তো 'হোয়াইট রেস'। ফর্সা রঙ আর সমান অত্যাচারী।

গান্ধীজী অনশনের সময় কি শুয়ে পড়তেন। আমার কাছে তাঁর জীবনের ঘটনাবালীর ছবি সমন্বিত একটা অ্যালবামও আছে। টেনে বের করে আনলুম। বেশ বড়সড়। এই তো একটা ছবি। সাদা বিছানায় সাদা চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। উঁচু বালিশে মাথা। মাথার কাছে তাঁর স্ত্রী। তার মানে অনশনে শোয়া 'অ্যালাউড'। অনশনেরও তো একটা শাস্ত্র আছে। সেই শাস্ত্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন মহাত্মা

গান্ধী। কত বড় দূরদর্শী ছিলেন। জানতেন দেশ থেকে ইংরেজ চলে যাবার পরেও স্ত্রী থাকবে। স্বামীদের অনশনের অস্ত্র নিয়ে লড়তে হবে।

অনশন মানে অনশনই। খাওয়া-দাওয়া কিছু চলবে না, এমন কি জল পর্যন্ত না। জিভ খুব শুকিয়ে গেলে জলে তুলো ভিজিয়ে একটু 'ময়েস্ট' করে দেওয়া যেতে পারে। এটা বইয়ে লেখা নেই। অ্যাটেনবরোর গান্ধী ছায়াছবি দেখে জেনেছি। অনশন ভঙ্গের দিন এক গেলাস কমলালেবুর রস তোমাকে খেতেই হবে। তা না হলে ভোঁচকানি লেগে মৃত্যু। হাঁউ হাঁউ করে 'সলিড' কিছু খেলেই শেষ খাওয়া।

যাক শোওয়া যখন যায় আর সেইটাই যখন অনশন-বিধি, তাহলে দোতালায় বসার ঘরের পরিচ্ছন্ন সোফা-কাম-বেড-এ শেষশয্যা গ্রহণ করি—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। হয় মন্ত্রের সাধন না হয় শরীর-পাতন। মন্ত্রটা অবশ্য তেমন জোরদার নয়—স্ত্রীর সঙ্গে লড়াই। ব্যাখ্যা করলে একটু গুরুত্ব অবশ্য পায়—স্ত্রী মানে শক্তি। চণ্ডী বলছেন, স্ত্রীয়া সমস্তা সকলা জগৎসু। তার মানে—নারী আদিশক্তি। সেই শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় স্ত্রী তৈরি করেছেন সেই বিশ্বস্রষ্টা। সেই স্ত্রীদের নানা চেহারা, ভাব আর ভাষা। সেই শক্তি, সেই আদি আর আদ্যাশক্তির সঙ্গে যে ধর্মযুদ্ধ, যুদ্ধস্থলের নাম, সংসার সমরাঙ্গন। আর অস্ত্র হল অনশন। এই নিয়ে ছেলে-মেয়েরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেও, ব্যাপারটা তুচ্ছ, ছেলেখেলা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের চেয়েও মহান। সে আন্দোলন স্বাধীনতার পরই খতম। এই আন্দোলন চলবে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত। সংসার নামক অনাসৃষ্টি যতদিন থাকবে ততদিন। যৌবনে মানুষ হেলে লেলে করে বিয়ে করবে। তারপর ফুলশয্যার ফুল শুকোতে না শুকোতেই শুরু হয়ে যাবে ফাইটিং। এক জোড়া হুলোহুলীর জীবনযুদ্ধ।

বিচার-বিশ্লেষণের পর মনে বেশ আধ্যাত্মিক-শক্তি জড়ো হবে। শুধু চোখ রাখলুম আমার প্রতিযোগী কি করছে। জল বা পান খাচ্ছে কিনা। সংসারী মানুষের চা-ও এক দুর্বলতা। কাকের কা কা-র মত মধ্যবিত্তের চা-চা। এদিকে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, ওদিকে ক্ষণে ক্ষণে, ওরে চা চাপা।

মহিলা মারাত্মক, জলের ধারে কাছে গেলেন না। মস্ত বড় পানসক্ত কিন্তু একটাও পান খেলেন না। চায়ের জন্যে কোনও চাতকতা দেখা গেল না। অথচ আমার একই সঙ্গে জল খেতে ইচ্ছে করছে। চা খেতে ইচ্ছে করছে। ধমক ধামক দিয়ে সেই সব ইচ্ছে তাড়ালুম। মনকে দেখালুম, মন দেখ ওই নারীকে, কী সাংঘাতিক মনের জোর। আগের জন্মে কোনও জৈন সাধু ছিল না তো? মন দেখে শেখো। শেষে মন, কোথাও কিছু নেই, বলে কি না, মিছরি খাবো 'সে কি রে! মিছরি খাবি কি রে। মিছরি কেউ খায়!' শেষে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। আর ঘুমিয়েও পড়লুম।

সন্ধ্যের সময় কপালগুণে এসে হাজির হলেন আমাদের কুল-পুরোহিত।

তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পরের দিন। যজমান তো, 'তুমি কাল একবার এসে বাবা।'

'আমি তো পারবো না ভট্চাজ মশাই। আমার নির্জলা উপবাস চলেছে।'

কেন ? ও বৈশাখ মাস। তুমি বুঝি পঞ্চতপা করছ। আহা ! তা করবে না ! কোন বংশের ছেলে তুমি ! প্রথম দিকটায় তুমি যখন ভেস্তে গিয়ে, নিজের পছন্দ করা পাত্রীটিকে বিয়ে করে আনলে, তখন তোমার পিতাঠাকুর বড় আঘাত পেয়ে বলেছিলেন, বংশের কুলাঙ্গার। আমি মনে মনে হেসেছিলুম—জানতুম তুমি ফিরবে। বোম্বাই আমগাছে বোম্বাই আমই হবে। আমার বিশ্বাস আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তা তোমার উপবাস ভঙ্গের দিন একটা খবর দিও। কিছু অনুষ্ঠান তো আছেই। আমি আবার শুয়ে পড়লুম। এখন এনার্জি খরচ করা চলবে না। মানুষ একটা ব্যাটারি। যত ওঠা-বসা-ঘোরা-ফেরা করবে ততই খরচ হয়ে যাবে। শুয়ে শুয়ে একটা ধর্মপুস্তক পড়ার চেষ্টা করলুম। খাদ্যের শক্তিতে কি হয় ! মল, মূত্র, কফ, পিত্ত। যাবতীয় কামনা-বাসনার উৎস, কলা, মুলো, ঘেঁচু, মেঁচু। আধ্যাত্মিক খাদ্যই তো খাদ্য। মনের শক্তিই তো শক্তি। আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে সংসার পানসে হয়ে যাবে। বৈরাগ্যের পথই আমার পথ, তখন বউকে মনে হবে কবিরাজী পাঁচন। উপকারী কি না জানি না, তবে অখাদ্য।

রাতটা কেটে গেল। শেষ রাতে আবার স্বপ্নও দেখলুম। একটা গাধা, তার পিঠে অনেক বোঝা। গাধাটা ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে আমিও চলেছি তার পেছন পেছন মাঠ-ময়দান পেরিয়ে। একটা আটচালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বসে আছেন মহাদেব স্বয়ং বাঘছাল পরে। ভামটাম মাখা। পাশে ত্রিশূল। তিনি বলছেন, 'কি রে গাধা ! এই বুড়ো বয়সে এলি'। আমি ইংরেজিতে উত্তর দিতে গেলুম 'বেটার লেট দ্যান নেভার।' আমার গলা দিয়ে তিনটে গাধার ডাক বেরলো, হ্যাঁককো, হ্যাঁককো। অবাক কাণ্ড, দেখি কি আমি আর গাধা এক হয়ে গেছি। একটা মহা অশান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠলুম। আমার ভেতর গাধাটা ঢুকলো, না আমি গাধাটার ভেতরে ঢুকে গেলুম !

বেলা বারোটা নাগাদ আমার অনশন আর স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেহাদ নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় পরিণত হল। কারণ আমার বাঁ দিকটা দুর্বল মত হয়ে গেল। বাঁ হাত আর বাঁ পা-য় তেমন জোর পেলুম না ঃ কেমন যেন থ্যাস থ্যাস করছে। মাথাটাও কেমন যেন ঝিম মেরে আসছে। সেই মুহূর্তে আমার রাগ বিদ্বেষ সব উবে গেছে। তুচ্ছ সংসার তলিয়ে গেছে। নিজের কাছে তখন নিজে এক গিনিপিগ। দেখি না, একটু একটু করে কি কি যায় ! পুরো ব্যাপারটা ঘুরে গেল জীববিজ্ঞানের দিকে। আহারের প্রয়োজন আছে কি না। কতটা আহার প্রয়োজন। মধ্যবিত্তের ফ্যামিলিতে একটা চাকুরীজীবী সকালে কোনও রকমে নাকে গোঁজে। সারাদিন সে পাখি। এই ছোলা, মুড়ি, বাদাম মাদাম আর চা নামক তরল পদার্থ খেয়ে দিন চালায়। রাতেও আহামরি কিছু তেমন হয় না।

মাঝে মধ্যে কোনও উপলক্ষে খাওয়ার মত খাওয়া হয়। প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালোরি সব মিলিয়ে হল একটা। তা প্রতিদিনের ওই আহারেই শরীর চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল, ছোট মত একটা ভুঁড়িও নামছিল। আমি মনে করতুম না খেয়েই তো বেশ আছি। তা নয়, ওই খাওয়াটাও খাওয়া ছিল। যাই হোক, এখন আমি দর্শক। আমার শরীরের দর্শক। কিভাবে একে একে সব পড়বে। বাঁ দিকে শুরু। ডান দিকটা আছে এখনও। এই যে শুয়ে শুয়ে কাগজ ধরে চোখের সামনে তুলে পড়ছি থেকে থেকে বাঁ দিকটা কেতরে পড়ছে। কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না! দৃষ্টিও ঘোলাটে হয়ে আসছে। যেন রাজকাপুর ধোঁয়া ছেড়েছেন আর নার্গিস নাচছেন।

সন্ধ্যের পর মনে হল, আমি একটা বোতল। আমার দুটো পাশ নেই। গোল ব্যারেল, লম্বা একটা গদা। আমাদের অনশনের খবর বাড়ি থেকে ছড়িয়ে গেছে পাড়ায়। যাবেই, বাড়ির কাজের লোক হল মধ্যবিত্তের সংসার সংবাদপত্রের রয়টার। সেই একেবারে হেডলাইন করে ছেড়ে দিয়েছে। তাঁরা সব একে একে এলেন। মেয়েরা চলে গেলেন আমার বউয়ের দিকে। পুরুষরা এলেন আমার দিকে। এ-ঘর ও ঘর। মাঝে পাতলা পার্টিশানের ব্যবধান মাত্র। চোখ আমার ঘোলাটে। দেহের দুটো পাশ পড়ে গেছে; কান দুটো কিন্তু ঠিক আছে। এই ভাবেই একে একে যায়। প্রথমে বাঁ দিক, তারপর ডান দিক, অবশেষে চোখ কান দুটো কখন যায় দেখি। ক'দিন অনশনে, মাথাটাকে ঠিক রাখছি রাগের খোঁচা মেরে। ক্রোধরূপী সর্পের ছোবলে বোধটাকে সজাগ রাখছি। তা না হলে 'কোমাষ্টেজে' চলে যাবো। যেতে চাই সজ্ঞানে। রেকর্ডের গান যে-ভাবে 'ফেড আউট' করে। আমি যাবই, আমি যাবো-যাবো-যাবো।

কানে আসছে আমার প্রতিবেশী মহিলাদের কণ্ঠস্বর। তাঁরা আমার স্ত্রীকে বলছেন, 'কি আর করবে বলো, অমানুষের হাতে পড়লে এই রকমই হয়।'

আচ্ছন্ন অবস্থাতেই আমার ফোঁস, 'কোন্ শালা অমানুষ।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার তরফের প্রতিবেশী একজন আমার বুক চেপে ধরে বললে— 'উঁহু! শেষ সময়ে রাগে না, রাগে না। এই যে শালা বললে, অমনি তোমার শালার কথা মনে পড়ল। এখন যদি, গয়া পাও তাহলে তোমাকে কিন্তু শালা হয়ে জন্মাতে হবে। মানে ডিমোশান হল। স্বামী থেকে শালা।'

আমার সাপোর্টে একজন বললে, 'স্বামী হওয়ার চেয়ে শালা হওয়া হাজার গুণ ভাল। দেখছি তো আমার শ্যালকটি আমার সব চৌপাট করে দিলো। লাস্ট আমার নতুন সাইকেলটা ছিল, সেটাও কাল হাওয়া।'

গম্ভীর গলায় একজন বললে, 'পরিবেশটা নষ্ট করবেন না আপনারা। এই সময়ে শুধু তাঁর কথা বলুন। ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। কাকাবাবুর যা অবস্থা, হার্ডলি আর ঘন্টা তিনেক।'

তার কথাও শেষ হল আর ওঘর থেকে এসে ঢুকলেন আমাদের পাড়ার

বিখ্যাত খাণ্ডারণী মহিলা। খাণ্ডারণী হলেও ভদ্রমহিলার গুণ অনেক। পরোপকারী। লোকের বিপদে আপদে সবার আগে তিনিই এগিয়ে যান। সবাই তাঁকে ভয় আর ভক্তি, দুটোই করেন। আমি মিটিমিটি চোখে দেখছি। তিনি আমার সামনে এসে কোমরে দুটো হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। দেখতে-শুনতে বেশ ভালই। চোহারায় বেশ একটা চটক আছে। বড় বড় মা দুর্গার মত চোখ। ঘাড়ের কাছে ইয়া বড় এক খোঁপা লাট খাচ্ছে। চুপ করে থাকলে জগদ্ধাত্রী, মুখ খুললে রণচণ্ডী। আমাদের পাড়ার কামান-বউদি।

তিনি আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'ইয়ারকি হচ্ছে, বুড়ো বয়সে। সারা দেশে অশান্তির শেষ নেই। পাঞ্জাবে-খালিস্তানী। কাশ্মীরে-কাশ্মীরী। ওদিকে রামশিলা, বাবরি মসজিদ। মানুষ পটাপট মরছে, আর এঁরা দেবা-দেবী একজন এঘরে দেয়লা করছেন, আর একজন ওঘরে পেছন উলটে পড়ে আছেন। এ পাড়ায় ওসব চলবে না। গণধোলাই হবে, গণধোলাই। খুব হয়েছে, উঠে বসুন।'

আমার 'ফরে'র একজন বললে, 'ওঠার ক্ষমতা নেই বউদি। দুটো অঙ্গই পড়ে গেছে।'

'তাই না কি? কত ভিরকুটিই জানে এই মাঝবয়সী মিনসেরা। সারাটা জীবন শুধু জ্বালাবে। ভালোয় ভালোয় উঠে বসুন, নয়তো সকলের সামনে বেইজ্জত করে দেবো। আমি সব পারি। এইসব প্যাস্তাখ্যাঁচা লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।'

ভয়ে ভয়ে উঠে বসলুম। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। আমার সামনেই ডুরে শাড়ি পরা বউদির বুক। পেট। মরতে মরতেও শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। অনশন বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম বলেই মনে হল বা চরম একটা সত্যের উপলব্ধি হল—আটচল্লিশ ঘন্টা নির্জলা উপবাসে থাকলেও প্রবল একটা ইন্দ্রিয় বেশ টগবগেই থাকে।

বউদি আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললেন, 'টেকো বুড়ো আর কত ভিরকুট হবে। অমন দেবীর মত বউটাকে বিধবা করার ইচ্ছে হয়েছে। একালে আর বিধবা হয়ে আলো চালের পিণ্ডি গেলে না, স্বামীর ছবির সামনে সন্ধেবেলা ধূপ জ্বালিয়ে— আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বলে গান গায় না।'

বুকে আমার মুখ জুবড়ে গেছে। অনেক দিনের আশা। আবার লজ্জাও করছে। পাঁচ জনের সামনে।

বউদি হেঁকে বললেন, 'অনশন ভঙ্গ।'

আমার সাপোর্টাররা বললেন, 'তাহলে তো কমলালেবুর রস চাই।'

খোঁজপাত করে দেখা গেল, কমলালেবু, অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিছুই নেই। আনাজের ঝুড়িতে গোটাকতক করলা পড়ে আছে। তাই হোক। করলাও তো 'ফ্রুট'। করলার জুস খেয়ে অনশন ভঙ্গ হবে। তারপর ঠিক হল, পাতলা ঝোল আর সবু চালের গরম গরম ভাত। একটু গাওয়া ঘি। শোনা মাত্রই সেই

ছেলেবেলার অবস্থা হল। পেটখারাপের উপবাসের পর ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল দিয়ে এক থালা ভাত উড়িয়ে মনে হত পেটখারাপের কি আনন্দ।

মহিলারা ডাকাত পড়ার মত রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। কাটা, ছেঁড়া, ধোয়া, ফোটানো, নিমেষে সব শেষ। খাবার টেবিলে সব সাজানো হয়ে গেল। আমার সাপোর্টাররা আগেই কেটে পড়েছে। নারীবাহিনী এখন দু-ভাগ। একদল আমাকে নিয়ে, আর একদল আমার বউকে নিয়ে ঢুকলো। এমন দর্শনীয় আহার জীবনে হয়নি।

আমি এইবার খুব সাবধানী। শেষ মুহূর্তে হারতে চাই না। ম্যাচ ড্র হবে। আমি বললুম, 'দু-জনে একসঙ্গে খাবার মুখে তুলবো। আপনারা, ওয়ান-টু-থ্রি বলবেন। তা না হলে কৌশল করে আমাকে হারিয়ে দেবে।'

'বেশ তাই হবে।' বলে বউদি তিন গুণলেন। দু-জনের হাত উঠছে ভাতের নাড়ু নিয়ে। যেই আমি ঠোঁটের কাছে এনে খাওয়ার ভঙ্গি করেছি, খাইনি কিন্তু, আমার বউয়ের হাত নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে বললুম, 'ওই দেখুন, খেল শুরু হয়ে গেছে।' বউদি বললেন, 'বউটাও তো কম শয়তানী নয়।'

তখন ঠিক হল, একসঙ্গে দুটো নাড়ু তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তাই হল। ভঙ্গ হল অনশন।

তারপর সে কি হ্যাঁকো-প্যাঁকো প্রেম আমাদের। যেন আবার নতুন করে ফুলশয্যা হচ্ছে আমাদের। আয় ভাই কানাই, মনের দুঃখ কাহারে জানাই। তবু পিঁপড়ের স্বভাব যাবে কোথায়। বললে, 'বউদির বুক কেমন লাগল ? খুব মিষ্টি, তাই না।'

পাঁচ মিনিটের ভালবাসা 'ফিনিশ'। দু-জনে দু-পাশ ফিরে শুলুম। পিঠে পিঠ ঠেকে রইল। মনে মন। মাঝখানে কলহের মাখন। ওপাশ থেকে পাগলি বললে, 'তুমি খেলে না কেন ? খেলেই পারতে !'

আমি বললুম, 'তুমি না খেলে খাই কি করে ?'

আমার বউ গুড়ুম করে পাশ ফিরল। আমি হয়ে গেলুম একটা পাশ বালিশ ! পৃথিবীটা কত ছোট !

নীপার বক

একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। যেন খণ্ড প্রলয়। চারপাশে থই থই জল। রাস্তাঘাট নেই। সব মুছে গেছে। ঘোর অন্ধকার। মাথায় ওপর ঝুলছে রান্নাঘরের ছাদের মত কালো, নোংরা আকাশ। অসংখ্য গাড়ি অচল হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টি ভেজা

গাড়ির চাল সৈনিকের মাথার হেলমেটের মত চক্‌চক্‌ করছে। কি অবস্থা। এখন দেখছি, সেকালের ডাকাতদের মত একজোড়া রণপা কিনতে হবে। রোববার-রোববার, বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠে অভ্যাস করতে হবে। তা না হলে চাকরি-বাকরি আর করা যাবে না।

'তা কতক্ষণ হবে মশাই আটকে বসে আছি। আমার ঘড়িটা আবার গত রবিবার মেচেদা লোক্যালে, সাঁতরাগাছির কাছে ছেনতাই হয়ে গেছে।'

ওপাশের ভদ্রলোক বললেন, 'তা দেড়ঘন্টা হল।'

'দিস ইজ ক্যালকাটা। দিস ইজ ইওর ক্যালকাটা। এই দেড়ঘন্টায় প্লেনে দিল্লি চলে যাওয়া যায়। রাজীব নিশ্চয় এখন ডিনার খাচ্ছে!'

'আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ? একবার দেখুন না মশাই উঁকি মেরে, জলের লেভেলটা। টনসিল টাচ না করলে নেমে পড়ি।'

'তারপর ?'

'খপাত খপাত।'

'শেযে গর্তে ঘপাত। অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স করা আছে ?'

'তা না হলে চুপচাপ বসে থাকুন। বসার জায়গা পেয়েছেন, ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল সকালে পেছন ফিরে বসবেন, অফিস পৌঁছে যাবেন। ঘন্টাখানেকের জন্যে বাড়ি ফিরে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। আজ তো আর মাস পয়লা নয় যে, এসো হে, এসো হে বলে, ভিজে ঢোল, কাদা-মাখা মালটিকে কোলে তুলে নেবে, আর জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁগা শুকনো আছে তো ? ভেজেনি তো ? তুমি ভিজে ব্লটিং মেরে যাও ক্ষতি নেই। মাইনের টাকাটা যেন শুকনো থাকে।'

পেছনের সিটে এই সব রম্য আলোচনা হচ্ছে। তার সামনের জোড়া আসনে এক জোড়া কপোতকপোতী। মাথায় মাথা ঠেকাঠেকি করে ভি হয়ে বসে আছে। তাদের কাছে এই জল, এই আটকে যাওয়া বাস যেন বিধাতার আশীর্বাদ। প্রেমিক প্রেমিকাদের পেটে যে কত কথা জমে থাকে। শেষ আর হয় না। প্রেমালাপ আর ঝগড়া দুটোরই আদি অন্ত থাকে না। আজকাল আবার জনসমক্ষেই সব চলে। সেদিন দেখি রাজধানী এক্‌সপ্রেসের প্রবেশদ্বারে ঠোঁটে ঠোঁট লক করে একজোড়া পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন বললেন, 'এইটা কি এই সব করার জায়গা ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'সিনেমায় চুম্বন, সেনসার আর কাটছে না।'

আর সামনের আসনে এক ভদ্রলোক নোটবুক বের করে হিসেব লিখছেন। বোধ হয় লোহার কারবারী। লোহা এখন সোনা। সে যুগে মানুষ সোনার সন্ধানে ছুটত, এ যুগের মানুষ ছুটছে পার্কের রেলিং খুলতে, ম্যানহোলের-ঢাকনা সরাতে। প্রস্তরযুগ, স্বর্ণযুগ সব যুগ শেষ হয়ে এখন পড়েছে লৌহ যুগ আর চুল্লুর যুগ। সিনেমার নায়ক গান ধরে, চুল্লু খাও, চুল্লু, চুল্লু খাও চুল্লু আর ইয়ং অডিয়েন্‌স্‌ তাল মারে।

আমার বাঁ-পাশের ভদ্রলোক মিনিট পনেরো আগে তোফা নস্যি টেনে দিব্যি ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার ছাড়লেন, 'হ্যাঁ গা ঘরের, জানলা বন্ধ করে এসেছিলে ?'

ও মাথা থেকে নারীকণ্ঠে ভেসে এল, 'না, কটা খুলে রেখে এসেছিলুম।'

ভদ্রলোক স্ত্রীর গলা নকল করে বললেন, 'রেখে এসেছিলুম। বেশ করেছিলে। গিয়ে দেখবে সব কালিয়া হয়ে গেছে।'

ও মাথা হেঁকে উঠল, 'কে জানত এমন বৃষ্টি নামবে। আমি কি জ্যোতিষী !'

ইনি সঙ্গে সঙ্গে ছক্কা মারলেন, 'তুমি আমার নিয়তি।'

বাসের পেট থেকে অদৃশ্য কণ্ঠ উৎসাহ দিল— 'চালিয়ে যান দাদা, জ্বালাময়ী জ্বালিয়ে দিন।' ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। আবার এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, আপন মনে 'যাঃ শালা মরগে যা। আমার কি। বিছানা পাওয়া হয়ে গেল। ধরবে যখন বাতে, তখন মুখের বাত বেরিয়ে যাবে।'

আবার বেশ তোড়জোড় করে ঘুমোবার তালে ছিলেন, ও মাথা থেকে নিয়তির কণ্ঠ ভেসে এল, 'ছাতাটা তুলেছিলে তো ?'

ভদ্রলোক কেমন যেন চুপসে গেলেন, খোঁচা খাওয়া বেলুনের মত। আমতা আমতা করে বললেন, 'ছাতা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ছাতা। জানি জানি, ওটা যখনই তোমার হাতে গেছে তখনই আমি জানি মায়ের ভোগে।' মেয়েরা আজকাল মডার্ণ ল্যাঙ্গোয়েজ শিখে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা তা হলে সোনাদের বাড়িতেই পড়ে রইল।'

'আজ্ঞে না, ওদের বাড়ি থেকে যখন বেরুলে তখন ছাতা তোমার হাতে। সে ছাতা এখন বেহালার ট্রামে চাপছে।'

আমি বললুম, 'বেকায়দায় পড়ে গেছেন দাদা। এবার আপনি শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোকও কম যান না। ইনি হলেন সেই টাইপ। হারবো বললেই হারেগা, খামচে খুমচে মারেগা। চিৎকার করে বললেন, 'আমার ছাতা আমি বুঝবো। পাখির খাঁচাটা কোথায় পড়ে রইল, বাইরের বারান্দায় !'

কলকাতার টেলিফোনের মত, ওপাশ থেকে 'নো রিপ্লাই'।

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ফোলাভোলা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন দিলুম। একে বলে তুরুপের তাস !'

'কে বেশি হারে ?'

'সে যদি বলেন, তা হলে আমিই বেশি হারি। আমি ঠিক পারি না মশাই। মহিলা ট্যাক্‌ল করা খুব কঠিন ব্যাপার, মোহনবাগানের মত অবস্থা হয়। কাটিয়ে কাটিয়ে গোলের কাছে নিয়ে এলুম। সিওর গোল। মেরে দিলুম গোলপোস্টের বাইরে। অসংখ্য ছেঁদা মশাই। অসংখ্য ছেঁদা।'

'আমার স্বভাবে। এত ছিদ্র নিয়ে জেতা যায়। অসম্ভব !'

ভদ্রলোক আর একবার নস্যি নিলেন সশব্দে। তারপর কোণের দিকে হেলে গিয়ে আবার এক রাউণ্ড ঘুমের আয়োজন করলেন।

ও মাথা থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, 'এবার নেমে পড়লে হয় না? সারা রাত বসে থাকবে না-কি?'

আড় হয়ে বসে থাকা ভদ্রলোক চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঁতার জানা আছে কি?'

ওপাশে দুই মহিলাতে কথা হচ্ছে, একজন আর একজনকে বলছেন, 'ভাই, আমাকে এই জল ঠেলে যেভাবেই হোক যেতে হবে। ছেলেটা এতক্ষণে মা, মা করে ঘুমিয়েই পড়ল হয়তো। সারাটা দিন ওই কাজের মেয়েটির কাছে থাকে। মারধোরও করে। এই চাকরি, সংসার এক সঙ্গে সামলানো যায়!'

'ছেড়ে দে না।'

'ওব্বাবা, চাকরির জোরেই বিয়ে। ছেড়ে দিলেই মারবে লাথি।'

না আর না, এবার উঠে পড়ি। যেমন করেই হোক বাড়ি তো ফিরতে হবে। সব পাখি ঘরে ফেরে। বাসের পাদানিতে ঘোলা নোংরা জল ছলকাচ্ছে। পাশেই এক বিকল মটোরগাড়ি। পেছনের আসনে মোটাসোটা বদমেজাজী ভদ্রলোক, ক্রমান্বয়ে ঠোঁট নেড়ে চলেছেন। স্টিয়ারিং-এ অসহায় ড্রাইভার।

ধীরে ধীরে নিজেকে দুই গাড়ির মাঝখানের খালে নামালুম। হাঁটু জল। তলায় ভাঙাচোরা রাস্তা। জল বেশ ঠাণ্ডা। স্পর্শে গা ঘিনঘিন করে উঠল। উপায় নেই। পড়েছি যবনের হাতে। চারপাশে শুধু অচল গাড়ি। সাদা, নীল, লাল, ঘেয়ো, তালিমারা, তাপ্পিমারা, মেহনতী স্টেটবাস। একটা ফুলসাজ-গাড়িতে চন্দনচর্চিত বর। বড়ই উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি। লগ্ন বয়ে যায়। বরকর্তার ঠোঁটে সিগারেটের আগুন জ্বলছে নিভছে। উত্তেজনার টানাপোড়েন। গালে জলজল মত কিসের ছিটে লাগল। ওপরে তাকালুম। ডবলডেকারের দোতলা থেকে থুতু বৃষ্টি হচ্ছে।

এ গাড়ি সে-গাড়ির মাঝখান দিয়ে নিজেকে রাস্তার বাঁ-পাশে এনে ফেললুম। ভয়াবহ অঞ্চল। জল হাঁটু ছাড়াল। তলায় হড়হড়ে কাদা। অদূরেই ফুটপাথের ধ্বংশাবশেষ। ভাঙা রেলিং। জনগণের ট্রাস্টিরা যতটা পেরেছে খুলে নিয়ে গেছে। সেলিং ন্যাশনাল প্রপার্টি একটা ভাল ব্যবসা। মূলধনের প্রয়োজনে নেই। শুধু মেহনত। ফুটপাথের নিরাপত্তায় হাঁটার আশা ছেড়েই দিলুম। নিজের পশ্চাদ্দেশে বারকতক চাপড় মেরে বললুম, 'বল বীর, বল উন্নত মম শির'। তারপর পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।' খোয়ার টিবিতে পা পড়েছিল। জলের তলায় রাস্তার ভূগোল পৌরপিতাও জানেন না আমি তো তাঁর নাবালক সন্তান। বলো, রাখে কেষ্ট মারে কে। বাঁ-পাশে একটা বড় ঢনঢনিয়ে মার্কা বাড়ির তলায় মেহনতী মানুষের জটলায় কল্কে ফাটছে, ব্যোম শঙ্কর। কল্কে একমাত্র জিনিস, যার কৃপায়

কাটফাটা রোদেও মানুষ গান ধরতে পারে— আহা, 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো।'

কলকাতার বন্দরে বড় বড় জাহাজ ভেড়াবার জন্যে পাইলট দরকার হয়। আমাকে এখন কোন পাইলটে নিয়ে যাবে। আমি তো আর কলম্বাস নই, যে ভাসতে ভাসতে আমেরিকা চলে যাব। অথৈ জলে গামলার মত আমার টালমাটাল অবস্থা। বিশ-তিরিশ মিনিটের চেষ্টায় তিন চার কদম এগিয়েছি। একটা ঠং ঠং রিকশা পাকড়াবার চেষ্টা করলুম। পাত্তাই দিলো না। দিলেও সামর্থ্যে হয় তো কুলোত না। কলকাতার রিকশা আর ট্যাকসি খদ্দের চেনে। মাতাল না হলে ওদের নেকনজরে পড়া অসম্ভব।

জয় মা বলে আরও দু-দশ পা এগোবার পর মনে হল, জলে স্রোতের টান ধরেছে। তার মানে সামনেই খোলা ম্যানহোল। কলকাতার পেটে যাবার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। আলকাতরার মত অন্ধকার। ছায়ামানবেরা নন্দী-ভৃঙ্গীর মত ধূসর প্রেক্ষাপটে নাচছে। কলকাতার রসের গামলায় মানুষের লেডিকেনির টাপুরটুপুর অবস্থা।

একটি বেপরোয়া চরিত্র পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'অমন গাগরি ভরণে কে যায় ও চালে চললে রাত ভোর হয়ে যাবে মশাই। এ তো কিছুই নয়, সামনে— ফায়ার ব্রিগেড। সেখানে আপনার কপনি ডুবে যাবে।' ভদ্রলোক গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলেন প্রপেলার লাগানো বোটের মত। তার সঙ্গে সঙ্গে যাও বা এধারে ওধারে দুচারটে আলো জ্বলছিল লোডশেডিং-এর ফুঁয়ে সব ধ্বংস হয়ে গেল। চারপাশ থেকে হো করে একটা শব্দ উঠল। নিচে ভরা চিত্তরঞ্জন নদী চার পাশে খাড়া খাড়া বাড়ি, মনে হল নরক থেকে ভয়ঙ্কর একটা সোরগোল উঠে, ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে গমগম করছে।

আমি অসহায়। কি ভেবে জানি না, তিনবার জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ বললুম, বেশ জোরে জোরে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পেছন থেকে কে একজন জড়ানো গলায় বললেন, 'কমরেড, বিপ্লব শুরু হল, না শেষ হল?'

একেবারে কাঁধের পাশে। নাকে ভক করে গন্ধ লাগল।

মালুদা হঠাৎ শাসনের গলায় বললেন, 'হেডলাইট, ব্যাকলাইট ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছ বাওয়া। তা থামলে কেন সোনার চাঁদ। পাম্পে গিয়ে আমার মত পেট্রল নিয়ে এসো। ট্যাঙ্কে মাল নেই বাওয়া মুফতে মাইল মারবে? মামার বাড়ি! ভাগনে! এটা মামার বাড়ি!'

মাতাল আর দাঁতাল দুটোই ভীতিপ্রদ। আমার স্পিড সামান্য বাড়ল। মাতাল তবু সঙ্গ ছাড়ে না। প্রায় পাশে পাশে ঘাড়ে ঘাড়ে। মন্দ কি। সামনে সামনে চলুক না। গাড্ডায় পড়লে সাবধান হওয়া যাবে। ওব্বাবা জাতে মাতাল কিন্তু তালে ঠিক। আমি মন্থর হলে তিনি থেমে পড়েন। আবার হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে, 'নাই বা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনও বাকি'।

ফায়ার ব্রিগেডের কাছাকাছি এসে গানের বাণী পাল্টে গেল, 'আমার যেমন্ বেণী তেমনি রবে পেণ্ডুলাম ভেজাবো না।' কি মানে কে জানে! খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন, 'কমরেড আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন জানি না, আমি বাড়ি যাবার চেষ্টা করছি।'

'আমি তা হলে কোথায় যাচ্ছি। রসাতলে। আমি কে? বলতে পার আমি কে।'

'আপনি অবতার।'

'ধুস, আমি শ্যামার বর। তুমি কমরেড কার বর?

'নীপার বর।'

'তুমিও বর আমিও বর। মাইন্ড ইট বরযাত্রী নই। তোমার পেট খালি?'

'একেবারে খালি।'

'স্টপ। স্টপ আর এক পা এগিয়ও না। ডুবে যাবে। পেটে মাল নেই, কি সাহস। সমুদ্র পার হবে? আমার বউমাকে বিধবা করবে। নিষ্ঠুর। তুমি কি নিষ্ঠুর।'

ভদ্রলোক হাপুস হাপুস করে কাঁদতে লাগলেন। পরনে দামী জামাপ্যান্ট। গায়ে বিলিতি সেন্টের গন্ধ। আর আমার দরকার নেই, খুব হয়েছে। জল প্রায় কৌপিন স্পর্শ করেছে। আমি মরীয়া হয়ে সামনে এগোচ্ছি। মেছোবাজারের খালি ফলের টুকরি দুলতে দুলতে ভাসছে। আকাশ আবার ঘোর হয়ে এসেছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা নামল-বলে। লম্বা একটা বাঁশ উঁচু হয়ে আছে। ম্যানহোল সঙ্কেত। দূরে একটা বাড়ির সর্বাঙ্গে আলোর ঝালর ঝুলছে। তার মানে ও তল্লাটে লোডশেডিং হয়নি। বিয়ে বাড়ি। লোকজনের কালো কালো মাথা নড়ছে চড়ছে। গাড়ির গুঁতোগুঁতি। চিৎকার চেঁচামেচি। সিনেমা ভেঙেছে। ঠোঁটে ঠোঁটে হিন্দি গানের কলি। ওই অন্ধকারেই কে একজন সুরেলা গলার গেয়ে উঠল, গিলে লে গিলে লে, আরো, আরো গিলে লে ; আর কি গিলবে বাবা, সারা কলকাতাটাই তো গিলে ফেলেছে। ডানপাশে পাতাল রেলের সাজসরঞ্জাম, যেন ময়দানবের কারখানা। হলদে শাড়ি পরা স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়েকে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এক কাপ্তেন বলছে, 'ওর ভেতর জাপানী আছে। এপাশ থেকে ফুটো করতে করতে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।' মেয়েটি অমনি বাওয়া ধরল, 'আমি জাপানী দেখব। ও হুলোদা, আমি জাপানী দেখব।'

ছেলেটি বললে, 'বাড়ি চল। তোর মা তা না হলে জাপানী দেখাবে।'

অন্ধকার সমুদ্র থেকে ভেসে এল মাতালের কণ্ঠস্বর— 'নীপার বর, কোথায় পালালে বাওয়া। শ্বশুরবাড়ির পাড়া যে এসে গেল।'

মালের ট্যাঙ্ক আর প্যাটন ট্যাঙ্ক দুই অপ্রতিরোধ্য। মাতাল ঠিক চলে এসেছে। বাঁপাশে লাল আলোর এলাকা। এদিকে তেমন জল নেই। সব নেমে গেছে পাতাল রেলের গর্তে। অন্ধকারে বিশাল এক চেহারা যেন পাতাল ফুঁড়ে

উঠল, 'লাগবে না কি স্যার, তেরো থেকে তেত্রিশ।' কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলুম। ফ্রক পরা তের চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে ঘুপটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সিগারেটে পাকা টান লাগাচ্ছে। আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে।

অন্ধকারে আবার আর্তনাদ— নীপার বর, কোথায় গেলে বাওয়া।'

পাড়ায় এসে ঢুকলুম। আলো আছে। ঢোকার মুখেই ছাইগাদা। বৃষ্টিতে ধোলাই হয়ে পরিচ্ছন্ন কয়লার সুন্দর কৃষ্ণ চাউনি। ঝড়ে আর জলে মোড়ের মাথায় কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার অলঙ্কার ছিন্নভিন্ন হয়ে ভিজে পথে ছড়িয়ে আছে। একটু আগেই এ পাড়ার কেউ হয়তো চিরবিদায় নিয়েছেন। সাদাফুলের পাপড়ি আর খই পড়ে আছে।

বিশু ময়রার দোকানে গরম রসগোল্লা রসে ফুটছে। বেঁচে অখণ্ড অবস্থায় ফিরছি। পুরোটাই আমার কৃতিত্ব। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারতুম। গর্তে সমাধি হতে পারত। নিশাচরে নাঙ্গাবাবা করে দিতে পারত। প্রায় পুনর্জন্ম। হোক শেষ মাস। দশ টাকার গরম রসগোল্লা কিনে ফেললুম। আর এক খদ্দের বললেন— 'আজ আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে।'

বিশু বললে— 'আপনার বালতিতে ছেঁদা ছিল। ওই দেখুন আমার ছ'লিটার বালতি বাইরে বসানো আছে। ভরে উপচে পড়েছে।'

জলে ভিজে প্যান্ট ব্রিচেস। পা জলে চুপসে চামচিকে। হাতে গরম রসগোল্লা। একবার কড়া নাড়লুম। কেউ বললে না 'যাই।' উপন্যাসের বিরহিণী নায়িকার মত কপালে সজল টিপ পরে, ঘরে প্রদীপ জ্বেলে, গবাক্ষে কেউ প্রতীক্ষায় নেই। জানালার যে অংশের জোড়, বার্ধক্যে ফাঁক হয়ে গেছে, সেই চিলতেতে জোরালো নীল আলোর নাচানাচি। টিভি-তে সাংঘাতিক কোনও বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠান চলেছে। দুয়ারে নীপার বর কেঁপে মরছে।

আবার কড়া। ভেতর থেকে প্রলম্বিত প্রশ্ন— 'কে-এ-এ।'

আশ্চর্য! এখন আমি ছাড়া আর কে আসবে। আমি যে আসতে পারি, এ বোধটাই নেই। হায় সংসার! না, ধরেই নিয়েছে, গরু যখন হোক গোয়ালে ফিরবেই। গম্ভীর গলায় বললুম, 'আমি'।

ভেতর থেকে আদুরে এলানো উত্তর 'যাই' টিভিতে একগাদা 'দামড়া' ভাঁড়ামো করছে।

খুট্ করে দরজা খুলে গেল। বউ নয় শালী। কখন এসেছে কে জানে। ভেতর থেকে বোনের প্রশ্ন— 'কে রে? ও!'

আমি আমার বউয়ের পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছি। জোড়া হয়ে আছে। টিভির পর্দার আধখানা। সেই অর্ধাংশে এক দেহাতী মহিলা হাঁউহাঁউ করছে। নীপা আধ শোয়া হয়ে টিভি- দেখছিল। উঠে এল রাজহংসীর মত। যেন ডিমে তা দিচ্ছিল। সোনার ডিমে।

'কি গো এত দেরি হল ?'

প্রশ্ন শুনে গা জ্বলে গেল। শালীকে সাক্ষী রেখে কড়া কথা চলবে না। দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন— 'তোমাদের এদিকে বৃষ্টি হয়নি।'

'একটু হয়েছে। অ, তাই বুঝি তুমি ভিজে গেছ ?'

আমি ঢোকার জন্যে পা তুলেছি, নীপা হাঁ হাঁ করে উঠল— 'ঢুকো না, ঢুকো না। রাস্তার জল, রাস্তার জল।' ওই এক পা তোলা অবস্থায়, আমি সেই বিখ্যাত হিন্দিগানের রূপান্তরিত কলি— 'তেরি দুয়ার খাড়া এক যোগী (যোগী নয় বক)'। নীপার বক।

আর সেই অবস্থাতেই দেখলাম— একটু আগেই মৌজ করে সব চিঁড়ে ভাজা খেয়েছে। খালি কফির কাপ। ফুলকাটা ডিশে লাল একটা ভাজা লঙ্কা। আর টি ভি গাইছে— ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী।

পেয়ালা পিরিচ

আমার একটা সোয়েটার ছিল। কারুর স্নেহের হাতের বোনা হয়। নিরস দোকান থেকে কেনা। সেই সোয়েটার আমাকে ছাত্রজীবনের শেষভাগ থেকে চাকুরে জীবনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শীতে আশ্রয় দিয়েছিল। তারপর স্ত্রীযোগে সোয়েটার বিয়োগ হল। প্রথম দিকে স্ত্রীরা দু-এক বছর বড় মধুর ব্যবহার করে থাকেন। অঙ্গে বৌভাতের রাতে পাওয়া কখনও নীল শাড়ি, কখনও লাল শাড়ি। এলো চুলে ফুলশয্যা আর গায়ে-হলুদের তত্ত্বে পাওয়া গন্ধ তেলের সুবাস। কপালে আঁকা যত্নের গোল টিপ। মুখে মৃদু শুনচো, শুনচো সম্বোধন। স্বামীরাও তখন পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকে পোষা বেড়ালের মত। ডাকের সে কি বাহার ! সোহাগে জ্বরজ্বর, হ্যাঁগা। স্ত্রী আমার সেই পাটকেল রঙের সোয়েটারটিকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করল। এ আবার মানুষে গায়ে দেয় ! যেন এতকাল আমি জানোয়ার ছিলুম, বিবাহের পর মনুষ্য পদবাচ্য হয়েছি। (বছর চারেক পরে অবশ্য আবার আমি জানোয়ার হয়ে গেছি। এখন উঠতে-বসতে শুনি, জানোয়ারের হাতে পড়ে জীবনটা গেল। তার মানে স্বামী পুরনো হলেই জানোয়ার হয়ে যায়। যেমন চামড়া পাকা হলে জুতো হয়।)

প্রথমে আলমারির এক কোণে, তারপর আলমারির পেছনে, সব শেষে সেই সোয়েটার এসে পড়ল কয়লার গাদায়। অবশেষে সেটির মালিক হল আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে তার স্বামী। আর আমার স্ত্রী নস্যি রঙের উলের জমিতে হলুদ রঙের সাপ খেলিয়ে বেশ আহামরি গোছের একটি বুকখোলা

সোয়েটার বুনে দিলে। মেডেন সং-এর মত মেডেন সোয়েটার। সেই প্রথম আর সেই শেষ। অমন পাপ কর্ম সে আর দ্বিতীয়বার করেনি। (পুরুনো স্বামীর মত পাপী ব্যক্তি পুলিসের খাতাতেও নেই। ছুপা রুস্তম)

বছর ঘুরতেই খোকা। আবার বছর ঘুরতেই খুকী। স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেল। জননীর অনেক যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার অংশীদার হয়েই জীবন কাটাতে হবে। সুখের সীমানা বড় সঙ্কীর্ণ। সেই স্ত্রী এখনও সোয়েটার বোনে তবে আমার নয়, ছেলেমেয়ের। ইতিমধ্যে তার নিজস্ব জগৎও বেশ বড় হয়েছে। হাঁকডাক বেড়েছে। ঠাকুরপো-টাকুরপোও গোটাকতক জুটেছে। তাদের জন্যেও মাঝে মধ্যে সোয়েটার বোনার সময় করে নিতে পেরেছে। আমি ত ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর। আমার স্বাদ কমে গেছে। আমার বাহবার তেমন দাম নেই। আমি খুশি হলেই বা কি, অখুশি হলেই বা কি, (স্বামীরা আসলে ক্লীব লিঙ্গ। সামান্য আস্কারায় নিজেদের পুংলিঙ্গ ভেবে আস্ফালন প্রকাশ করে যথাস্থানে যথোচিত ঠোক্কর খেয়ে একপাশে চিত হয়ে পড়ে। অনেকটা বিরাট আকৃতির গুবরে পোকার মত। ঘরে ঢুকে জেট-প্লেনের মত সগর্জনে খুব উড়ছে। ভীতু ভাবছে না জানি কি মাল। যার আয়তন আর আওযাজ এত সাংঘাতিক তার কামড় নিশ্চয়ই মারাত্মক হবে। কিন্তু যে জানে সে জানে। উড়তে উড়তে এক সময় দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়বে আর একবার চিত হলেই ভোলা মহেশ্বর। পড়ে পড়ে সারা রাত শুঁড় নাড়বে। সকালে চিত থেকে সোজা করে দাও গোঁ-গোঁ করে উড়ে বাইরে চলে যাবে। বিবাহিত মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মিল। বাড়ি ঢুকল গোঁ-গোঁ করতে করতে। স্ত্রী ছাড়া সকলেই তটস্থ। ঠ্যাকাস করে পয়লা ধাক্কাতেই ফ্ল্যাট। বাবু চিত হয়ে রইলেন। সকালে ঝ্যাঁটা দিয়ে উপুড় করে দাও। সামনে এককাপ চা ধর। তারপর দেখ বাজার, দোকান সব ঠিকঠাক। ন'টার সময় উড়তে উড়তে কর্মস্থলে। অত বড় ক্ষমতাশালী মহাদেব। তাঁকে চিত করে সেই যে একবার মা কালী বুকে উঠে দাঁড়ালেন আজও তিনি সেইভাবে পড়ে আছেন আর উঠতে হল না।

মানুষের জ্ঞানোদয় হলে তার আর কোনও দুঃখ থাকে না। আমারও নেই। প্রত্যাশাই দুঃখের মূল কারণ। আমি মূলোচ্ছেদ করে দিব্যি আছি। আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আর কিছুই আশা করি না। আমি জানি সকালের কুয়াশার মতই স্ত্রীর প্রেম ক্ষণস্থায়ী। (শুনেছি জাপানে এক ধরনের মারাত্মক বিষাক্ত মাছ পাওয়া যায়। সেই বিষ বের করে যাঁরা রাঁধতে পারেন তাঁরা জানেন এর চেয়ে সুস্বাদু মাছ আর দ্বিতীয় নেই। স্ত্রীও অনেকটা সেই রকম। বিষ বের করে যাঁরা নাড়াচাড়া করার কৌশল জানেন তাঁরা বলেন, ধনধনা ধন ধনা, এ-ধন যার ঘরে নেই তার কিসের ধিনতাধিনা।) সংসারে থাকবে ভারবাহী বলদের মত। সৃষ্টিরক্ষার জন্যে ঈশ্বর তোমাকে ফাঁদে ফেলবেনই। তোমার নিজেরও কিছু মুখ্যুমি থাকবে। সব মিলিয়ে ন্যাজে গোবরে হয়ে জীবন কাটাতে হবে।

সবই যখন জানি তখন একটা সোয়েটার নিয়ে এত ধানাইপানাই কেন ? মানুষের ভ্রম হয়, মতিভ্রম হয়। আমার মতিভ্রম হয়েছিল। হাঁড়ির একটা চাল তুলে টিপে দেখে সব চালের অবস্থা বুঝেও বুঝিনি। একটু স্নেহটেহ, প্রেমট্রেম খুঁজতে আবার ছিপ ফেলেছিলুম। আমার মনে হয়েছিল জীবনটা অনেকটা কম্বিনেশান তালার মত। ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় নম্বরে নম্বর মিলে গেলেই খুলে যাবে। এই মহিলাটির সঙ্গে মিল হয়নি, কুছ পরোয়া নেই। কম্বিনেশান মেলাতে পারিনি, তাই সংসারের ফটকে টাম্বলার তালার মত গোমড়া মুখে ঝুলতেই থাকবে সারা জীবন। থাকুক। কত কিছুই ত খোলে না জীবনে। সংসারে কত শিশি থাকে যার ঢাকনা খোলা যায় না। আড়প্যাচ হয়ে পড়ে থাকে। গরম জলে চুবিয়ে, আগুনের ছেঁকা দিয়েও খোলা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলে, ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড। ভুল হতে হতে এক সময় মিলে যাবে। স্ত্রীরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলের মাশুল। মুষল বিশেষ। সংসারের মোহ-মুদ্‌গর। বিবাহের পরই বোঝা যায় এ-তালার চাবি আমার হাতে নেই। আমি হলাম অন্য তালার চাবি।

সেই তালাটি যে অফিসে আমার চেয়ারের তিনটি চেয়ার পরে এতকাল বসে বসে ফাইল নাড়তেন তা কি আমি জানতুম ! (বিবাহ না করিলে মানুষের দৃষ্টি খোলে না) পৃথিবীতে স্ত্রী-নিগৃহীত স্বামী যেমন আছে তেমনি স্বামী-নিগৃহীত স্ত্রীও আছেন। বিধাতার কৌতুকে সবলে দুর্বলেই জোড় বাঁধে। কদাচিৎ সবলে সবলে মোলাকাত যে হয় না তা হয়। পাড়ায় এই রকমের দম্পতি দু-একটি দেখা যায়, শোনাও যায়। শোনা যাবে না কেন, তাঁরা এতই সরব এবং রোষযুক্ত যে তাঁদের সৌরভ যোজন বিস্তৃত। যাই হোক এ রকম হাম ভি মিলিটারি তোম ভি মিলিটারি গোছের মিলন বিধাতার হাত ফসকেই বেরিয়ে যায়। (আমি মাঝ নদীতে একবার একটা নৌকো দেখেছিলুম। হাল, দাঁড় ফেলে দুই মাঝিতে পাটাতনে দাঁড়িয়ে মল্লযুদ্ধ করছে। নৌকো ভেসে চলেছে স্রোতের টানে। জীবনও ত তাই। হাল ধরি আর না ধরি ভাসতে ভাসতে ঠিক চলে যায় মৃত্যু মোহানায়।)

তা সেই শান্ত চেহারার, মিষ্ট স্বভাবের মহিলাটির সঙ্গে সামান্য উসখুসেই একটা হৃদ্যতা জন্মে গেল। জন্মাতেই পারে। এক পালকের পাখি এক জায়গায় জড় হয়। আমার ত কোন দোষ ছিল না। আমার স্ত্রীর উপেক্ষাতেই আমার বিপথে গমন। এ ত জানা কথাই, ছেলেমেয়েরা স্নেহ ভালবাসা না পেলেই কুসঙ্গে চলে যায়। আমি স্বামী হলেও ছেলে ত, আর যার সঙ্গে আমার ভাব ভালবাসা সে অন্যের স্ত্রী হলেও মেয়ে ত। এ-যুক্তি জজেও মানবে। আর দুজনেই ঘা খাওয়া প্রাণী। তা ছাড়া 'ঘৃতশাস্ত্রে' বলেছে— অগ্নি সমীপে ঘৃতের অবস্থানে অগ্নি উদ্দীপিত হয়। পুরুষ আর নারী সেই অগ্নি ও ঘৃত ! কে অগ্নি, কে ঘৃত তা জানি না। শাস্ত্র বাক্যে সাবধান না হয়ে কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষ দহনশীল ও দাহ্য বস্তু দুটিকে এত পাশাপাশি রাখলেন কেন ? দোষ আমার নয়। দোষ

যখন আমার নয় বিবেক তখন মুক্ত। বেশ করেছি ভাব করেছি। কার তাতে কি। (কার বাপের কি ?— বললে, শ্বশুর মশাইকে বোঝায়। নিগৃহীত স্বামী হলেও আমি অভদ্র নই) নিজের স্ত্রীর যখন সময় নেই, মেজাজ নেই, তখন অন্যের বাতিল স্ত্রীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ে দোষের কিছু নেই। (সমাজ এখন অনেক লিবার‍্যাল) কথা বলতে গেলেই সংসারের কথা। হরেক উপদেশ। পিতার কর্তব্য কি ? কন্যার বিবাহ। অমুকের তমুক। গুষ্টির পিণ্ডি। মুখ খুলেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চুলোচুলি, খুনোখুনি, দক্ষযজ্ঞ। (স্ত্রীরা কত আপনজন ন্যাজে পা পড়লেই বোঝা যায়। স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কোন ব্যাটা বলেছে বিবাহবন্ধন জন্মের বন্ধন, সাতপাকে বাঁধা। কিস্যুই তিনি জানতেন না। এলো সুতোয় একতে ঘুড়ি ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে। পান থেকে চুন খসলেই শ্বশুর মহাশয়ের কন্যার অন্য রূপ। কে ওই বামা এলোচুলে ! বড় পলকা বন্ধন। ঘাঁটাঘাঁটি না করলে বেশ আছে। ঘাঁটালেই ভীমরুলের চাকে খোঁচা। স্ত্রীর পিরিত চাকের মধু। চাকেই থাক।) অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য চেহারা। হাসিহাসি মুখ। উজ্জ্বল চোখ। ডগমগ অবস্থা। (রামকৃষ্ণ বলতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে লড়ে যাবে। লড়ে যাবে বলেননি, সংসার করতে বলেছিলেন। তার মানে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে দাপটে সংসার। আর প্রবাদ আছে, যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া) আমি পিতা হতে পারি, বাজার সরকার হতে পারি, মুদ্দোফরাশ হতে পারি, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো হতে পারি, পারি না কেবল স্নেহভাজন স্বামী হতে। শাস্ত্রে আছে যেমন কুকুর তেমন মুগুর, আছে বাঘা ওল বুনো তেঁতুল। সুতরাং এই জাতীয় একস্ট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স-এ আমার অধিকার আছে। আমার বিবেকের সমর্থন আছে। তা ছাড়া পার্শ্ববর্তিনী মহিলাটির সঙ্গে এমন কিছু করছি না যা অসামাজিক।

দু-জনে অবসর সময়ে সুখ দুঃখের আলোচনা করি। কে ক'ঘা খেলুম। কে কেমন আঁচড়ালে। অন্যমনস্ক চীনেবাদাম দাঁতে কাটতে কাটতে দীর্ঘশ্বাস ফেলা। একই চাতালে দাঁড়িয়ে ক্ষত অনুসন্ধান আর লেহন। অনেকটা কুকুরের মত। কামড়া-কামড়ি, ঝটাপটির পর একপাশে বসে বসে কেমন তারিয়ে তারিয়ে চাটে। এইভাবে মনের দুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক ধরনের সান্নিধ্য গড়ে উঠল। দু-জনেরই মনে হতে লাগল এ জীবনে যা হবার নয় তাই হলে একটা সুখের সংসার গড়ে উঠত। একটা খুব ভাল প্লট কাঁচা লেখকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। সমবেদনায় বেদনামাখা দুটো মন এক হয়ে গেল। আমরা অফিস ছেড়ে ছুটির পর মাঝে মধ্যে পার্কে গিয়ে পাশাপাশি বসতে শুরু করলুম। একে বলে সংযত প্রেম। যৌবনের ফোঁসফোঁসানি নেই, আবেগ নেই। টুকটাক কথা, ভাঁড়ে চা, মাঝে মধ্যে একটু দর্শন আলোচনা আর আশেপাশের জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতীদের দেখে তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আঁতকে ওঠা। একটা দুটো সিনেমাও হত। সেকেন্ড হ্যান্ড প্রেমের একটা আলাদা মাধুর্য। কোনও

দাবি নেই, বন্ধন নেই, তিক্ততা নেই, এক সময় যে যার চুল্লিতে ফিরে যাও। পরের দিন মিলিয়ে দেখ কে কতটা ঝলসালে।

চলতে চলতে মানুষ কত কি আবিষ্কার করে। হঠাৎ মনে হতে লাগল আমার স্ত্রীর নাকটা ভীষণ ফ্ল্যাট। মুখের অনেকটা জায়গা জুড়ে আনাড়ির হাতে তৈরি সিঙাড়ার খোলের মত পড়ে আছে। চোখে কোনও বুদ্ধির দীপ্তি নেই। প্যাঁচার মত গোলগোল। চুলে তেমন চেকনাই নেই। ঘোড়ার বালামচির মত সোঁটা সোঁটা। হাতের রান্না তেমন ভাল নয়। সব কাজেই অপটু। শরীরে তেমন লাবণ্য নেই। কপালটা আবার উঁচু। (কি করে তখন যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতুম ঈশ্বরই জানেন। তখন বোধ হয় অন্ধ ছিলুম। বেড়ালের চোখ ফোটে দেরিতে।)

রাতে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে মনে হয় পাঁচিলের পাশে শুয়ে আছি। যে কোনও কথারই হুঁ আর হাঁ ছাড়া কোনও উত্তর নেই। এক অক্ষরের আলাপন। শরীরে হাত ঠেকলেই খ্যাঁক করে ওঠে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি স্বামীর পাশে শুয়ে আছে না ভাসুরের পাশে। শোবার সময় ভগবানের নাম নিতে হয়। হে করুণাময়! আমাকে সুনিদ্রার তটে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে চল। সে সব নেই। হঠাৎ অন্ধকারে বলে উঠল, চিনি ফুরলো, কাল সকালের চায়ের মত পড়ে আছে। চা আনতে হবে। এবারের চায়ে তেমন [illegible]র ছিল না। তার মানে খরচ বেশি হয়েছে। পরশু তপুর ছেলের অন্ন[illegible] কিছু দিতে হবে! কি দেবে? সামনের শনিবার বিকাশের বিয়ে। কি দেবে? অবিরাম দেহি দেহি। যেন ট্যাঁকশালের পাশে এসে শুয়েছে। সব সময় স্বার্থ। বিছানাটা আলাদা করে নিতে হবে। কি দরকার বাবা! ভুলে কোথাও হাতটাত পড়ে গেলে বড় অপমানিত হতে হয়। কপালে! ভীষণ মাথা ধরেছে। কাঁধে? সংসারের ভার। পেটে বোধ হয় টিউমার। পায়ে গুঁপো। এ জিনিস বিছানায় কেন? ডাক্তারের টেবিলে শোয়া উচিত ছিল।

সোয়েটার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। না সরে আসতে পারিনি। শীত ফিরে ফিরে আসে। এক মাঘে শীত যায় না। প্রথম শীতেই আমার সেই অফিসের মহিলা সুন্দর একটি সোয়েটার উপহার দিলেন। আমরা দুজনে একটা ইংরেজী ছবি দেখলাম। সিনেমা হলে সেই সোয়েটারটা তাঁর কোলে থেকে গরম হয়ে উঠল। নস্যি রঙের উলে নকশার বিনুনি হাত ধরাধরি করে চলেছে। হাতে নিলেই বোঝা যায় দামী উল। হালকা, নরম। ছবি দেখতে দেখতে মন খুশীতে নেচে উঠেছিল জয়ের আনন্দে। (মন জয় করার যে গর্ব। রাজত্ব জয় কোথায় লাগে!) নতুন এক মহাদেশে নৌকো নোঙর ফেলেছে। এক একটি মন অজানা এক একটি মহাদেশ। ইংরেজী বই চলার মাঝে মাঝেই মনে বাঙলা গান গুমরে গুমরে উঠছে, আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী!

তারিণী জানতেন, ব্যাটাচ্ছেলে তোর কি হবে। প্যাকেট বগলে বাস্এর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। বলদাত্রী, সোয়েটার দাত্রী চলে গেছেন। পরে আছি স্ত্রীর

হাতে বোনা প্রেমের তাজমহল। সম্পর্কের শুরু ও শেষের উল-ফলক (মর্মর ফলকের মতই, হেথায় চিরশায়িত সেই মানুষটির প্রেম। আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে, ঘাড়ে ধরে পিতা গছিয়েছেন। ভুল করে বোনা সোয়েটার ভুল অঙ্গে চেপে বসেছে।) গায়ের সোয়েটার যেন বগলের সোয়েটারকে প্রশ্ন করছে কোথায় চল্লে ? কেন, তোমার সঙ্গে ! তুমি যে ইললিগ্যাল মানিক। ঝাঁটা খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। তুমি কোন উৎস হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়াছ ? বাঘের ঘরে কি ঘোগ বাসা বাঁধিতে চলিয়াছে ? তুমি ত আমার সতীন হে। একটু ভয় ভয় ভাব যে হচ্ছে না তা নয়। অফিস থেকে সিনেমা, সোয়েটার উপহার, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে পাশাপাশি বসে থাকা, রেস্তোরাঁ, খানা, এতক্ষণে বেশ ঘোরে ছিলুম। এইবার একা একা বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনটা যেন ক্রমশই এলিয়ে পড়ছে। সে শক্তি আর নেই। চোখের আড়ালে আত্মিক অনুসন্ধানে বিপদের ঝুঁকি কম। বামাল বাড়ি ঢুকলে চুলোচুলি ত হবেই। সোয়েটার ত আর আসমান থেকে পড়ে না, ছেলেরাও বোনে না। কোন্ মহিলার এই কীর্তি ? কিসের এই খাতির। (যার ওপর দুর্ব্যবহার করা হয় তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়। মার খেতে খেতে পালিয়ে না যায়। অন্য কোথাও ছিটকে গিয়ে আদরে না থাকে। আমার পাঁঠা। ন্যাজে কাটব, মুড়োয় কাটব।) হঠাৎ তোমাকে কেন সোয়েটার বুনে দেওয়া। সোহাগ না থাক সজাগ দৃষ্টি ঠিক আছে। (কুস্তিগীর খেটেখুটে, তেল ঢেলে জমি তৈরি করে, তার ওপর নিত্য দাপাদাপি করার জন্যে। এর নাম আখড়া। স্বামীরা হল স্ত্রীদের আখড়া। যে যার আখড়ায় কুস্তি করবে। অন্যের প্রবেশ নিষেধ।) এমন জিনিস রাস্তায় ত আর ফেলে দিতে পারি না। তা ছাড়া এর প্রতিটি বুনোনে ভাললাগা, ভালবাসা। যা হয় হোক সতীন বগলেই বাড়ি ঢুকবো। ঠাণ্ডা লড়াই একদিন গরম লড়াই হবেই। যত তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যায় স্নায়ুর পক্ষে ততই ভাল। ধিকি ধিকি তুষের আগুনের মত না জ্বলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক। (অশান্তিটাও একসময় বিলাস হয়ে দাঁড়ায়। উট যেমন কাঁটা চিবিয়ে রক্তাক্ত হতে ভালবাসে।)

সোয়েটার বগলে বাড়ি ঢোকার দিনটিতে তেমন কিছু হল না। কারণ আমার আসা, আমার যাওয়া তেমন ভাবে আর কাবুর নজরে পড়ে না। সে ছিল প্রথম দিকে। ফিরতে একটু দেরি হলে দূর থেকেই দেখতে পেতুম জানালায় একটি মুখ। আমি পথ চেয়ে রব। বেরোবার সময় ফিসফিসে অনুরোধ, তাড়াতাড়ি ফিরো। বেশি রাত করো না। (আমাদের সেই মঙ্গলা গরুটার মত। দেশের বাড়িতে দেখেছি। সকালে চরতে বেরলো। জানা আছে বিকেলে ঠিক ফিরে আসবে যেখানেই থাকুক। কোনও চিন্তা নেই। মাঝে কেউ একবার গোয়ালে উঁকি মেরে আসত। মঙ্গলা শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। মঙ্গলা দুধ দিত আমি টাকা দি এই যা তফাৎ) সুতরাং নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকে প্যাকেটটা আলমারিতে গুঁজে রাখলাম। শীত আসুক তখন সাদা প্যান্টের সঙ্গে পরা যাবে। আর তখনই

হবে ধুম ধাড়াক্কা। ততদিন সম্পর্কটা আরও বিষিয়ে উঠবে। ফোড়া থেকে কার্বঙ্কল।

শীত এল। যেমন আসে। মৃদু আমেজ। প্রথম কয়েকদিন আমার সেই পেটেন্ট সোয়েটার দিয়েই উদ্বোধন করা গেল। ঝলঝলে মাল। রঙ জ্বলে গেছে। যৌবন ঝরে গিয়ে বার্ধক্যের দশা। কাপ্তেনী করার বয়েস চলে গেছে বলে মানিয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছি শীত চলে গেলেই ওটাকে আবার খুলে বোনা হবে। যেমন শোনা যায় রামরাজত্ব আবার আসবে। যাই হোক নতুন সোয়েটারের তখনও তেমন প্রয়োজন হল না। চলছে চলুক। এরই মধ্যে একদিন বৃষ্টি হয়ে শীতটা জাঁকিয়ে পড়ল। অফিসের সেই মহিলা বললেন, সোয়েটারটা এবার একদিন পরুন। তুলে রেখে রেখে পোকায় যে কেটে দেবে। গিন্নীর ভয়ে পরছেন না বুঝি ! (পৃথিবীতে কত রকমের ভয় ! আরশোলার ভয়, সাপের ভয়, ছোঁযাচে রোগের ভয়, মাসের শেষে কাবুর বিয়ের ভয়, বড়কত্তার ভয়, সবার সেরা গিন্নীর ভয়।)

উপলক্ষ একটা জুটে গেল। আজ অফিসের এক সহকর্মীর বউভাত। সদলে যেতে হবে। সামান্য মাঞ্জা দিলে ক্ষতি কি ? সাদা প্যান্টের ওপর নতুন সোয়েটার। যথাস্থানে হাত চলে গেল। হাত ফিরে এল। প্যাকেট স্থানচ্যুত, আলমারি তোলপাড়। শীতল একটি গলা শোনা গেল, 'কি খোঁজা হচ্ছে ? সব যে বারোটা বেজে গেল। কি চাই আমাকে বললেই ত হয়। হাঁটকেপাটকে একসা !

'একটা প্যাকেট ছিল।'

'কিসেব ?'

'সোয়েটারের।'

'ও সোয়েটার ! নস্যি নস্যি রঙ। কার সোয়েটার ?'

'আমার, আবার কার ?'

'কে বুনে দিলে ?'

'বউদি।'

'তোমার আবার বউদি কোথা থেকে এল ?'

'তোমার একগাদা ঠাকুরপো থাকতে পারে আমার একজন বউদি থাকতে পারে না।'

'রসের বউদি ! তলে তলে আজকাল এইসব হচ্ছে। বুড়ো বয়েসে লজ্জা করে না ! ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে। মুখ দেখাবে কি করে ?'

'তুমি যদি দেখাতে পার আমিও পারব।'

'তার মানে ?'

'বুঝে নাও।' আবার আমি আলমারি হাঁটকাতে শুরু করলাম।

'তার মানে আমিও তোমার মত চরিত্রহীন !'

'যে যেমন অর্থ করে।'

'আচ্ছা-আ।'

'আচ্ছা' শব্দটা ধারালো ছুরির মত হাওয়া কেটে গেল। আলমারির সব কিছু ঠিকঠাক রেখে সোয়েটার খোঁজার ধৈর্য আর নেই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুমদাম করে সব ফেলতে লাগলুম। রাগে সর্বশরীর জ্বলছে।

'সোয়েটার ওখানে নেই।'

'কোন চুলোয় আছে ?'

'ভবানীপুরে।'

'ভবানীপুরে ?'

'হ্যাঁ ভবানীপুরে। তোমার ছোটশালা পরে চলে গেছে।'

'বাঃ, বারে শ্বশুরবাড়ি। যেখানে যা পাবে হাতিয়ে নিয়ে চলে যাবে। দেবার মুরোদ নেই, নেবার বেলায় শত হস্ত।'

'কি নিয়েছে শুনি ? কি-ই বা তুমি দিয়েছ ?'

'কি নেয় না শুনি ! দেওয়া ? দেওয়ার অপেক্ষা রাখে ? তোমার ওই বাহারের ছোটভাইটি যেখানে যা পাবে ঝেড়ে নিয়ে চলে যাবে। যেন কর্পোরেশানের মাল রে ! এই ত সেদিন একটা জামা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। কি ? না জামার রঙটা ভীষণ ভাল। ভীষণ অ্যাপিলিং—ইংরিজী শিখেছে, ইংরিজী। আমার আর ভাল কিছু পরে দরকার নেই। ছেঁড়া পরে ঘুরে বেড়াই। আর তুমি একটি গোমুখ্যু। বাপের বাড়ি, [illegible]র বাড়ি করে সারাটা জীবন হেদিয়ে মলে।'

'তাই ত বলবে ! হ্যাদানোর কি দেখলে ? আর তুমি যখন আমার শাড়ি ধরে টানাটানি কর !'

'তোমার শাড়ি ? তোমার ত্রিসীমানায় যেতে আমার ঘেন্না করে। আমি জানি, আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে বন ভাল।'

'তা ঠিক। পর ত ভাল হবেই। বাইরে বাইরে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত ফষ্টিনষ্টি। তাদের ত আর অন্য কোনও দায় দায়িত্ব নিতে হবে না। ঘরেরটাকে জিইয়ে রেখে বাইরের একএকটা ধরে একটু খেলু খেলু। বাবুর খেলা হচ্ছে। খেলা। হাজারবার তাগাদার পর একটা শাড়ি এল। না পরে তুলে রাখলাম। তারপর যেই একটা বিয়ে এল বাবুর অমনি নাকে কান্না, মাসের শেষ, বড় টানাটানি, কি করা যায়, তোমার ওই শাড়িটা দিয়েই এ যাত্রা ম্যানেজ করি। তোমাকে আরও ভাল শাড়ি কিনে দেব। ব্যস হয়ে গেল। ফুর্তিতে টাকা ওড়ালে সংসারের এই হালই হয়। তোমার রকমসকম দেখে আমারও ঘেন্না ধরে গেছে। তোমার ত্রিসীমানায়, তোমার কোন কিছুতে থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'থাকার দরকার নেই। এসেছি একলা যাবোও একলা। তোমার ভাইকে এই সোয়েটারটা, এই শালটা, এই জামাটা, এই প্যান্টটা, এই কলার অলা গেঞ্জিটা দয়া করে নিয়ে যেতে বোলো। আমি সন্ন্যাসী হয়েই দিন কাটাব।'

সব টেনে টেনে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিলুম। ভেতরটা বেশ খোলসা

হল। কোষ্ঠকাঠিন্যের পরের আনন্দ। অফিসে বেরোবার তাড়া না থাকলে বেশ ভালভাবে লড়া যেত। যাক তবু কিছুটা লণ্ডভণ্ড করা গেছে। (ক্রোধে শরীরের রক্তসঞ্চালন ভাল হয়। কল্পনার স্বপ্নজগৎ থেকে বাস্তবে বেশ কিছুদিনের জন্যে ফিরে আসা সম্ভব হয়। গণ্ডারের মত গোঁ গোঁ করে গোত্তা মারার জায়গার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। মুহ্যমান ভাব কেটে যায়। কাজে কর্মে গতি আসে।)

অফিসে আমার সেই বান্ধবী বললেন, 'কি হল? কাল নতুন সোয়েটার পরার কথা বলায় একেবারে উদোম হয়ে চলে এলেন যে?'

'বাহুল্য বর্জন!' বলতে পারলুম না, যে আপনার সযত্নে বোনা সোয়েটার ভবানীপুরের এক মাল পরে আশুতোষ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে শিকার করছে।

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে? আজ ফিরতে অনেক রাত হবে ত!'

'বিকল্প ব্যবস্থা আছে।'

'সেটা কি?'

'ছিলিম। বিকেলে বেরিয়ে বটতলার বাবাজির কাছে উবু হয়ে বসে দু টান মেরে যাব।'

ঠাণ্ডা লাগার কথা আমার বউও বলেছিল তবে বাঁকা করে। 'ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হলে সেবা করতে পারব না কিন্তু।' সেবার নমুনা তোমার দেখা আছে। ছেলেবেলায় আমাদের পড়তে বসার মত। এদিকে তাকাচ্ছি, ওদিকে তাকাচ্ছি, কাগজের গোল্লা তৈরি করছি, পেনসিল চিবোচ্ছি। শেষে হাওয়ায় বইয়ের পাতা উড়ছে, পড়ুয়া মাঠে দৌড়াচ্ছে। তোমার সেবাও ত তাই। আমার কপাল রইল কপালে। তোমার হাত রইলো হাতে। মুখে বারকতক বললে, কপালে হাত বুলিয়ে দোব? কপালে?

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল। দশটা-টশটা হবে। শোবার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। এতদিনের জোড়া খাট সিঙ্গল হয়ে গেছে। ঘরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। শব্দ করলে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। ছেলে আর মেয়ে দুজনেই ঘরে ছিল। বড়সড় হয়েছে। বুঝতে সুঝতে শিখেছে। মেয়ে বলল, 'কি গো তোমার রাগ কমেছে?'

ছেলে বলল, 'কক ফাইটের ভয়ে রাত করে ফিরলে?'

আরে তাই ত, বেরোবার সময় বলে যেতে ভুলেই গেছি, আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অবাক হয়ে আমাকে ঘরের এপাশে ওপাশে ঘুরতে দেখে ছেলে বললে, 'আর ফাইট করতে পারবে না। মাতাঠাকুরাণী আলাদা হয়ে গেছে।'

মেয়ে বললে, 'ফিমেল খাটটা মেল খাটকে ডাইভোর্স করেছে।'

আজকাল ছেলেমেয়েরা কি সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। ভাল ভাল। যত তাড়াতাড়ি বুঝতে টুঝতে শেখে ততই ভাল। আগে যাত্রা শুরু করলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। জামা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি ব্যাপার, তোমরা দুটিতে এখনও এখানে বসে?'

মেয়ে বললে, 'তোমাদের একটু হেল্প করার জন্যে বসে আছি।'

'হেল্প মানে ?'

'এখন ত দিন কতক তোমাদের কথা বন্ধ থাকবে তাই আমরা দুজনে দূতের কাজ করব।'

ছেলে বললে, 'একবার দেখে নাও হাতের কাছে সব ঠিক আছে কি না। আমরা ত জানি না তোমার কি লাগে না লাগে।'

মেয়ে বলল, 'যতটা জানি সব গুছিয়ে রেখেছি। মাকে তোমার এখন কিছু বলার আছে ?'

'হ্যাঁ আছে। বলে দাও, বাবা কিছু খাবে না।'

ছেলে বললে, 'জানতাম, তুমি আজ খাবে না।' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে, 'বাইরে ভাল করে খেয়ে এসেছ ত ? তুমি লড়ে যাও। আমরা তোমাদের পেছনে আছি।'

মেয়ে বললে, 'মায়ের সকাল থেকেই উপোস চলছে। আমাদের মাছের ভাগ বেড়ে গেছে।'

ছেলে বললে, 'তা হলে তুমি এক গেলাস জল খেয়ে এবার শুয়ে পড়। বেশ শীত পড়েছে। ওষুধ-টষুধ কিছু খাবে ? এ সময় আবার জ্বরে পড়ে হেরে যেও না যেন। প্রত্যেকবার তুমিই হার। এবার কিন্তু জিততে হবে।'

'না ওষুধ-টষুধ লাগবে না। এ ঠাণ্ডায় জ্বর হবে না।'

'তুমি সোয়েটারটা পরলে না কেন ? একটু বোকা আছ। ছোট মামা তোমার কি নেবে ? নিয়ে পার পাবে ? আমরা আছি না ! মামার বাড়ি যাই আর আসার সময় ভাল প্যান্টটা জামাটা, যা পাই বাগিয়ে আনি। তুমিও যেমন ! এই ত ও ! মাসীর দুখানা শাড়ি নিয়ে চলে এসেছে।'

মেয়ে বললে, 'আর তিনখানা আনতে পারলেই সামনে সমান হয়ে যাবে রে দাদা।'

'ও মায়ের বুঝি পাঁচখানা নিয়ে গেছে ? চল তা হলে আর একবার যাই !'

মেয়ে এক গেলাস জল এনে চাপা দিয়ে রেখে গেল। মশারি-টশারি বেশ পরিপাটি করে খাটান। ছেলে মাকে বলছে শুনলাম, 'তোমার কিছু বলার আছে মা ?'

'আছে। খাবে না যখন আগে বলতে কি হয়েছিল ? পয়সা কি সস্তা ?'

ছেলে ওঘর থেকে হেঁকে বললে, 'পয়সা কি সস্তা ? মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়ার খরচ। পয়সা কি সস্তা ?' তারপর মাকে বলছে শুনলুম, 'কি কি খেতে হবে বল, আমরা দু-জনে সাবাড় করে দিয়ে যাই। নষ্ট হওয়াটা ঠিক নয় মা। যা বাজার কি বল ? ভাগ্যিস আমরা ছিলুম ?'

আমাদের কথাই ওদের দিক থেকে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। জীবনের

অংশীদার বেড়ে গেছে। একা একা আর কিছু করা যাবে না। সব স্বাধীনতা চলে গেছে এমন কি মান অভিমানের স্বাধীনতাও। যাক যা হবার তা হয়েছে। পা পিছলে গেলে পড়ে যেতে হয়। জীবন পিছলে গেলে সংসার স্রোতে এই ভাবেই ভেসে যেতে হয়। সাঁতার জানলেও কোন লাভ হয় না।

বিছানায় শুয়ে পড়েছি। ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

মেয়ে বললে, 'তোমার আবার একা শুতে ভয় করবে না ত?'

'ভয়ের কি আছে? ভয় করবে কেন?'

ছেলে বললে, 'যদি ভয় করে তাহলে তুমি যেন আবার মায়ের বিছানায় এসে ঢুকো না? আমাদের ঘরে চলে আসবে। কেমন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব হয়েছে। অনেক উপদেশ ঝেড়েছিস, এবার শুয়ে পড়।'

অন্যদিন আলো জ্বেলে বেশি রাত পর্যন্ত পড়ার উপায় থাকে না। আর একজনের চোখে আলো লাগে। সারা দিন কি ভীষণ খাটুনি! ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আমাদের সারাদিন ত কোনও পরিশ্রম হয় না। অফিসে আমরা আড্ডা মারতে যাই। ফুর্তি করতে যাই। আজ আলো জ্বেলে ইচ্ছে করলে সারা রাত পড়া যায়। জীবন ছোট হয়ে আসছে। বরফের টুকরোর মত ক্রমশই গলে যাচ্ছে। কত কি পড়ার আছে, জানার আছে। যাবার দিনে পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখে যেতে পারব। কত রকমের খাবার আছে। কত দেশ আছে। কত রকমের জীবন আছে। পিঁপড়ের পিঠে খাওয়ার মত এক কোণে ধরে একটা ফুটো ফাটা করে সরে পড়া। সেই এক মহিলা, এক কণ্ঠস্বর, এক বাড়ি, এক ঘর, এক রাস্তা, এক অফিস। একই জগতে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে, থাকা আর না থাকার তফাতটাই ভুলে গেছি।

হ্যাঁ, অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে। আজ শুয়েই পড়া যাক। বিছানা ছোট হয়ে গিয়ে ঘরটা বড় হয়ে গেছে। কতটা নতুন জায়গা বেরিয়েছে। আলমারিটা যেন দূরে সরে গেছে। টেবিল আর চেয়ারটা যেন ছোট দেখাচ্ছে। যে দিকে খুশি ইচ্ছে মত হাত পা ছুঁড়ছি কারুর গায়ে লাগছে না। অন্ধকারে কোনও প্রতিবাদ ভেসে আসছে না। বিছানাটাও কেমন যেন বেশি শীতল মনে হচ্ছে। এতদিনের অভ্যাস, পাশে একটা প্রতিরোধ নিয়ে ঘুমোন! (মেছুনীকে রাজবাড়ির শয্যায় শুতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুতেই ঘুম আসে না। শেষে মাঝরাতে আঁশের ঝুড়িটাকে জল ছিটিয়ে মাথার পাশে রেখে তবেই ঘুমোতে পারল।)

ঘুম আর কিছুতেই আসতে চায় না। সারাদিন না খেয়ে আছে। এদিকে আমি একপেট ভালমন্দ খেয়ে শুয়ে আছি। না, আমি খোশামোদ করে খাওয়াতে পারব না। অসম্ভব। আমার বান্ধবী এখন কি করছে? নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে। কার পাশে শুয়েছে? সেই শয়তান লোকটার পাশে? তিনি নাকি অন্য এক

মহিলাতে আসক্ত। সে শয়তান, আমি শয়তান, স্ত্রী শয়তান ? দেবতারা কোথায় গেল কে জানে ? না, পরস্ত্রীর কথা চিন্তা করা উচিত নয়। নির্জন, অন্ধকার ঘরে, একা শয্যায় অন্য নারীর চিন্তা আক্ষেপ বাড়িয়ে তোলে। জীবনকে আরও অসহনীয় করে তোলে। অনেক বয়েস হয়েছে। আমার এক বন্ধু বলেছিল, পুণ্য করার জন্য সাহসের দরকার হয় না, পাপ করতে গেলে সাহস চাই। জেনুইন লম্পট হওয়া খুব শক্ত। সন্ন্যাসীকে যেমন সব ছাড়তে হয়, লম্পটকেও তেমনি সব ছাড়তে হয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়— তিন থাকতে নয়— আমার বউটাকে ঈশ্বর যদি একটু সুবুদ্ধি দিতেন। বেশ হত। সব সময় যেন কাঁকড়াবিছের মত খরখর করে বেড়াচ্ছে।

একটু ঘুম বোধ হয় এসেছিল। কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার পক্ষের রাত। বাইরে পাগলা হাওয়া উঠেছে। মাঝরাতে পৃথিবীটা কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়। নিজের পরিচিত ঘরটাও তখন বিশালে হারিয়ে যেতে চায়। মহাকাশে ড্যাবা ড্যাবা তারা। সমুদ্র থেকে মেঘ উঠছে। চারপাশ নিস্তব্ধ। মাঝে মধ্যে কুকুরের আর্তনাদ। পাশেরই কোনও বাড়িতে রোগের যন্ত্রণায় কেউ ওঁওঁ শব্দ করছে। নিঃশব্দে আকাশ গুটিয়ে চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। এত অন্ধকার, যেন জানালার বাইরে হাত বাড়ালে হাতে কালো রঙ লেগে যাবে।

ছেলেবেলা থেকেই আমার একটু ভূতের ভয় আছে। একা একা শুতে পারি না। একবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে তিন রাত ঠায় বিছানায় জেগে বসে কাটিয়েছি। এই যে ঘুম ভেঙে গেল আর আসবে না। এইবার একে একে তারা আসবে। হারু গলায় দড়ি দিয়েছিল। সেই হারু আসবে এখুনি। নিত্যর মা পুড়ে মরেছিল। সেই কালো, পোড়া কাঠের মত নিত্যর মা আসবে। বসন্ত খুন হয়েছিল। সে আসবে স্কন্ধকাটা হয়ে। সেই ছেলেটি জলে ভেসে উঠবে। গঙ্গায় যে ভাসছিল প্যান্ট জামা পরে উপুড় হয়ে। সবাই আসবে একে একে। শেষে এমন অবস্থা হবে ইচ্ছে হলেও বাথরুমে যাবার সাহস থাকবে না। এতখানি বয়েস হল তবু ভূতের ভয় আর গেল না। ইদানীং আবার চোরের ভয় ঢুকেছে। বাইরে সামান্য শব্দ হলেই মনে হচ্ছে কেউ পা টিপে টিপে হাঁটছে।

তবু বেশ কিছুক্ষণ মন শক্ত করে বিছানায় পড়ে রইলুম। চোখ বন্ধ। তবে বেশ জানি ঘরে আমি আর একা নই। অনেকে এসে গেছে। মন আর কোনও যুক্তি মানতে চাইছে না। রাত যে অচেনা। সত্য মিথ্যা, লৌকিক অলৌকিক সব ঢেকে দিয়েছে। বউয়ের সঙ্গে লড়াই আমি চালাতে পারব না। রাতে আমি বড় অসহায়। নরওয়ে হলে পারতুম, যেখানে ছমাস দিন, ছ মাস রাত। দিনের ছ মাস অন্তত ভূতের হাত থেকে নিষ্কৃতি। সাবিত্রী সত্যবানকে আগলে রেখেছিল বলে যমেও ছুঁতে পারেনি। স্ত্রী পাশে থাকলে ভূতে কি করবে গো। হাজার চেষ্টা করলেও আমার গলা দিয়ে এখন শব্দ বেরোবে না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও ঘরেও কি যেতে পারব। খাটের নীচে কি আছে কে জানে ? পা

নামালেই যদি টেনে ধরে। ভয়! কিসের ভয় তা জানি না। ভূত আছে কি নহে কেউ স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারবে কি? যার কাছে আছে তার কাছে আছে।

এইবার মনে হচ্ছে খাটের তলায় কে যেন ধীরে ধীরে তালে তালে টোকা মারছে। দূরে একটা কুকুর মড়াকান্না কাঁদছে। আর নয়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ও সব বান্ধবী-টান্ধবী কেউ কিছু নয়। বউই সব। প্রকৃতির বেগে, ভূতের তাড়ায় মানুষ সব পারে। গ্রাম্য কথাতেই আছে— হাগার নেই বাঘার ভয়। পাশের ঘরে কোনও মতে গিয়ে মশারীর দড়িমড়ি ছিঁড়ে হুড়মাড় হুড়মাড় করে সেই রাগিণী দেবীর ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম।

শীতের চেয়ে, ভূতের চেয়েও ঠাণ্ডা গলা ভেসে এল, 'এলে তাহলে? পারলে না শেষ পর্যন্ত?'

'না পারলুম না?'

'ঘেন্না করছে না?'

'না, ও ছিল কথার কথা। অন্তরের কথা নয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।' মনে হল মাঝরাতে সিনেমার রামকৃষ্ণ কথা বলে উঠলেন।

'এ ঘরে ভীষণ ঠাণ্ডা। উত্তরের ঘর, ড্যাম্প, ও ঘরে চল। রাতের যেটুকু বাকি আছে সেইটুকু অন্তত ঘুমিয়ে নাও।'

এত স্নেহ কোথায় ছিল চকমকি? ঘষা না লাগলে বুঝি আগুন বেরোয় না!

সকালে একেবারে সোনার পাতের মত রোদ উঠেছে। কোথায় কি? ভূতটুত এখন সব ভাগলবা। গরমগরম চা চলেছে। মন আর মেঘলা নেই। বর্ষার পরেই ত শরৎ আসে। বাঁ পাশে বসে আছে ছেলে। সে খুব দুঃখের গলায় বললে, 'এ বারেও হেরে গেলে?'

ডানপাশে বসেছে মেয়ে। সে খুব ভারিক্কি চালে, লেডি ডাক্তারের গলায় বললে, 'এবারেও ভূতের ভয়?'

ছেলে বললে, 'তা ছাড়া আবার কি?'

মেয়ে বললে, 'তোমাকে পাঁচু ঠাকুরের কাছ থেকে একটা মাদুলি এনে পরিয়ে দিতে হবে।'

ছেলে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমরা এবারে কদিন ঠাণ্ডা থাকবে?'

এর উত্তর আপাতত আমার জানা নেই। তোমাদের যখন বিয়ে হবে তোমরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তবে জীবনের সার কথা মনে হয় এতদিনে বুঝতে পেরেছি। ভাগ্যের চুল্লি থেকে নিশিদিন জোড়ায় জোড়ায় পেয়ালা পিরিচ বেরিয়ে আসছে, ডিজাইনে ডিজাইনে মিলিয়ে। একটি গেলে আর একটি খোঁড়া। যার সঙ্গে যা। যেমনটি মিলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ঠুংঠাং করতে করতে একদিন একটা ভাঙবেই। তখন অন্যটা পড়ে থাকবে সংসারের

এক কোণে অবহেলায়। যতক্ষণ জোড়ে আছে, দাপটে আছে। হাতে হাতে ঘুরছে। জীবনের নির্যাসে ভরা সেই পেয়ালা পিরিচ থেকে জীবনের সুগন্ধ বেরোচ্ছে। কখনও অসাবধানে ছলকে পড়ে গেলেও পিরিচেই জমা থাকছে। একদিন একটা ভাঙবেই। তবে কোন দিন কোনটা আমিই জানি না তা তোমাদের বলব কি ?

লেপ

বিনয় বিয়ে করে তিনটে বাঁশ পেয়েছে। একটা জ্যান্ত। সেটি হল তার বউ। অন্য দুটি হল ঘড়ি আর লেপ। আমার কথা নয়। স্বয়ং বিনয়ের স্বীকারোক্তি। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর বিনয় চুপচাপ ছিল। না খুশি, না অখুশি, একটা তৃরীয় অবস্থা। যত দিন যাচ্ছে বিনয় নীরব থেকে সরব হয়ে এখন রবরবা। কথায় কথায় সংসারের কথা আসবেই। শুরু হবে বউকে দিয়ে। বউ থেকে সেই ভদ্রমহিলার জন্মদাতায়। সেখান থেকে ঘড়ি। ঘড়ি থেকে লেপ। ঘড়িটাকে বিদায় করেছে। কব্জির কাছে ব্যাণ্ডের সাদামত গোল দাগ এখনও রঙ ধরে মিলিয়ে আসেনি। মেলাবার মুখে। বউ চিরকালের জিনিস। ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই, জিয়ার্ডিয়া অ্যামিবায়োসিসের মত ক্রনিক কেস। সারা জীবন ভোগাবে। আর লেপ। শীতে নামাতেই হবে। নামালেই দুজনে গায়ে দেবে। এবং পরের দিন সকালে আমাদের সেই লেপকেচ্ছা শুনতেই হবে।

বিবাহ মানেই একটি বউ এবং মনোরম একটি বিছানা। বিছানা ছাড়া ফুলশয্যা হবে কি করে! বিনয় শীতকালে বিয়ে করেছিল বলে একটি লেপও পেয়েছিল। ডবল মাপ। দুটি প্রাণীর শীতের আশ্রয়। লাল শালুর খোলে শিমুল তুলো। এর মধ্যে সমস্যার কি আছে সরল বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা শক্ত। কিন্তু সমস্যা অনেক।

প্রেম যখন ঘনীভূত ছিল তখন সমস্যা ছিল না। আলো নিবিয়ে লেপের তলায় ঢুকে দুজনে জড়াজড়ি করে 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই' গোছের ব্যাপার। এখন এতদিন পরে অপ্রেমে সেই 'কমান' লেপকে গালাগাল দিলে আমরা শুনব কেন ? তবু শুনতে হয়। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে পারে, কিন্তু কথায় কথায় একটা আস্ত লেপকে তো দুটুকরো করা যায় না। কাপড়ও নয় যে জোড়া কেটে দুটো করবে। বউ আর লেপ অবিচ্ছেদ্য। দাম্পত্য প্রেম আবার অবিচ্ছেদ্য নয়। সেখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে। এই হলায় গলায়, এই চুলোচুলি। তেঁতুল যত পুরোন হয় ততই টক বাড়ে। লেপের ঝগড়া,

ঝগড়ার লেপ। লেপের দুই মূর্তি। বউয়ের মতই। এই মনোরম, পরমুহূর্তেই বিস্ময়। সামলানো দায়।

প্রেমে মানুষ ত্যাগী হয়। বিনয় যখন প্রেমিক ছিল (বছর খানেক মাত্র) তখন শীতে বউকে লেপের তিনের চার অংশ ছেড়ে দিয়ে নিজে একের চার অংশে হিহি করত। ছেড়ে দিত বললে ভুল হবে। বউ কেড়ে নিতে। প্রথম রাতে লেপের তলায় দুটি মানুষ হলেও প্রেমে তালগোল পাকিয়ে একাকার। তখন আর সমস্যা কি ? সমস্যা মাঝরাতে। বিনয়ের আদরে আদুরী বউ উঁমুমু করে পাশ ফিরলেন, লেপের তিনের চার অংশ তার সঙ্গে চলে গেল। বিনয়ের শরীরের আধখানা খোলা, উদোম পড়ে রইল পৌষের শীতে শীতল সাদা চাদরে। পা দুটোকে জড়ো করে স্ত্রীর জোড়া ঠ্যাঙে গুঁজে গরম করতে গেলেই ঘুমের ঘোরে খ্যাঁক করে ওঠে, হচ্ছে কি ? এবার ঘুমোও। লেপের বাইরে হায়নার মত মাঝরাতের গাছ-গাছালির শিশির-মাখা শীত হামা দিচ্ছে। বিনয় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পশ্চাদ্দেশটিকে লেপের অংশে ঠেলে দিয়ে ভাবতে থাকে— ঘুমাও, হ্যাঁ এখন ঘুমাও কবি, রাতের কবিতা শেষ। জীবনটা যেন রঙমহলের অভিনয়। প্রেমের নাটকে যবনিকা পড়ে গেছে। নায়িকা পাশ ফিরে লেপের আরামে শুয়ে শুয়ে নায়ককে বলছে, দৃশ্য শেষ, মনের মেকআপ তুলে ফেলেছি। তখন তোমাকে সহ্য করেছি, কারণ করতেই হবে। তোমাকে বিশেষ অঙ্কের বিশেষ দৃশ্যে সহ্য করাই আমার জীবিকা। আমার জীবনের দুটো দিক, একটা অভিনয়ের দিক আর একটা নিজস্ব দিক। শীতের নির্জনতায় মানুষের মনে স্যাতসেঁতে চিন্তাই আসে। মনমরা চিন্তা সব হিলহিল করে ওঠে। পায়ের পাতা দুটোই বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওই জন্যেই বলে শীত করে। করে মানে, হাতে। শীত পায়। পায় মানে পায়ে, পদে। পা দুটো আশ্রয় খুঁজেছিল। পদাঘাতে ফিরিয়ে দিলে। একটা হাত বুকের উষ্ণতায় গরম হতে চেয়েছিল, খুব বিরক্ত হয়ে বললে, মাঝরাতে কি ইয়ার্কি হচ্ছে ! সাবাশ বেটা। ঘুমোলে মানুষের মনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বউ বলে আমিই এক বুরবাক, হেদিয়ে মরি। আসলে তুমি শ্বশুরমশাইয়ের কন্যা। পাকা বাঁশ কি সহজে নোয় রে বাবা !

সামান্য লেপ থেকে বিনয়ের অভিমান বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় উঠল যেখানে বিনয় যৌবনে যোগিনী। কার বউ ? কিসের সংসার ? বউও শ্বশুরমশাইয়ের লেপটাও তাঁর। যাও তোমার লেপ তুমিই নিয়ে শুয়ে থাক। বিনয়ের শুধরে দেবার কেউ নেই। শ্বশুরমশাইয়ের বউ কি রে ? ওই হল আর কি।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে লেপ সরে যেতেই পারে, তা নিয়ে অত মান-অভিমানের কি আছে বাপ। তুমিও টেনে নাও না। এ তো পাক-ভারত লড়াই নয় যে বাউণ্ডারি কমিশন বসিয়ে সীমানা ঠিক করে দিতে হবে। বিনয় বললে, বউকে নিজের মনে করতে পারলে সে অধিকার অবশ্যই খাটাতুম।

এ আবার কি কথা! বউ নিজের নয় তো কি পরের?

বিনয়ের উত্তর শুনে ঠাণ্ডা মেরে যেতে হয়। চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন। চব্বিশ ঘন্টায় দশ ঘন্টা নিদ্রা। বাকি রইল চৌদ্দ ঘন্টা। চৌদ্দ ঘন্টার চার ঘন্টা চান, খাওয়া, এটা ওটা। বাকি দশ ঘন্টার সবটাই বিনয়ের খরচ করতে হয় জীবিকার সংগ্রামে। খুব ভাল হিসেব। তাহলে বউয়ের সঙ্গে এত ঠোকাঠুকি, মান অভিমানের সময় আসে কোথা থেকে। তুমি শ্রীকৃষ্ণ নও, তোমার বউ রাধিকা ঠাকরুণও নন যে সারাদিন কদমতলায় বসে মানভঞ্জন পালা গাইবে। আধুনিক মানুষ তুমি খাবে-দাবে, ছোটাছুটি করবে, কেরিয়ার গুছোবে, তা না দিবারাত্র বউ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান, লেপ নিয়ে লাঠালাঠি। এইসব পান্‌সে সমস্যা আমরা শুনতে চাই না। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে যা নিয়ে মাথা ঘামালে দেশের উপকার হবে।

বিনয় তখনকার মত চুপ করলেও আবার সরব হয়ে ওঠে। লেপের যে এত মহিমা কে জানত। বিনয় ক্রমশ দার্শনিক হয়ে উঠছে। বিনয়ের মতে, বউ পরের ঘর থেকে আসে আসুক, তার সঙ্গে খাট, বিছানা, বালিশ আর সাটিনে মোড়া একটি লেপ যেন না আসে। খাল কেটে কুমির এনেছ এই যথেষ্ট, সেই সামলাতেই তোমার হাড়ে দুব্বো গজাবে, সঙ্গে আর কয়েকটা ফালতু লেজুড় এনে ন্যাজে গোবরে হওয়াটা ডবল মুখ্যুমি। পরের সোনা দিও না কানে, কান যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে। হীনম্মন্যতায় ভুগবে। একই কক্ষপথে দুটো গ্রহ যদি বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে প্রথমেই যা হবে তা হল দমাস করে একটি সংঘর্ষ। তারপর দুটোতে গায়ে পা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি। তারপর যার শক্তি বেশি সে-ই ঘোরাতে থাকবে নাকে দড়ি দিয়ে চোখবাঁধা কলুর বলদের মত। সংসারে স্ত্রী জাতিই প্রবলা। প্রবলা হবার কারণ পুরুষ জাতির দুর্বলতা। আমার মানু, মানু আমার করে ফার্স্ট ইয়ারে যে সোহাগ করেছিলে সেই সোহাগের পথে তোমার পার্সোনালিটি লিক করে বেরিয়ে গেছে। ফলে সেকেণ্ড ইয়ার থেকেই তুমি ক্রীতদাস। ট্যাঁক নবজাতক, ঘাড়ে সিংহজাতক।

সিংহজাতক মানে?

শ্বশুরমশাইয়ের নাম নরেন সিংহ। এটা ট্যাঁ করে তো ওটা গর্জন করে। দুজনেরই সমান সমান বায়না। বায়না না মিটলেই এর ক্রন্দন, ওর আস্ফালন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আমার ধোপা নাপিত বন্ধ। পিরিতের তাসের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। প্রেম যে কত ঠুনকো তা বিয়ে না করলে বোঝে কার বাপের সাধ্য।

প্রেম ঠুনকো হোক ক্ষতি নেই। তুমিও প্রেমের বয়স পেরিয়ে এসেছ। এখন তুমি পিতা এবং স্বামী। সেই ভাবে বুঝে-সুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার করে যাও। ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ কি? শাস্ত্র বলছে, 'দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' এই ভাব, এই ঝগড়া। সংসারে জীবন-নৌকো চলবে ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে। উঠবে পড়বে। পড়বে উঠবে।

উপদেশ দেওয়া সহজ। পড়তে আমার মত অবস্থায়, ঠ্যালার নাম বাবাজীবন। শুনবে কি জিনিস ! তখনও গা থেকে গায়েহলুদের রঙ ওঠেনি, পাওনা শাড়ির মাড় ওঠেনি, লেপের তলা থেকে বলে উঠলেন, বাবা একটা লেপ দিয়েছে বটে, পালকের মত হালকা, উনুনের মত গরম। নজর দেখেছ ? আমি বললুম, ও তোমার যৌবনের উত্তাপ। তায় আবার পান খেয়েছ কাঁচা সুপুরি দিয়ে। লেপের আবার ভাল মন্দ কি ! সে এক সালু কি সাটিন, ভেতরে তুলো। সব লেপেই যা থাকে এর মধ্যেও সেই একই মাল। সিংহকন্যা গর্জন করে উঠলেন, রাখো ! বরের লেপে শ্মশানের তুলে ভরে দেয়, বুঝলে চাঁদু ?

শ্মশানের তুলো ? সে আবার কি।

কি জানো তুমি ? শ্মশানের যত মড়া আসে তাদের বিছানা ছিঁড়ে তুলো বের করে তুলোপট্টিতে জলের দরে বিক্রি হয়। সেই তুলো দিয়ে তৈরি হয় ফুলশয্যার লেপ। এ জিনিস সে জিনিস নয়। এ হল এক নম্বর মাল। আগুন ছুটছে।

আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, তোমার পিতাঠাকুর কি চৈত্র মাসে শিমুল গাছের তলায় গিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়েছিলেন ? পাকা তুলো ফাটছে আর তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে ধরছেন, খোলে পুরছেন। আহা, এ মণিহার আমার নাহি..। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ। ফ্যাঁসোর ফোঁসোর। তুমি আমার বাবাকে শিমুলতলায় দাঁড় করালে এরপর কোন দিন বাবলা গাছে চড়াবে। অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষে রাত তিনটের সময় দেহি পদপল্লবমুদারম্ আওড়াতে আওড়াতে স্বামীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ভোরবেলা শুকনো মুখে, বসা চোখে কাকের ডাক শুনতে শুনতে মনে মনে বললুম, ইহা লেপ নহে, যীশুখ্রীষ্টের মৃতদেহের সেই আচ্ছাদন।

শ্বশুরবাড়ির জিনিস সম্পর্কে সব মেয়েরই ওই রকমের এক ধরনের দুর্বলতা থাকে। বউ বস্তুটিকে ব্যবহার করার কায়দা আছে ভাই। মোলামেয় হাতের ময়দা ডলার মত ময়ান দিয়ে মাখতে হয়, তবেই না খাসা মুচমুচে লুচি।

তা হলে শোন। সেই লেপপর্ব কোথাকার জলকে কোথায় নিয়ে গেছে। লেপের তলায় ঢুকে একদিন পা দুটোকে বেশ একটু খেলাচ্ছি। সিংহকন্যা বললে, হঠাৎ আবার দেয়লা শুরু করলে কেন ? সাতজন্মে পা ঘষ না। তোমার ওই চাষাড়ে পায়ের ঘষা লেগে লেপের ছাল উঠে যাবে।

কথাটা কিছু অসত্য বলেনি হে। তোমার পায়ের যা মাপ আর তার যা চেহারা। অনেকটা এবমিনেবল স্নোম্যানের মত।

পুরুষের পা এই রকমই হয়। পদাঘাতের পা। আঘাতের লোক তো আর পেলুম না, পদাঘাত খেয়েই গেলুম। আমার বরাতে নিউমোনিয়ায় মৃত্যুই লেখা আছে।

কেন ?

কেন আবার ! এই শীতে রোজ রাতে বিছানায় ওঠার আগে কনকনে ঠাণ্ডা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে লেডি ইন্সপেক্টার জেনারেলকে দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে বিছানায় উঠতে হবে। তারপর শুনবে, আরও শুনবে বিনয়ের বিনীত কাহিনী। পেঁয়াজ কি রসুন কাঁচা খাওয়া চলবে না। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে লেপের ভেতরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। মুলো খাওয়া চলবে না। পেট গরম হতে পারে। গরম পেটঅলা লোক নিয়ে কম্নান লেপে শোয়া যায় না। রোজ টক দই খেতে হবে। ঠাণ্ডা জলে সাবান মেখে চান করতে হবে। শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে ছোবড়া ঘষতে হবে। নিম্নবাহুতে গোলাপের নির্যাস মাখতে হবে। পরিষ্কার ধবধবে পাজামা আর গেঞ্জি পরতে হবে। কারণ লেপের তলায় চাই কলগেট নিশ্বাস, বাগিচার সুগন্ধ। লেপের তলায় নেড়িকুকুর নিয়ে কোন ফ্যাশানেব্‌ল মহিলা শুতে পারেন না। লোমঅলা, ধবধবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাউডার মাখা বিলতি কুকুর চাই। মাথায় তেল মেখে কলুর বলদ হওয়া চলবে না। তেলচিটে বালিশ, তার ওপর সাটিনের লেপ, ম্যাগো, ভাবা যায় না ! এবম্বিধ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তোমরাই বল।

বউকে পারবে না, লেপটাকেই ডিভোর্স কর। সিংহশাবককে বল, খুব হয়েছে মা জননী, তুমি থাক মহাসুখে লেপের তলায়, আমি থাকি আমার মত কাঁথার তলায়। শীতকালে প্যাঁজ না, রসুন না, মুলো না, মাথায় তেল নয়। মামার বাড়ি আর কি ! রোজ চান ? এমন অনেকে আছেন যাঁরা শরতে শেষ চান করেন, শীত পার করে ফাল্গুনের হোলিতে রঙিন হয়ে আবার চানপর্ব শুরু করেন। তোমার যদি হাঁপানির ব্যামো থাকত, তোমার বউ কি করতেন—তালাক দিতেন ?

আরও একটা দুঃখের কথা বলি ভাই, ফুলকপি আমার ভীষণ প্রিয়। সারাবছর অপেক্ষায় থাকি, শীত এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে। সেই কপি খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। কপি বায়ুকারক। আমার স্ত্রী বলে, লেপের যোগ্য হবার চেষ্টা কর। যা তা মাল লেপে সিঁধোলে পলিউশান হবে।

মার শালা তোর শ্বশুরবাড়ির লেপে এক লাথি।

তাই তো মেরেছি। আগে আগে হত কি, সন্ধেবেলাই হিসেব নিয়ে বসতুম। অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে বউকে অর্থনীতির উপদেশ দিতে ইচ্ছে হত। আয় বুঝে ব্যয় করতে শেখ ! কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। তেলটাকে সেই তিন কিলোতেই তুললে। কয়লা দু মণেই তাহলে প্যাকা হয়ে গেল ! রোজ এক কেজি আলু লাগবেই ! পাঁচ কেজি মুগের ডাল ? লম্বে হাত। মাসে গায়েমাখা সাবান পাঁচটা ? বহুত আচ্ছা। ঠুস ঠাস, ঠুস ঠাস করতে করতে পর্বত ধূমাৎ বহ্নিমান। টুক করে বলে বসল, এবার থেকে তুমিই তাহলে রাঁধ। শীতকালে তেল একটু বেশিই খাবে।

না, খাবে বললেই খাবে। একটু টানতে শেখ, কেবল ছাড়তেই শিখেছ।

আমার বাপের বাড়িতে এত টানাটানি ছিল না। হলঘরের মত সংসার আমি করতে পারব না।

ডোন্ট ফরগেট, দিস ইজ নট ইওর বাপের বাড়ি। শ্বশুরের তেল বেচা পয়সা আহ্লাদী মেয়ে দুহাতে উড়িয়েছেন। দীয়তাং ভুজ্যতামের কাল চলে গেছে। ব্যস, সিংহী অমনি ফুঁসে উঠে তাঁর চাল চালতে লাগলেন। রাতে অনশন। শয্যাত্যাগ। ভূতলে শয়ন। সাধ্যসাধনায় তিনি ভূতল ছেড়ে শয্যাতলে এলেন। ঘাড়ে লেপ চড়ানো হল। রাগ পড়ল না। স্বামী সাংঘাতিক হলেও একটি প্রাণী। মশা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর, আরও রমণীরক্ত লোভী এবং ঝাঁক ঝাঁক। মশার আক্রমণে লেপাশ্রিতা হলেও সন্ধি হয় না। একই লেপের তলায় দুই রাগী। লেপের গরম, রাগের গরম, ঘেমে মরি। তখন ছিল একদিন ঝগড়া তো পরের দিন ভাব। তিরিশ দিনের পনেরো দিন স্বামী-স্ত্রী আর পনেরো দিন ছোটলোকের বাচ্চা আর ছোটলোকের বেটি। পাশ ফিরে শুয়ে হাপর টানে। পশ্চাদ্দেশে পশ্চাদ্দেশে ঠেকলেও জ্বলে জ্বলে ওঠা, ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া। বাঘ কিংবা বিষধর সাপ নিয়ে শুয়ে থাকা।

সে তো ভালই। দাম্পত্যকলহের পর প্রেম আরও জমে ওঠে। মেঘলার পর রোদ, রোদের পর মেঘলা, কনট্রাস্ট না হলে খেলা তেমন জমে না ভাই। ঠিক রাস্তাতেই চলেছ গুরু। ঠাকুর বলতেন, রসেবশে রাখিস মা।

হ্যাঁ ভাই, তা ঠিক। সেই রস এখন জমে মিছরির ছুরি হয়ে যেতেও কাটছে আসতেও কাটছে। গত একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। আঠারো কেজি চিনির দাম নিদেন একশো আশি টাকা। বেশি মিষ্টি করেই মিষ্টির কথা বলতে গেলুম। একশো আশি টাকার চিনি খেলে আমি যে চিতেয় উঠব ভাই। উত্তর হল, মায়ের পেটগরমের ধাত, রোজ সরবত খেতে হয়। মেয়ে হয়ে কিছুই করব না, তা তো হয় না। তুমি আর মায়ের মর্ম কি বুঝবে বল। ছেলেবেলাতেই খেয়ে বসে আছ। মা ছিল বলেই না আমাকে পেয়েছ। তা আমি ভাই একটু ভেঙচি কেটে বলে ফেলেছিলুম, আহা মাতৃভক্ত মাতঙ্গিনী, স্বামীকে চিতায় চাপিয়ে মায়ের দেনা শোধ! কথাটা মুখ ফসকে বেরোনমাত্রই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। কাপ ডিশ ভেঙে, দেরাজের আয়না চুরমার করে, বইয়ের র‍্যাক ভেঙে আধুনিক রাজনীতির কায়দায় অ্যায়সা প্রতিবাদ জানালে তিনদিন হাঁড়ি চড়ল না। দফতর চালু হলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আমি বউবাজার থেকে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড লিখিয়ে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম—রাগ চণ্ডাল। তার তলায় লিখেছি—চণ্ডালের হাতে পড়েছি। তোরা আমাকে একটা লেপ কিনে দে ভাই, ডিসেম্বরের শীতে কেঁপে মরছি।

কেন সেই লেপটা?

ভাই বিছানায় পার্টিসান উঠেছে। একটা রাত শুধু লেপ বয়ে কেটেছে।

চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কেঁপে কেঁপে ঘুম আসছে, এসে গেছে, ঝপাৎ করে গায়ে ভারি মত কি একটা পড়ল। আচমকা। ভেবেছিলুম বউ হয়তো অনুশোচনায় ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ক'দিন চালাবে বাবা কোল্ড ওয়ার। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা চলে কি ? ওঠ ওঠ ! কেন ওরকম কর ? বলেই মনে হল, আরে বউ তো আরও একটু শক্ত হবে, লম্বামত হবে। এতো দেখছি অনেকটা জায়গা নিয়ে চৌকো মত কি একটা এসে পড়েছে। বউ নয়, লেপ। কি হল লেপটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে ? উত্তরে মিনি গর্জন শোনা গেল, হুঁ।

তোমার বাবার লেপ তুমি নিয়েই শোও। আমার ঘাড়ে কেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর, লেপ তোমার।

হ্যাঁ, লেপ আমার। তা ঠিক। বউ আর লেপ দুটোই আমার ছিল। আসলটা হাত ছাড়া, ফাউ জড়িয়ে মাঝরাত্রে মটকা মেরে পড়ে থাকি। এ যেন সেই গ্যারেজে গাড়ি রেখে বাবুর বাসে ঝোলা। লেপটা দু হাতে তুলে ঝপাং করে সিংহকন্যার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এলুম। সারারাত লেপ নিয়ে পিংপং। তোরা ভাই আজ আমাকে একটা লেপ কিনে দে।

বেডিং স্টোরে গিয়ে আমাদের লেপ দেখা শুরু হল। দেখি একটা হাল্কা সিঙ্গল লেপ। বিনয় বললে, সিঙ্গল নয় ডবল।

ডবল কি করবি ? সিঙ্গল মানুষ।

না, ডবল কিনব। এতকাল শীতের রাতে বউয়ের লেপের তলায় নেড়িকুকুরের মত আশ্রয় খুঁজেছি। এইবার নিজের লেপে বুক চিতিয়ে পাশে একটু জায়গা রেখে শুয়ে থাকব। দেখি তুমি আস কি না তোমার অহঙ্কারের দরজা খুলে।

ফল্গু

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানায় আড় হয়ে কি একটা বই নাড়াচাড়া করছি। আজকাল এইরকমই হয়েছে। কি খাচ্ছি, কি পড়ছি, কিছুই আর তেমন খেয়াল থাকে না। খেয়াল করিও না। কিছুটা অভ্যাস, কিছুটা সংস্কার এই ভাবেই জীবন চলছে। অভ্যাসে বাজার যাই। অফিসে ছুটি। সংস্কারে বই টেনে নি। পাতা ওল্টাই। বয়েস বেড়ে গেছে। চোখের তেজ কমেছে। তেমন দেখতে পাচ্ছি না। উঠে গিয়ে চশমাটা নিয়ে আসবো, সে শক্তিও যেন নেই। রোজই ওইরকম হয়। দু'চার পাতা নাড়াচাড়া করতে না করতেই শরীর খ্যাস করে নেতিয়ে পড়ে।

রোজই এই সময়টায় আমার এক সমস্যা হয়—কে মশারি খাটাবে! আমি না আমার বউ। এদিকে সাংঘাতিক মশার উপদ্রব। মশারি ছাড়া এক মুহূর্ত শোবার-উপায় নাই। আর রোজ রাতেই এই মশারিপলিটিক্স হয়। বউ বলবে—'চারটে কোণ খাটিয়ে তুমি শুয়ে পড় আমার সৃষ্টি কাজ পড়ে আছে, আমার অপেক্ষায় থেকো না, গতরটা একটু নাড়াতে শেখো।' এই গতর শব্দটা শুনলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়। মেয়েদের জগতের বিশ্রী একটা শব্দ। অশ্লীল তো বটেই। আজ আমি অপেক্ষায় আছি। কাল, পরশু, তার আগের দিন, পর পর তিনদিন আমি মশারি খাটিয়েছি। আজ আর আমি নেই। মরে গেলেও নেই। বইটার পাতা ওল্টাচ্ছি আর মনে মনে বলছি—এ লড়াই জিততে হবে। আজ আর আমি নেই। আর ঠিক সেই সময় রান্নাঘর থেকে চিৎকার 'এলিয়ে না থেকে মশারিটা ফেলে চারপাশ ভাল করে গোঁজো। জীবনে একটা কাজ অন্তত ভালো করে করতে শেখ।'

'পরপর তিন দিন আমি মশারি ফেলেছি, আজ আমি মরে গেলেও ফেলবো না?'

'তাহলে মরো, মশার কামড় খেয়েই মরো। যখন ম্যালেরিযা হবে তখন বুঝবে ঠেলা।'

'হলে তোমার আমার একসঙ্গেই হবে, এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হয না।'

'ওই আনন্দেই থাকো, মেয়েদের ম্যালেরিয়া হয় না। হলে অম্বল হয়, বাত হয়, পিত্তপাথুরী হয়। স্বামীদের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়।'

'আচ্ছা।' আমি সুর টানলুম।

হাওয়া বইছে এলোমেলো। রাত সাড়ে এগারোটা বারোটার সময় আমি আর ফাটা কাঁসি নিয়ে তরজা শুরু করতে চাই না। এ-পাড়ায় আমার একটা সম্মান আছে। অনেকেই প্রণামট্রণাম করে। বাড়ির লোক ঝাঁটা মারলে কি হবে, বাইরে আমার অল্প বিস্তর খাতির। একসময় ভালো ফুটবল খেলতুম, ফরোয়ার্ড লাইনে। সেকালে ফুটবলের তেমন কদর ছিল না, একালের ছেলেরা তো বল পাগল। সেই কারণেই অতীতের গোলোন্দাজ হিসেবে একালে আমার খাতির। আমার পায়ে বল মানেই গোল। এই তো গত দুর্গা পূজায় পাড়ার ক্লাব আমাকে সম্বর্ধনা জানালে। একটি টিনের ট্রে, তার উপর ছোট সাইজের একটা নারকোল, ছোট বাক্সে চারটে সন্দেশ। সে যাই হোক, শ্রদ্ধা ভালবাসার কোনও মূল্য হয় না। গলায় একটা রজনীগন্ধার শুকনো, শুকনো মালা পরিয়ে দিল ছোট টুলটুলে একটা মেয়ে। মালাটা আমি সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম। একেই বলে মহানুভবতা। লোককে দেখানো, আমি কতটা নির্লোভ, নিরহঙ্কারী। সবার আগে একটি বড় মেয়ে প্রদীপ দিয়ে আমাকে বরণ করেছিল। মেয়েটি মনে হয় আমার ব্যক্তিত্বে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তা না হলে আমার

গোঁফে ছ্যাঁকা দিয়ে দেবে কেন ? আমার এক গোছা ঝোলা ঝোলা গোঁফ পড়পড় করে পুড়ে গেল। সে যাক, দোষটা আমারই। একালে কেউ অত বড় গোঁফ রাখে না। সেই যে আমি গোঁফ কামালুম, এখন আমার ঠোঁট সাফ। বয়সটাও যেন অনেক কমে গেছে। আগে অচেনা লোক মাত্রই কিছু জিজ্ঞেস করার হলে কথা শুরু করতো হিন্দীতে এখন বাংলাতেই করে। সভার সভাপতি মহাশয় গলায় একটা পাটকরা মাদ্রাজী চাদর পরিয়ে দিলেন। আমাকে আবার দু'চার কথা বলতে হল। আমি বলেছিলুম—ফুটবলই আমাদের জীবন। দুটো পা যেন স্বামী-স্ত্রী জুটি ; আর বল হল গোল, মানে বিশ্ব। এই বিশ্ব হল স্বামী-স্ত্রীর খেলা। ঠিক বোঝাবুঝি, মেলামেশা হল তো, খেলা হয়ে গেল কবিতা। দুটো পায়ের আণ্ডারস্ট্যাডিংই হয় খেলোয়াড়ের সাফল্যের মূল কথা। উঃ সে কি হাততালি। তিন মিনিটে হিরো। অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে শ'খানেক তরুণ তেড়ে এল। যার খাতা নেই সে এগিয়ে ধরল, ঠোঙা। মনে হয় বাদামটাদাম খাচ্ছিল। সই করতে করতে আমার জান কয়লা। ফড়াক ফড়াক ছবি তুললেন ফটোগ্রাফার। এক নেতা এসে বললেন—নেকস্ট ইলেকশানে আমরা আপনাকে পার্টির টিকিট দেবো। যদি জিততে পারেন, যদি আমরা মিনিস্ট্রি ফর্ম করতে পারি, জেনে রাখুন আপনি হবেন ক্রীড়া-মন্ত্রী। আমি সেই গ্যাস খেয়ে বাড়িতে এসে একটা উলটো-পালটা করে ফেললুম। মন্ত্রীদের মত মেজাজ দেখাতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়। আমার একমাত্র স্ত্রীর সঙ্গে একমাস বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। টিনের ট্রেটা দেখে বলেছিল, আজকাল এক প্যাকেট বড় সার্ফ কিনলে ওই রকম ট্রে ফিরি পাওয়া যায়। চাদরটা দেখে বলেছিল, ব্যাণ্ডেজ হিসেবে ভালই। নারকেলটা হাতে নিয়ে বলেছিল, একটা মোচা নিয়ে এলে ছোলা দিয়ে ঘন্ট করা যাবে। সম্বর্ধনার নারকেলে কি ঘন্ট করা উচিত। এই সংশয় আমার ছিল। এতো ভাবের নারকোল। ভালবাসার উপহার। ভালবাসার ঘন্ট হবে ! মোচার দাম কম নয়। এরপর সম্বর্ধনায় যাঁরা নারকোল দেবেন, তাঁরা যদি একটা করে মোচাও দেন তো বেশ হয়। আমার বউ আবার হিসেব করে ছেলেকে বুঝিয়ে দিলে বুড়ো বয়সে তার বাপের কী রকম ভীমরতি ধরেছে, একশো একটাকা চাঁদা কানমলে নিয়ে গিয়ে কুড়ি টাকার মাল ঠেকিয়েছে, পরের বছরের জন্যে গলায় পরিয়ে দিয়েছে ব্যাণ্ডেজ। গামছার সিম্বল। ওরে আমার বড় পেলোয়াররে ! সারা রাত বাতের যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করে। তিন পা হেঁটে সাতবার হাপরের মত হাঁপায়।

যাক, যারা আমার গৌরবোজ্জ্বল অতীত দেখতে পায় না, দেখলেও দেখতে চায় না, তাদের আমার কিছু বলার নেই। বাঙালি ইতিহাস বিমুখ জাতি, আমরা সবাই জানি। এরা ইতিহাস বলতে বোঝে আকবর বাদশার ইতিহাস। সিনেমার 'ফ্ল্যাশব্যাক' দেখবে, একটা জ্যান্ত মানুষের ফ্ল্যাশব্যাক শুনবেও না, বিশ্বাসও করবে না। আমাদের যেন অতীত থাকতে নেই। আমরা সব বর্তমানের সরীসৃপ।

আবার বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম। এবার মলাটে চোখ পড়ল। র‍্যাক থেকে ভাল বইই টেনেছি—গীতা মাহাত্ম্য। এই বয়েসে যে বইয়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসার, সব ছিরি তো দেখছি। কতদিন ভাবি সন্ন্যাসী হয়ে কেটে পড়ব, পারি না। অন্য কিছুর জন্যে নয়, শুধু মাত্র বাথরুমের ভয়ে। গৃহত্যাগের সময় নিজের বাথরুমটাকে তো আর নিয়ে যেতে পারবো না। যত্রতত্র আমার পোষায় না। ঘেন্না করে।

দরজার কাছ থেকে আমার রাখবালের একটু চড়া গলা শোনা গেল—'কি হল মশারির চারটে কোণ আর দয়া করে খাটাতে পারছ না, গতরটা একটু নাড়াও! না পরের গতরে যতটা হয়ে যায়!'

আবার সেই অশ্লীল শব্দটা। উঠে বসলুম। গতর বললেই, লুঙ্গি পরা, বিশাল ভুঁড়ি আর পাছাঅলা একটা নির্বোধ ভোগীর চেহারা ভেসে ওঠে। বিছানায় শুয়ে যারা মিঠি মিঠি গলায় গুন গুন করে ডাকে, 'কই গো, কই গো, তোমার হল।' বউ তোলানো পার্টি। আমি সর্ব অর্থে তার বিপরীত। জীবনে কাউকে হ্যাঁ গা, কই গা, শুনছো বলিনি। সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্ট্রেটকাট কথা। পায়ে বল নাও, ছ'বার ড্রিবল করে ঢুকিয়ে দাও নেটে। আর তাকাতাকি নেই, ফিরে এসো মাঝ মাঠে। আমার গুরু আমাকে জপের মন্ত্র দিয়েছিলেন, 'অ্যাটাক, অ্যাটাক'। আমি ঝাঁঝেই বললুম ঃ

'দ্যাখো গতর বলবে না। গতর হয় মেয়েদের। আমার মত খেলোয়াড়দের হয় ফিগার। আমার একেবারে কঞ্চির মত শরীর। মশারি আজ আমি খাটাবো না, খাটাবো না, খাটাবো না। দিস ইজ নট মাই জব।'

'খাটিয়ো না, খাটিয়ো না।'

গলা নয় তো গোলা। একেবারে সংলগ্ন বাড়ির প্রতিবেশী মশারি ফেলা অন্ধকার ঘর থেকে দাবড়ে উঠলেন, 'আয় চোপ।' ভদ্রলোক সূর্য ডোবার পর থেকেই চড়াতে থাকেন। এখন তিনি পুরো চড়ে আছেন। আমি কিছু মনে করলুম না। জানি সকালেই তিনি বিনীত গলায় বলবেন—'কি দাদা, বাজারে চললেন' আমরা জানি, মাতালে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

আমার ছেলে। ওই একটি মাত্রই ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—'আশ্চর্য, দিন দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে।' বলেই সরে পড়ল। সবে প্রেম করে বিয়ে করেছে। মৌতাতে আছে। নতুন বউমা বিয়ের পর দিন-সাতেক মশারি খাটিয়ে পরিপাটি বিছানা করে শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা করেছিল। তারপর শোনা গেল স্পন্ডিলোসিস হয়েছে। হাতের খিল জ্যাম হয়ে গেছে। ওপর দিকে আর উঠছে না। যা পারছে তলার দিক থেকে সব হাতড়ে নিচ্ছে। মানুষের কপাল মন্দ হলে যা হয়। কে কাকে সেবা করে! এখন বধূ আর পুত্রবধূ দুজনের সেবা করে প্রারব্ধ ক্ষয় করি। ছেলে তো বিয়ে করেই দায় সেরেছে। একালের ছেলেদের তো কোনও কর্তব্যবোধ নেই। প্রেম করার সময় খিদমত

খাটতো তা আমি জানি। তখন মাছ খেলছিল, এখন মাছ জালে। আর তো কোনও ভয় নেই। এখন খাওদাও আর বগল বাজাও। নিধিকেষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াও।

পাখার স্পিড বাড়িয়ে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। প্রথমত রেগে আছি, অভিমানে একেবারে টসটসে। দ্বিতীয়ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের হুল যে সহ্য করতে পারে, মশা তার কি করবে। সেই আছে না, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয় ! নিদ্রাতেই মানুষের সব দুঃখের অবসান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাত কত তা জানি না। ঘরে গুমোট গরম। পাখা বন্ধ। কানের কাছে ঝাঁক ঝাঁক মশার কালোয়াতি। রাস্তার আলো শোওয়ার আগে জ্বলছে দেখেই শুয়েছি। এখন চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মানে লোডশেডিং। মেঝেতে আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা একটা লাশ পড়ে আছে। আমার পঁচিশ বছরের প্রাচীন অভিমানী বউ। যত বয়েস বাড়ছে, তত মেদ বাড়ছে, তত বাড়ছে রাগ আর অভিমান। এইটুকু বুঝলুম ইলেকট্রিক সাপ্লাই চলে বউদের নির্দেশে। তা না হলে ঠিক এইসময়ে লোডশেডিং হবে কেন ? আমাকে অন্যায় রণে হারিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। যেমন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকা বসে গেল।

যাই হোক সামান্য একটু যা ঘুমিয়েছি তাইতেই আমার রাগ জল হয়ে গেছে। আমি খাটে, বউটা আমার মেঝেতে। মনটা গুমরে উঠল। আহা পরের মেয়ে ! বাপ নেই, মা নেই। মেরেছো কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না। খাট থেকে অন্ধকারে ঠাহর করে করে নামলুম। তারপর খুঁজে খুঁজে গোলগোল হাত দুটো ধরে তোলার চেষ্টা করলুম। ও বাবা, এ যেন এক পেল্লায় বোয়াল মাছ, পিছলে যায়। একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ। আবার আমার রাগ চড়ছে। কি উঠবে না। মার টান। হেঁইয়ো, মারি হেঁইয়ো, আউর থোড়া হেঁইয়ো, বয়লট ফাটে হেঁইয়ো ঘাস বিচুলি হেঁইয়ো। হাতখানেক তুলি তো, খ্যাস করে শুয়ে পড়ে। আমার বউ যে এত ভারি জানা ছিল না। যেন জগদ্দল পাথর। বোম্বে ছবির নায়িকা হলে হিরোর ভাত মারা যেত, কারণ একটা দুটো সিন এইরকম থাকতোই যেখানে নায়ক নায়িকাকে দু-হাতে পাঁজা-কোলা করে তুলে বনের ধারে পাগলের মত ঘুরপাক খাচ্ছে আর গাইছে—মেরা পেয়ার ঝুলতা রহে, ঝুমঝুম। বোম্বে ছবির নায়করা তো সব প্রেমে আধপাগলা মত হয়ে যায়। তা এই নায়িকাকে কে তুলবে। এক গব্বর সিং পারতে পারে। যাই হোক আমার রোক চেপে গেল—কি ? স্বামী হয়ে স্ত্রীকে খাটে তুলতে পারবো না। কত ছোবড়ার ওজনদার গদি আমি তুলেছি একা। অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান ওয়েট লিফটারদের স্মরণ করে, মারলুম আর এক টান। চাগাবার চেষ্টা করলুম। আর তখনই বুকের ডানপাশে যেন ওয়ালর্ড হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানের এক ঘুসি পড়ল। নিথর নিস্পন্দ হয়ে এল শরীর। পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা যেভাবে স্লো-মোশানে রিং-

এর মধ্যে পড়ে যায় আমিও সেই ভাবে পড়ে যেতে যেতে বললুম—'যাঃ সুধা, তুমি বিধবা হলে। হার্ট-অ্যাটাক।' আর কোনো বড় কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই। উঃ হৃদয় আটকে গেলে, মানুষের কি যে হয়। কোথায় লাগে রেল রোকো, বাংলা বন্ধ। হৃদয় বন্ধের মত কিছু নেই।

চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছি। শরীর অবশ। দম পড়ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। একটু বাতাসের জন্য মানুষের কি ছটফটানি। আমার বউ এতক্ষণ জেগে জেগে মশকরা করছিল। বিধবা শব্দটায় চাঁদমারি হল। আচ্ছন্ন চেতনা নিয়েই বুঝতে পারছি, অন্ধকারে উঠে বসেছে। প্রথম প্রথম বিধবা হতে সকলেরই ভয় লাগে। ওই অবস্থাতেই নিজেকে হিরো মনে হচ্ছে। ফেলেছি তুরুপের তাস। খেলো, নন্দিনী খেলো। আমি রামায়ণের রাম। আবার এ-ও মনে হচ্ছে—চলে যেতে হবে পৃথিবী ছেড়ে। আবার একটা গানের লাইনও মনে পড়ছে—সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী। মরে যাবার সময় মানুষের কত কি মনে পড়ে। মনটাও ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। ভীষণ ভালবাসা পায় মনে।

আমার বউ আমার বুকে ভর রেখে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। যেন বারান্দার রেলিং-এ হাতের ভর রেখে রাস্তার লোক দেখছে। বেশ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলে—'কোথায় রেখেছো ?'

এই সময় এই প্রশ্নের একটাই অর্থ, পাশবই, চেকবই, সেভিংস এইসব রেখেছো কোথায় ? তুমি তো চললে। সেখানে গিয়ে তো আর তুড়ুম ঠুকতে পারবো না। তখনও আমার একেবারে বাক্যরোধ হয়ে যায় নি। অস্পষ্ট হলেও স্মৃতি আর চেতনা দুটোই কাজ করছে। আমি কোনও রকম বললুম, 'ভেবো না—তুমিই নমিনি, কাগজ পত্র, চেকবই, পাসবই সবই আলমারির লকারে আছে। চাবিটা আছে মাটির যে গোপাল মূর্তি তার ভেতরে। রুমালে জড়ানো।' এরপর আর আমার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরুলো না, গোঁ করে উঠলাম—আমার বউ বললে—'যাও তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলবো না, মানুষকে কেবল তোমার কামড়ানো স্বভাব।' আমি মনে মনে বললুম—হায় রে। এখনও তুমি বুঝলে না আর হয় তো পনেরো মিনিট পরেই তোমাকে প্রথামতো ডুকরে কেঁদে উঠতে হবে। তুমি ভাবছো আমি বোধ হয় অভিনয় করছি, তা কিন্তু নয়, একেই বলে হার্ট অ্যাটাক ! অব্যর্থ পরোয়ানা। ভাবলুম, কিন্তু বলতে পারলুম না কিছু। কোঁক, কোঁক শব্দ হল কয়েকবার। তখন আমার বউ সরে এসে বললে, 'তোমার সেই অম্বলের ওষুধটা কোথায়। অফিসে আজ কি গিলে মরেছিলে। হার্ট অ্যাটাক না হাতি ? একে বলে গ্যাস।'

আমি বলতে চাইলুম—'পাগলি, সবাই গ্যাসই ভাবে। মরলে তবেই বোঝা যায় গ্যাস না করোনারি।' প্যাঁক করে একটা শব্দ বেরলো মাত্র। আমার বউ তখন উঠে আলো জ্বালালো। আমার দিকে তাকিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্বপ্নের ঘোরে যেন দেখছি সব। ছেলেকে ডাকছে। ভদ্রমহিলার হইহই

করা স্বভাব। এমন ভাবে ডাকছে বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে। আমার ছেলের ঘুম সহজে ভাঙে! তার ওপর সবে বিয়ে করেছে। এক সময় ছেলের গলা পাওয়া গেল। ঘুম জড়ানো, বিরক্তি মেশানো গলায় বলছে—'এত রাতে ডাক্তার, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—নার্সিংহোম ? গাড়ি পাবে কোথায় ? কোনওরকমে ভোর পর্যন্ত ম্যানেজ করো, তারপর যা হয় করা যাবে। বাবাকে তো চেনো! তিলকে তাল করা স্বভাব। এর আগেও তো দেখেছো!'

মনে মনে বললুম, 'তাই না কি সোনা! বাবারা বুঝি তোমাদের সেবার জন্যে অমর হবে। খালি ফুয়েল ঢেলে যাবে সোনা, আর তোমরা শুধু কপচে যাবে! পাখি সব করে রব।'

তিন জোড়া পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চারপাশে বাবুরা এসে গেছেন। আমার ছেলে আবার জাত আমেরিকান। জিনস পরেই ঘুমোয়। উবু হয়ে বসতে পারছে না। এখুনি পেছন ফেঁড়ে যাবে। পুত্রবধূ আমার বুকের উপর হাত রেখে বারে বারে ডেকেই যাচ্ছে, 'বাবা, বাবা, ও বাবা।' যেন হার্ট অ্যাটাকের এইটাই চিকিৎসা, বাবা, বাবা করলেই হৃদয় খুলে যাবে।

আমার বউ বলছে, নিশ্চয় আজ ঘুগনি খেয়েছে। ঘুগনি দেখলে তো আর লোভ সামলাতে পারে না। আজ তো সোমবার। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। আজ ওদের অফিস ক্যান্টিনে ঘুগনির ডেট।

আমি সব শুনছি, আর মনে মনে হাসছি। অ্যাতো যন্ত্রণাতেও হাসি। কেন হাসবো না। ছেলেবেলায় কত আবৃত্তি করেছি—জীবন-মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য।

ছেলে বলছে—'এই অবস্থা কতক্ষণ হয়েছে ?'

'তা প্রায় আধঘণ্টা।'

ছেলে আমার হেসে উঠল। 'আধঘণ্টা! তাহলে জেনে রাখো ব্যাপারটা হার্টের নয়, পেটের। হার্ট হলে কি হত জানো, পাকা আমটির মত, টুপ করে খসে যেত। এ তোমার ঘুগনি কেস। তলপেটে নারকেল তেল, সাবান আর জল মিশিয়ে ডলতে থাকো। পায়ের তলায় নখ দিয়ে কুড়ু কুড়ু করে দ্যাখো তো!'

আমার বউ বললে, 'মাগো, সাতজন্ম পায়ে সাবান দেয় না, ওই পায়ের তলায় আমি মরে গেলেও হাত দোবো না।'

মনে মনে বললুম—'পিটপিটে বামনী, এখুনি মরলে ওই পায়েই তো আলতা মাখিয়ে ছাপ তুলবে।'

ছেলে বললে, 'তোমার আবার বেশি বেশি। আমি যে প্যান্টের জন্যে নিচু হতে পারছি না।'

বউমা বললে, 'আমি দেখছি।'

আঙুলের বড় বড় নখ। সেই নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। আমি ঝড়ক করে পা টেনে নিলুম।

ছেলে বলল, 'বুঝেছি, এ তোমার মাকে টাইট দেবার চেষ্টা। থম্বোসিস হলে পায়ে কোনও সাড়া থাকতো না। চলে এস সুমিতা। ও স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, নিজেরাই ফয়সালা করে নিক!'

মনে মনে বললুম, 'ও হে ছোকরা, তোমার বউয়ের আঙুলে যে ফ্যাশানের নখ, অ্যালসেসিয়ানকেও হার মানায়। ওই আঁচড়ে মরা মানুষও ঠ্যাং সরাবে বাপ। পায়ে সাড় থাকলে কি হবে, শ্বাস যে এদিকে বন্ধ হয়ে এলো। পালসটা দ্যাখো, বিট মিস করছে কি না!'

আমি তিনবার ব্যাঙের মত কোঁক কোঁক করলুম। ল্যাভেণ্ডার পাউডারের গন্ধ উড়িয়ে নব দম্পতি বিদায় নিল। পড়ে রইলুম, আমি আর আমার বোকা বউ। পঁচিশ বছরের পোড় খাওয়া একটা জীব। কোথা থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে তলপেটে চেপে ধরল। ফ্যাঁস ফোঁস করে একটু কাঁদল। বউটার ধৈর্য-একটু কম। কোনও কাজ একটানা বেশিক্ষণ করতে পারে না। এমনি মানুষটা বেশ ভালো, তবে অবুঝ। বয়েস হলে কি হবে, বালিকার স্বভাব! আমি চলে গেলে বুড়িটার কি হবে! ছেলের সংসারে আয়াগিরি করতে হবে। ভাবতে ভাবতে আমার চোখেই জল এসে গেল। আমার বউ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তুমি চলে গেলে আমি আত্মহত্যা করবো, মাইরি বলছি, আমি আত্মহত্যা করবো, আমার কে আছে বলো!'

তিন চার ফোঁটা চোখের জল টপাটপ আমার গালে কপালে পড়ল। আমি আমার অবশ হাত দুটো তোলার চেষ্টা করলুম। প্রথমে পারছিলাম না। পরে পারলুম। পারলুম মনের আবেগে। মন তো আর হৃদয়ে থাকে না। মেয়েটাকে আস্তে আস্তে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরলুম। রাতের ধরিত্রীর মত ঠাণ্ডা শীতল একটি শরীর। ধীরে ধীরে আমার হাতের চাপ বাড়ছে কাছে টানছি, কাছে, আরো কাছে। আমার অর্ধ অঙ্গকে। অদ্ভুত এক অনুভূতি, যেন হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করছি। হাপুস কাঁদছে আমার বউ। আমি কথা বলার চেষ্টা করলুম। পারলুম। আমার বাক্য ফিরে এসেছে। বললুম, 'মাইরি বলছি, আমার একটা মাইলড্ স্ট্রোকই হয়ে গেল। আমি আজ ঘুগনি খাইনি, কিছুই খাইনি। স্রেফ তোমার জন্যেই আমার হৃদয়ের বাধা খুলে গেল।'

আমার বুকের ওপর বউয়ের মাথা। চুলের আর সে শোভা নেই। দেহে আর সে উত্তাপ নেই, কিন্তু চোখে অনেক জল এসেছে। ভেতরে একটা সমুদ্র তৈরি হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

আমাকে আঁকড়ে ধরে আমার চির বালিকা বউ ধরা ধরা গলায় বললে, 'বুঝতে পারো না বোকা!' আমার চোখের সামনে খেলে গেল অতীতের দৃশ্য, একটা গাছ, এক টুকরো জমি, সবুজ ঘাস, এক তরুণ আর তরুণী, কাঁধে মাথা হাতে হাত। অদৃশ্য এক স্টার্টার বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, শুরু হলো চলা। আজও

চলছি। কোথায় সেই লাল ফিতে! কত দূরে। মনে মনে আমার ছেলেকে বললুম—'কি প্রেম করিস তোরা? দেখে যা প্রেম কাকে বলে? চোখের জল ছাড়া প্রেম হয়!' একটা হৃদয় হলে আজ যবনিকা পড়ে যেত। দুটো হৃদয় মিলেছিল বলেই রয়ে গেলুম। থাকিনা আর কিছুকাল।

প্রেসার কুকার

আগেকার দিনে নীলকর সাহেবরা বেগার ধরতে বেরোতেন। সাহেব চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হঠাৎ নজড়ে পড়ল এক পুরোহিত চলেছেন নামাবলি গায়ে। হাতে শালগ্রাম শিলা। রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে সাহেব বললে, 'পালাইতেছ কোথা, বেগার ডিটে হইবে।' ব্যস হয়ে গেল। যজমানের বাড়ি পড়ে রইল দু' ক্রোশ দূরে? সত্যনারায়ণ মাথায় উঠল। পুরোহিত চললেন, সায়েবের নীল চাষে বেগার খাটতে। না গেলেই সপাসপ চাবুক।

যুগ অনেকদূর সরে এলেও আমার সংসার চলছে বেগারপ্রথায়। আমার স্ত্রী বেশ ভালো কায়দা বের করেছে। মহিলার ক্ষমতা আছে। পূর্ব জন্মে হয় নীলকর সাহেব ছিল, না হয় সায়েবের হারেমের কোনও দেশি বিবি।

আমি একটা গ্রাম-গ্রাম অঞ্চলে থাকি। বাড়ির চারপাশে একটা বাগান মত ব্যাপার আছে। প্রথমদিকে বাগানই ছিল। প্রতিবেশীদের সহৃদয় উৎপাতে সাধের বাগানে এখন নৈরাজ্য চলেছে। কিছু ফুলের গাছ স্ট্যামিনার জোরে এখনও টিঁকে আছে। আর ক'দিন থাকবে বলা শক্ত। বহুকাল নতুন কোন গাছ বসান হয়নি। এখন পাখিরাই বাগান করছে। ঠোঁটে করে বীজ এনে ফেলে। অনেক সময় পক্ষীকৃত্যের সঙ্গে দুচারটে বদহজমের মাল বেরিয়ে আসে। জমির স্বাভাবিক ধর্মে দু' একটি নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে। ওইভাবে বেশ ঝাঁকড়া একটি ফলসা গাছ হয়েছে। মোরগ ফুল হয়েছে। একটা জামগাছ হয়েছে। জাম মনে হয় পাখিতে করেনি। কোনও লিভারঅলা কুকুরেও করতে পারে অথবা হনুমানে।

সে যাই হোক। এবার মহিলার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। কারণ, এই কাহিনীর তিনিই হলেন নায়িকা। একথা বলা চলে, একটু চেষ্টা করলে তিনি নির্বাচনে জিতে সহজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। আর হলে, আমাদের দেশের হাসপাতালে এই অব্যবস্থা চলতে পারত না। চাবুকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য এমনি একটি প্রতিভা গৃহকূপে ছাই চাপা হয়ে আছে।

চেহারায় বেশ একটা কম্যান্ডার কম্যান্ডার ভাব আছে। হিটলার বেঁচে থাকলে ধরে নিয়ে গিয়ে মহিলা গেস্টাপো করে রাইনল্যান্ডে ছেড়ে দিতেন। এনার সমস্ত

কথাবার্তাই যেন মিলিটারি কম্যান্ডের মত। অ্যায় বললে জগৎ থমকে দাঁড়াল। দেয়াল ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়, এ আমার নিজের দেখা। টুলে উঠে পেন্ডুলাম ঠেলতে হয়। রেডিওর গান থেমে যায়। শিল্পী বলে ওঠেন একটু আস্তে ম্যাডাম। আমি স্পষ্ট শুনেছি। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে মাঝরাতে যখন দুচারটে প্রেমের কথা হত, পরের দিন সকালে প্রতিবেশীরা আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতেন। কেন হাসতেন, বুঝতে পারতুম না। একদিন পাশের বাড়ির রসিক বউদি বললেন, কি ঠাকুরপো, কাল নুকিয়ে নুকিয়ে খুব কাটলেট খাওয়া হয়েছিল ?

কি করে বুঝলেন ?

রাত আড়াইটের সময় ঘুম ভেঙে গেল শুনলাম, আপনার স্ত্রী বলছেন, সরে শোও, তোমার মুখে ভক ভক করছে পেঁয়াজের গন্ধ। এবার থেকে বাইরে কিছু খেলে, একটা করে বড় এলাচ খাবেন। পেঁয়াজের মুখে হাম খেলে প্রেম কেঁচে যায়। জর্দা দিয়ে পানও খেতে পারেন। প্রেমিকারা প্রাণের দায়ে সহ্য করলেও স্ত্রীদের করা উচিত নয়।

সেইদিন বুঝেছিলুম, জীবনের অনেক কথাই গলার গুণে লিক করে বসে আছে। একদিন মাঝরাতে ভীষণ মেঘ করে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। ওঠো-ওঠো ঝড় উঠেছে বলে কম্বুকণ্ঠে এমন একটি হাঁক ছাড়লেন, যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন। সারা জনপদ জেগে উঠে চিৎকার করতে লাগল, কি হয়েছে, কি হয়েছে ? 'জানালা বন্ধ করে পাখাটা খুলে দাও' বলে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

এ সবই তাঁর চরিত্রের গুণ। ঈশ্বর বেশ বড়সড় কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন প্রোডাকসান লাইন থেকে মাল হাত ফসকে বেরিয়ে এসেছে। বাড়িতে একবার চোর পড়েছিল। চোরের আর দোষ কি। অসময়ে বাড়ি বাড়ি ঢোকাই তার ব্যবসা।

চোর দিয়েই শুরু করা যাক।

চোরের নিয়ম হল, চুরি করার আগে বাড়ির চৌহদ্দিতে একটু ইয়ে করা। ঠিকমত হলে বুঝতে হবে নার্ভ ঠিক আছে। এইবার পাইপ বেয়ে ওঠো, কি তালা ভাঙো অথবা গ্রিল ওপড়াও। হাত-পা কাঁপবে না, দিল হেলবে না। নিজের ওপর নিজের কন্ট্রোল।

আমার স্বভাব হল জেগে আছি তো বেশ আছি। একবার শুয়ে পড়লে মড়া। তখন জাগাতে হলে ঢাক ঢোল বাজাতে হবে। কিংবা ঠ্যাং ধরে খাট থেকে ফেলে দিতে হবে। কখন চোর ঢুকেছে জানি না। কিভাবে ঢুকেছে তাও জানি না। শুনেছি খোলা জানালা দিয়ে চোরেরা প্রথম গাঁজাপক্ক বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। তাতে গেরস্থর ঘুম বেশ পেকে ওঠে। তার মানে আমার পাকা ঘুম আরও পাকা হয়েছিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙল, চোর তখন মহিলার খপ্পরে। আমাদের একটা

বাঘাকুকুর আছে। তার হাঁক ডাকও পালিকার কনট্রোলে। যখন ডাকের দরকার নেই, তখন তাকে ঘুমের বড়ি খাওয়ানো হয়। বাঘা তখন হাত-পা ছড়িয়ে ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়। নেশা কেটে গেলে ওঠে, উঠে ভুক্ ভুক্ ডাক ছাড়ে। তখন তার জন্যে বিস্কুট আসে, দুধ আছে। তার খাতিরই আলাদা। সংসারে তার যত্ন আমার চেয়েও বেশি। হিংসে হয়। হলে কি করব। সে কুকুর। পেয়ারের কুকুর। আমি মানুষ। হতচ্ছেদার স্বামী। না মরলে আমার কদর হবে না। মরে যেদিন ছবি হয়ে ঝুলব, সেইদিনই হয়তো প্রাপ্য সম্মান পাব। দু-ফোঁটা অশ্রুজল। তখন আমি গাইবো, জীবনে যারে দাওনি চা-বিস্কুট, মরণে কেন তারে দিতে এলে মশা মারা ধূপ। শুনতে পাবে না। না শোনাই ভালো ! শুনলেই তেড়েফুঁড়ে উঠবে, কি বললে ? ভুলেই যাবে আমি মরে ভূত হয়েছি।

না, অন্য প্রসঙ্গে সরে যাচ্ছি। এসব হল পুরুষ মানুষের অভিমানের কথা। পুরুষ বললে প্রতিবাদের ঝড় বইবে। এ হল খোকাপুরুষ। কুকুরের কথায় ফিরে আসা যাক। কুকুর এমন ট্রেনিং পেয়েছে, আমাকেও ধমকায়। মহিলার ওপর হয়তো একটু হম্বিতম্বি করে ফেলেছি, কুকুর অমনি প্রতিপক্ষের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গড়ড়্ গড়ড়্ করে জানান দিলে, বেশি বাড়াবাড়ি করেছ কি, খ্যাঁক। আধপো মাংস নিয়ে নেমে যাব। সেই সময় স্ত্রী যদি আমার মাথার পেছনে সোহাগের হাত না রাখে, সারাদিন আমাকে এক জায়গায় স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া করলেই কুকুর গড়গড় করবে। আচ্ছা দাওয়াই পাকড়েছে যা হোক। দাম্পত্য কলহের পরিণতি, আমার করুণ মিনতি, ওগো আর করব না, এই নজরবন্দী অবস্থা থেকে আমাকে মুক্ত করো, মুক্ত কর্ মা এলোকেশী, ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার নানারকম ব্যবস্থা ছিল। কুকুরের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা খুব সহজ। নাকের কালো অংশে একটু কাঁচা লঙ্কার রস। সেই পদ্ধতিতেই কুকুরকে জাগান হয়েছে। চোর ঢুকেছিল খাবার ঘরে। বাসন-কোসনের লোভে। বাইরে থেকে শেকল তুলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। জানালা দিয়ে কথাবার্তা চলছে মহিলা হাতে একটা খেঁটে লাঠি নিয়ে জানালার বাইরে। চোর ঘরের মেঝেতে উবু। বাঘা সামনের দুটো পা জানালার গ্রিলে তুলে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এবার কি হবে বাছাধন। চোর আমাদের পরিচিত। তার নাম সোনা। সোনার চাঁদ ছেলে। সকালে খুব টেরি বাগিয়ে ঘোরে।

সেই চোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নাকখত দিতে দিতে। কোমরে দড়ি বাঁধা হল। এমন বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না। মহিলা বললেন, বল কোথায় কি করেছিস ?

কেঁদে বললে, পাতকোতলায়।

সেই মাল নিজে হাতে তুলে পরিষ্কার করতে হল। তারপর ঝ্যাঁটা আর ফিনাইল। ভোর হয়ে এল। নিষ্কৃতি পাওয়া অত সহজ নয়। বেলা বারোটা

অবধি চোর বাঁধা রইল বারান্দার থামে, বাঘার পাহারায়। জনে জনে আসে আর দ্যাখে। ওমা! এ যে আমাদের সোনা।

মহিলা সোনাকে একটা সাইকেল রিকশা কিনে দিয়েছেন। সোনা এখন রিক্সা চালায়। রোজ তিন টাকা জমা দিয়ে যায়। আর মালকানকে হিয়াঁ হুঁয়া ঘোরায়। সে বেচারা চোর থেকে সাধু হয়ে বেগার খেটে মরে। বেলা দেড়টার সময় কটকটে রোদে লাইন দিয়ে ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে এনে মহিলা দারোগাকে সন্তুষ্ট রাখে। যিনি সোনার মত পাকা চোরকে কলুর বদলের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেন, তাঁর যে অসীম ক্ষমতা এ-কথা রাষ্ট্রপতিও মানবেন।

একবার হাত খুলে গেলে তাকে আর পায় কে।

ফুলগাছের কিছু অংশ পাঁচিলের বাইরে যাবেই। রাজা ক্যানিউটও শাসনে রাখতে পারবেন না। ভোরের দিকে সাজি হাতে বাচ্চা একটি মেয়ে, সবে একটা ডাল ধরে টান মেরেছে, মালকান পাঁচিলের এপাশ থেকে আদুরে গলায় বললেন, কি রে ফুল নিবি বুঝি?

আদরে গলে গিয়ে মেয়েটি বললে, হ্যাঁ মাসীমা।

আয় ভেতরে আয়।

আমি ভাবছি, বাবা, শরীরে বাতের মত হঠাৎ দয়া হলো কোথা থেকে। গাঁটে গাঁটে দয়া। মুখে টুথ ব্রাস। সান্টাক্লজের গোঁফের মত চারপাশে পেস্টের ফেনা। মেয়েটি হাসিমুখে দাঁড়াল। ফুল চুরি করতে গিয়ে এমন অভ্যর্থনা সে কোথাও পায়নি।

দে, সাজিটা দে। মহিলা বাঁ হাতে সাজিটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক কুলো র‍্যাশনের চাল নিয়ে।

আয়, এই রকে বোস।

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, বোসবো কেন মাসীমা? আপনি যে বললেন, ফুল দেবেন, চাল দিচ্ছেন কেন?

চাল দেবো কেন। চাল কটা এখানে বসে বেছে দে। তার পর ফুল পাবি।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, আমার ফুল চাই না মাসীমা। সাজিটা ফেরত দিন।

মাসীমা উত্তরে চ্যাপ, বলে অ্যায়সা এক ধমক দিলেন। বোস এখানে, চাল বাছ, তবে সাজি পাবি।

বেচারার কি গেরো। খোল নলচে দুই-ই গেল। করুণ মুখ দেখে আমি একটু সালিশি করতে গিয়ে এক ধমক খেলুম, তুমি চুপ করো। তোমার চরকায় তেল দাও, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ মিহি সুরে বললেন, কতক্ষণ আর লাগবে, টুকটুক করে বেছে ফেল, এক সাজি ফুল পাবি।

ঘণ্টাখানেক লাগল সেই চাল বাছতে। তারপর হুকুম হল, নে, সব গাছে উঠে এক সাজি ফুল পাড়। সেই ফুল তিন ভাগ কর। এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোর, আর এক ভাগ কালীবাড়িতে দিয়ে আসবি।

কালীবাড়ি যে অনেক দূরে মাসীমা। দেরি হয়ে যাবে। আমার মা বকবে।

চুউপ। একটা কথা নয়। যা বলছি তাই শুনবি। তা না হলে সাজি কেড়ে রেখে দোব, কুকুর লেলিয়ে দোব। পাঁচিলের বাইরে লকলক করে দুলছে ফুলগাছের ডাল। বড়ই লোভনীয়। তবে হাত দিয়েছ কি মরেছ। এক-একটি অক্টোপাশের শুঁড়। ভোরের বাগানে অক্টোপাশ চটি পায়ে ঘুরছেন। মুখে টুথ ব্রাশ। ডাল ধরে কেউ না কেউ টানবেই আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যাবে অক্টোপাসের জালে। বাছো এক কুলো চাল, তবেই মিলবে একমুঠো ফুল, নয় তো সাজিটাও যাবে।

আমাদের বাড়িতে তিন-চারটে জলের কল। একটা কল কুয়োতলায়। সেখানে দুটো চৌবাচ্চা। একটা বিরাট আর একটা মাঝারি। লোডশেডিং-এর পর প্রথম যে জল আসে সেটা টালার মিষ্টি জল। মিনিট পনের থাকে। তারপরেই আসে ডিপ-টিউবওয়েলের কষা জল। এই মিষ্টি জল নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বালতি, ডেকচি, গামলা নিয়ে যত কুচো-কাঁচা ঢুকে পড়ে বাড়িতে।

এই জল হল বেগার ধরার ফাঁদ। দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। ফাঁদে এক সঙ্গে এত শিকার? মাকড়সার প্রাণ নেচে ওঠে। খেল শুরু হয় বালতি ভরে ওঠার পর। জল টলটলে বালতিটি তুলে নিয়ে সরে পড়ার তালে ছিল একটি কিশোর। ঘাড়ে যেন বাঘ পড়ল।

জগো, বালতি রাখ। চৌবাচ্চা দুটোর ফুটো খুলে সব জল বের করে দে।

জগো ভাবলে, বাঃ, এ বেশ খেলা! কলকল জল বেরচ্ছে। চৌবাচ্চা খালি হচ্ছে। জানা ছিল না ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে। এই এতখানি একটা বুরুশ হাতে মালকান এসে সামনে দাঁড়ালেন, কোমর বেঁধে, নে, এইবার ঘষে ঘষে ভেতরের শ্যাওলা পরিষ্কার কর।

জগোর চক্ষু চড়কগাছ, ও ঠাম্মা, এ আমি পারব না।

তোর ঘাড় পারবে। জল নেবার সময় মনে থাকে না। পরিষ্কার করলে তবেই জলের বালতি নিয়ে যেতে দোব।

এক ঘণ্টা লাগল জগোর চৌবাচ্চা সাফ করতে। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। হুকুম হল, ভাল করে ফুটো বন্ধ করে পাইপ লাগা। চৌবাচ্চায় পাইপ লাগাবে কি, ঘষে ঘষে জগোর নড়া ছিঁড়ে গেছে। তার নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজতে পারলে ভাল হয়। জগোর সঙ্গে জল নিতে এসে ফাঁদে পড়েছে উমা। সে আর একপাশে চিঁচিঁ করছে। বাজার থেকে চুনো মাছ এনেছিলুম। বঁটি, ছাই আর

চুনো মাছ নিয়ে সে বসে আছে ছলছলে চোখে। ওই মাছ শেষ করে উঠলে তবে সে জলের গামলা তুলে নেবার ছাড়পত্র পাবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে সনাতন চলেছে নেচে নেচে। এই শোন্, কোথায় যাচ্ছিস ?

পাশের একটা ছোট কারখানায় সনাতন কাজ করে। কারখানার কি একটা কিনতে বাজারে ছুটছিল। হাতে লোহালক্কড়। ছেলেটা সব সময় হাসে। হাসতে হাসতে পাঁচিলের পাশে এসে বললে, বাজারে যাচ্ছি মাসীমা।

তোর ওই সব লোহালক্কড় রাখ এখানে।

কেন মাসীমা ?

এই নে কেরোসিনের টিন আর টাকা। ওদের দোকানে তেল দিচ্ছে। এনে দে পাঁচ লিটার।

আমি কারখানার কাজে যাচ্ছি যে।

গোলি মার তোর কাজে। এক ফোঁটা তেল নেই বাড়িতে। আমরা কি অন্ধকারে থাকব।

বিরাট লাইন মাসীমা। আমি পরে এনে দোব।

হ্যাঁ, তেল তোমার জন্যে বসে থাকবে।

এখন আমি পারব না।

ঠিক আছে মনে থাকে যেন ! আজ বাদ কাল শনিবার, তুমি টিভি দেখতে এসো। সরস্বতী পুজোর সময় লাইটের কানেকসান চেয়ো। তখন ভাল করে দোব।

কুইনিন খাবার মত মুখ করে সনাতন ছুটছে তেল আনতে।

ইতিমধ্যে গৌর পালাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেও ফাঁদে পড়ে গেল। তার ঘাড়ে চাপল র‍্যাশান। গুঁইগাঁই করছিল। যেই শুনলে, আমাদের ছেড়ে-দেওয়া পামতেল ভবিষ্যতে আর পাবে না, ঘাড় হেঁট করে ছুটল র‍্যাশান তুলতে। মাঝে মাঝে আমরা চাল গম আর তেল ছেড়ে দি ! গৌরের মা সেইসব পায়। গৌরের টিকি তাই মহিলার হাতে। টানলেই মাথা চলে আসে।

দাদারও দাদা আছে। এমন চেলা আছে যে গুরুকে চা বাগানে বেচে দিয়ে আসতে পারে। ক-দিন থেকেই লক্ষ্য করছি মহিলার দাপট যেন একটু কমে এসেছে। সামান্য উদাস উদাস ভাব। মাঝে মাঝেই পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। গলা তুলে কাকে যেন খুঁজছেন। যৌবন উতরে গেল, এ বয়েস তো প্রেমে পড়ার নয়। বলা যায় না, পরকীয়া কখন কিভাবে এসে পড়ে। যদি আসে মন্দ হয় না। কেউ ইলোপ করে নিয়ে চলে যায়, দিনকতক একটু শান্তিতে থাকা যায়।

পাঁচিলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন, মুখে চুকচুক শব্দ। একেবারে আমার মুখোমুখি !

কি হল ম্যাডাম ?

থাক আর রসিকতা করতে হবে না। আমার বলে নিজের ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা !

কেন, কি হল ?

সনাতনকে ক'দিন হল দেখতে পাচ্ছি না।

তেল ফুরিয়েছে বুঝি।

তেল ফুরোলে ত বুঝতুম, আমাদের প্রেসার কুকারটা সারিয়ে আনতে বলেছিলুম ! সেই যে নিয়ে গেল, আজ সাতদিন হয়ে গেল টিকির দেখা নেই। এদিকে একটা গুজব শুনছি, সত্যি-মিথ্যে জানি না।

কি গুজোব, ছেলেধরার !

আরে ধুর, ও দামড়াকে কে ধরবে ! শুনছি, ওই নাকি একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে পালিয়েছে।

সে কি গো, একটা প্রেসার কুকারের যে এখন অনেক দাম।

তাই তো রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। তুমিও একটু সন্ধান করো না। ধরতে পারলে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব।

এ পাড়ার দুজন মানুষ এখন হন্যে হয়ে দুটো জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। একজন তালাশ করছেন তাঁর একমাত্র মেয়ের ! আর একজন সন্ধান করছেন প্রেসার কুকারের। সংসার বড় মিইয়ে পড়েছে। জোড়া হিস্ না হলে তেমন জমে না। প্রেসারেরও মেল-ফিমেল আছে। মেলটা গেছে, ফিমেল তাই বড় মন-মরা। এই বিরহে আমি কিন্তু বড় মধুর আছি।

শাপের বর

আমার স্ত্রীর নাম স্নিগ্ধা। বেশ ভারিক্কি চালের মহিলা। স্বভাবে মোটেই স্নিগ্ধ নন। নাগ উগ্রচণ্ডী হলে বেশ মানাত। যে বয়সে সাধারণত নাম রাখা হয়, সে বয়সে মানুষের স্বভাব প্রকাশ পায় না। সেই কারণেই বোধ হয় নামঘটিত এই মারাত্মক অমিলটি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এই জিনিসটির হাতে জেনেশুনেই আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটু টাইট হবার জন্যে। ইঁট-চাপা ঘাসের মত আমার জীবন এখন বিবর্ণ। যাক, দুঃখ করে লাভ নেই। কপালে লিখিতং ধাতা কোন শ্লা কিং করিষ্যতি !

এই মুহূর্তে আমার সেই তেজি টাট্টু ঘোড়ার মত স্ত্রী বিছানায় আমার পাশে শুয়ে কোঁক কোঁক শব্দ করছেন। না কুঁকড়ো খেয়ে নয়, জ্বর এসেছে কম্প

দিযে। অর্থাৎ হাতি এখন পাঁকে পড়েছেন। আমি এক চামচিকি। ইচ্ছে করলে কুতুস করে একটা লাথি মারতে পারি। অতটা অভদ্র নই, তাছাড়া সেরে ওঠার ভয় আছে। এ জিনিস বেশিদিন শয্যাশায়ী থাকবেন না। আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারি। তখন আমার এই অপরাধের শাস্তি কি হবে ভেবে আমার সেই প্রবাদোক্ত চিকিচাম হবার সাহস শীতের প্রত্যঙ্গের মত গুটিয়েই রইল।

কপালে হাত রেখে মনে হচ্ছে দুইয়ের কম হবে না, তিনও হতে পারে। এর কম হলে ঠিক মানাবেও না। স্নিগ্ধা এখন খুবই উত্তপ্ত। ঘাড়ে একটা চাদর চাপিয়েছে, তার ওপর একটা খেস, তার ওপর দুটো পাশ বালিশ। এইবার ওই বিচিত্র কম্বিনেশানকে আমি চেপে ধরি, তেনার শরীরের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেঁপে কেঁপে উঠছি। ধরিত্রী মাতা কেঁপে উঠলে সন্তানেরও তো নিস্তার নেই। সবই রসাতলে যাবার দাখিল।

মাঝে মাঝে কোঁকোর কোঁ থামলে দাঁতের বাদ্য সহযোগে দু একটি মধুর বাক্য শ্রীমুখ নিঃসৃত হচ্ছে। জানতুম, জানতুম আমার এই অবস্থাই হবে। যে হাতে পড়েছি! (কে যে কার হাতে পড়েছে!) বাবুরা এমন বাড়ি করলেন নর্দমা দিয়ে জল সরে না। কোঁকোর কোঁ। ভাল করে চেপে ধরতেও পার না, ল্যাদাড়ুস! (স্ত্রীকে চেপে ধরতে পারে, এমন স্বামী কজন আছে!) তার ওপর আবার বাগানের শখ! কোঁকোর কোঁ। বাগান করেছে, বাগান! (দাঁতের বাদ্যি) আফ্রিকার জঙ্গল বানিয়ে বসে আছেন। মশার ঠ্যালায় তিষ্ঠোয় কার বাপের সাধ্যি! আমি জানতুম এই গুলবাগিচায় আমার ম্যালেরিয়াই হবে। এইবার লিভার বাড়বে, পিলে ফুলবে। গ্যাঁড়গেঁড়ে পেট নিয়ে বাকি জীবনটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বাবুর গার্ডেন চেয়ারে বসে বসে শোভা দেখি, গাছের শোভা। কোঁকোর কোঁ।

ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটির জলজ্যান্ত উদাহরণ। হাতের কাছে যা ছিল, বিছানার চাদর, দরজার পর্দা, কাঁথা কম্বল সবই চাপানো হয়েছে। এক-তলা, দো-তলা অবস্থা। দো-তলার গাড়ি বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে মুখ ঝুলিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি, কি বুঝছো! আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোমার মত ফেটে পড়ছেন। আর কিছু চাপাতে পারছ না! হাতের কাছে আর তো কিছু দেখছি না। চাপাতে চাপাতে দেউলে হয়ে গেছি। শেষ একটা জিনিসই চাপানো যেতে পারে, সেটা হল রোড রোলার। রাস্তা মেরামত হচ্ছে। বাইরে দাঁড়িয়ে সেই দৈত্য বিশ্রাম করছে। একমাত্র ওটি চাপালে এটি হয়ত শান্ত হবেন। চির শান্তি। আমার সেই গরম কাপড়ের স্যুটটা পরবে? যেটা পরে আমি লে, না লাদাখ, কোথায় যেন গিয়েছিলুম। কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। (জ্বলবেই তো! পিলে বড় হয়েছে যে। রাত দশটা নাগাদ জ্বর এসেছে, দুঘণ্টা হতে চলল। এতক্ষণে পিলে নিশ্চয়ই ইঞ্চিখানেক বড় হয়েছে। পিলে তো ভারতের অর্থনীতি নয় যে, বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করেও বড় হয় না!) ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। ভেবো না, তোমাকেও ধরল বলে।

সে তো ভালই। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। দু-জনে জাপটাজাপটি করে এক আত্মা, এক প্রাণ, এক দেহ হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে, কোঁ কোঁ করব! দাম্পত্য জীবনের ফাটল ফোটল ম্যালেরিয়ার পলেস্তারায় জোড়া লেগে যাবে।

জ্বরটা একবার দেখ তো। মনে হয়, ছয় কি সাতে উঠেছে!

বাব্বা! মানুষের জ্বর-মাপা যন্ত্রে তো কুলোবে না। স্কেল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ঘোড়ার থার্মোমিটার চাই। ড্রয়ার থেকে থার্মোমিটার বের করে ঝাড়তে থাকি। পারা কি সহজে নামতে চায়। চুরানব্বইতে আটকে বসে আছে। খ্যাচাং খ্যাচাং করে ঝেড়েই চলেছি। হাতের খিল খুলে যাবার দাখিল। নিজের পারাই নেমে গেল, থার্মোমিটারের পারা যেমন তেমনি।

ঠুং করে একটা শব্দ হল। টেবিলের কোণে লেগে যন্ত্রের যন্ত্রণা শেষ। মেঝেতে কাচের কুচো। মুক্তোর দানার মত তিন চার দানা পারা কোণের দিকে টল টল করছে। নামতে নামতে একেবারে মেঝেতে গিয়ে নামল।

যাঃ বারোটা বাজালে তো! খাও না খাও, কাল সকালেই একটা কিনে আনবে। ওটা রমাদির থার্মোমিটার।

আমাদেরটা কোথায় গেল?

কমলাদি সেবার ছেলের জ্বরের সময় নিয়ে গেল না!

তারপর কি হল?

আর এল না। সেখান থেকে গেল ছন্দাদের বাড়ি। ছন্দা থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে তন্দ্রা...

বুঝেছি, বুঝেছি। ক্রিস্ট্যাল ক্লিয়ার। জরু আর গরুর মতই থার্মোমিটার একবার হাত ছাড়া হলে আর ফিরে আসে না। সকালে ডাক্তারবাবু এসে ডিক্লেয়ার করলেন, জ্বরের গতি প্রকৃতির দিকে কড়া নজর রাখুন। বিছানায় ফ্ল্যাট করে ফেলে রাখুন। তিনটি অস্ত্র ছেড়ে গেলুম, ম্যালেরিয়া, বিকোলাই আর টাইফয়েড। যেটা লাগে। এতে যায় ভালই, নয় তো প্রস্তুত থাকুন। দেহনির্যাস টেস্ট করে মাল ছাড়ব।

সেটা তো আগে করলেই হয়।

কি দরকার? দেখাই যাক না দিন দুই।

এইবার শুরু হল রিয়েল খেল। কে বাঁধবে? শব্দময় ঝঙ্কৃত প্রভাতের বদলে এ যেন ভিন্নতর একটি দিন। স্নিগ্ধার হাঁকডাক নয়, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, টুইস টুইস। কি আশ্চর্য! পৃথিবীতে এখনও পাখি ডাকে! ভুলেই গিয়েছিলুম। দেয়াল ঘড়ি চলছে খটাস খটাস শব্দ। একটা বেড়াল ডাকছে করুণ সুরে। কি সুন্দর মসৃণ, পেলব, প্রসন্ন একটি সকাল। মশারির বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি রুগীর মুখ। জ্বর একটু কম। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আহা। ঘুমোও ঘুমোও। উঠলেই বড়ো শব্দ হবে। শব্দযন্ত্র। খাটের তলায় একটি বাসি আরশোলা কেতরে কেতরে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছে। অন্যদিন সাহস পায় না।

আর দেখছি রান্নাঘরের দরজার সামনে দু বোতল দুধ হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। কেটলির ওপর ছাঁকনি কার্নিসে ঝুলতে থাকা আত্মহত্যাকারী ব্যর্থ প্রেমিকার মত বাতাসে দুলছে। পড়িতে পড়িতে না পড়ি না পড়ি। সকালের সংসার অপেক্ষা করে আছে। ভিতরটা চা চা করছে।

রান্নাঘরের দরজা খুলতেই ভুস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে এল দুঃখীর দীর্ঘশ্বাসের মত। অনেক আগেই এ বাতাসের মুক্তির কথা ছিল। আজ সব কিছুই লেটে চলছে। জানালা খুলতেই আলো এল। কোণের দিকে গ্যাস সিলিন্ডার তাল ঠুকে বললে, আয় চলে আয়, তোকে যমের বাড়ি পাঠাই। বড়ো ভয় পাই ওই লৌহ মুদগরকে, জঠরে যার তরল অগ্নি। ফেটে ফুটে কত যে রেকর্ড করেছে। নারী চরিত্রের মত। বেশ আছে, বেশ আছে, হঠাৎ দুম ফট। সব্যসাচী চলে গেলেন সহমরণে।

গ্যাসের দরকার কি? হবে তো চা, দুধ জ্বাল আর ভাতে-ভাত। সাহেবগঞ্জের খাঁটি গব্য টেবিলের ওপর শিশিতে যত দিন যাচ্ছে ততই আরো হলদে হয়ে আরো গরু হচ্ছে। কেরোসিন কুকারেই কাজ চালিয়ে দেওয়া যাক। গ্যাসে খোঁচাখুঁচি না করাই ভাল। তেঁটিয়া স্বভাব। যেমন আছে থাক এক পাশে।

কুকার ঝন ঝন করছে। তেল নেই, বোতল টিন সব খালি। পশ্চিমবঙ্গে কবে যে তলে তলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। থেকে থেকে ব্ল্যাক আউট। মাঝে মধ্যেই শত্রুপক্ষের অদৃশ্য বিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বোমা ফেলে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার। বাস ট্রাম দেখলে মনে হয় লোক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেভাবেই হোক বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে চাইছে। কেরোসিন তেলের বিশাল বড় লাইন এঁকে বেঁকে পড়ে আছে। মাঝ সমুদ্রে ব্লিৎসক্রিগ চলেছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তেল মিলবে। লাইনে দাঁড়িয়েই মানদার ডেলিভারি হয়ে গেল। ছেলের নাম রেখেছে কেরোসিন কর্মকার। খেলার লাইনের এক্সপার্টরাই চাকু চড়িয়ে তেলের লাইনে। ধৈর্যে কে হারাবে তাঁদের?

আবার গ্যাসের দ্বারস্থ। ওলটানো শিবলিঙ্গটি স্তোত্রপাঠে সন্তুষ্ট করে হাত লাগাই। কোনটা যে কি, কেমন করে ঘোরায়? রবারের কানেক্টার টিউবে সাবানের ফ্যানা মাখিয়ে দেখতে হবে নাকি? লিক করছে কি না! সব সমস্যা মিটলেও একটা সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, ভাত প্রায় ফুটে সেদ্ধ হয়ে এসেছে এখন ফ্যান গালার কি হবে! নারীর জীবনে বিবাহ যেমন এক সমস্যা, পুরুষের জীবনে ভাতের ফ্যানস্রাব তেমনি এক সমস্যা। সমস্যার কি আছে? চেষ্টা করে দেখতে কি দোষ! হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দাও। দু দিক থেকে ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়েই টেনিসের ব্যাকহ্যান্ড সার্ভিসের মত উলটে দাও। ঢাকনার মুখ ফাঁক হয়ে সিঁই করে বেরিয়ে এল গরম হাওয়া। তার পরের ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে গেল। সামান্য একটু চিৎকার। হাঁড়ির পতন। প্রদর্শনী নম্বর

দুই। প্রথম প্রদর্শনী বিছানায়। দ্বিতীয় প্রদর্শনী, চেয়ারে ঠ্যাং ছড়ানো আমি, হাতে পায়ে হলদে পোড়ার মলম। তোরা কে দেখবি আয়, কদমতলায় পোড়া কৃষ্ণ, রাধিকা বিছানায়।

একেই বলে শাপে বর। জ্বর বেশ জেঁকেই বসল। দিনে তিনবার কেঁপে কেঁপে আসে আর ঘাম দিয়ে ছাড়ে। ধরে আর ছাড়ে। পুলিশের পলিটিক্যাল মস্তান ধরার মত। আত্মীয়স্বজনরা এগিয়ে এলেন। সংসার চলতে লাগল সর্বজনীন পুজোর কায়দায়। কাকিমার বাড়ি থেকে ভাত, দু'চার পদ তরকারি। পিসিমার বাড়ি থেকে পোস্ত। জ্যাঠাইমার বউমা সম্প্রতি ঘর আলো করে এসেছেন। রন্ধনবিদ্যায় দ্রৌপদী। তাঁর হাতের নানা কেরামতি, সব আসতে লাগল লাইন দিয়ে। যেন রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে। আসছেই আসছে। অড়হর ডাল, লাউ দিয়ে মুগের ডাল, মাছ, তাড়াহুড়ো, তাই ডিম এসেছে সেদ্ধ। খাবার ঘরে সারি সারি মাল চাপা। ঢাকা খুললেই নানা বিস্ময়। আত্মীয়স্বজনরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। থালার পাশে গোল হয়ে বাটির সারি। সারির পর সারি, একসার, দু'সার। রবিবার তিনসার, চারসার।

ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, একমাস একেবারে চিৎপাত পড়ে থাকুন। কোনও কাজ নয়, স্রেফ ক্যাপসুল খেয়ে যান। আমি যখন বলব গেট আপ, তখনই গেট আপ। তার আগে নয়। কি মজা! সকালে বাজার ছুটতে হচ্ছে না। মাছের ন্যাজ ধরে টানাটানি করতে হয় না। রাজার মত ঘুম থেকে ওঠো, দাড়ি কামাও, চা খাও, কাগজ ওলটাও। চান করে বসতে না বসতেই লাইন দিয়ে আসতে লাগল, বাটি, ঘটি, ডেকচি, ডেড়ি, ডামড়ি। এক একটা আইটেম আবার শেষ মুহূর্তে উড়তে উড়তে আসে শেষ মুহূর্তের ট্রেনযাত্রীর মত।

চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো। এই বাজারে ঘাড়ে বসে খাওয়া। একদিন দুদিন হলে কথা ছিল না, দিনের পর দিন। একদিন একটা ব্যাগে পাঁচশো আলু, আড়াইশো পটল, দুশো ঢ্যাঁড়স, গোটা তিনেক করলা, একটা চালকুমড়ো, এক ডগা পুঁইশাক, আর এক হাতে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে ছোট্ট একটি কাতলা মাছ নিয়ে এক রাউন্ড ঘুরে এলুম। প্রথমে পিসিমার বাড়ি। ছি, ছি, বাবা! তুমি এত নীচ! আমাদের এতই দরিদ্র ভাব। এ তো আমাদের কর্তব্য! যাও নিয়ে যাও। আর কখনও মানুষকে এভাবে অপমান কোরো না। পিসতুতো ভাই বললে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। দেবার আগে এক কাপ চা খাইয়ে দাও।

সেই একই ব্যাগ হাতে কাকিমার বাড়ি। বড়ো মর্মাহত হলুম বাবা। তিনি বেঁচে থাকলে তোমাকে জুতোপেটা করতেন। এক সময় যৌথ পরিবার ছিল, এখনই না হয় ভেঙে ভেঙে চুরমার। তিনি তোমায় কোলে-পিঠে মানুষ করে গেছেন। আমার ছেলে কি এতই গরিব? তুমি একটা দেড়ছটাকি কাতলা নিয়ে সাত সকালেই আদিখ্যেতা করতে এসেছ! এ সবই হয়েছে তোমার বউয়ের

পরামর্শে। পরের মেয়ে এসে এই ভাবেই ঘরের ছেলেকে পর করে দেয়। ঘোর কলি রে বাপ!

আচ্ছা আমি তাহলে আসি, বলে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লুম।

এরপর জ্যাঠাইমা। আমার ব্যবহারে তিনি এতই মর্মাহত হলেন, উপায় থাকলে আত্মহত্যা করতেন। নেহাত সংসারে বাঁধা পড়ে গেছেন। মনটাকে ভীষণ উদার করার পরামর্শ দিলেন, যেমন আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন। তুমি গলায় ব্যাগটি ঝুলিয়ে কেটে পড়ে এখন। জেনে নিলেন কটায় খেতে বসব। ঠিক নটার সময়।

শীতলাতলায় অনেক দিন একটা সিধে মানসিক করা ছিল। আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, মাছ, পূজারীর হাতে দিয়ে একটি প্রণাম ঠুকে পলায়ন। হিসাব করে দেখলুম স্বার্থের পাল্লা লাভের দিকেই ঝুঁকে আছে। রোজ ওষুধ চলেছে গোটা ছয়েক টাকা। নানা রকমে টেস্টফেস্ট গোটা পঞ্চাশ টাকা, ভিজিট গোটা তিরিশ, বাকি সবই তো দাতব্যে চলেছে।

এরপর লাভের ওপর নিট লাভ, স্নিগ্ধা ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর মুখে বললে এবারে আমার জন্যে আর পুজোর শাড়ি কিনো না। চিকিৎসায় তোমার অনেক খরচ হচ্ছে।

আম্মার ভূত

আমার ছেলেকে আমি সায়েব বানাবো।

রঙে নয়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে, সহবতে ? আমি কালো ? আমার ছেলে ঝুল কালো। যখন হাসে, মনে হয় ভাল্লুকে শাঁকালু খাচ্ছে। বাপ হয়ে ছেলের সমালোচনা করা উচিত নয়। বউ ফর্সা, ছেলেটা কেমন যেন আবলুস কাঠের মত হল ? অভিজ্ঞরা বলেন, ভেব না, মেয়ে তোমার মেম হবে। ছেলেরা বাপের দিকে যায়, মেয়েরা মায়ের দিকে। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, কালো চোখের মণি! কালো জগৎ আলো।

সায়েব পাড়ার ইস্কুলে ব্যাটাকে ভর্তি করতে হবে।

পয়সা যখন আছে কেন করব না। কিন্তু পয়সায় ত আর নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না। সে অনেক হ্যাঁপা! শুনেছি, শিশু যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে গর্ভসলিলে হেঁট মুণ্ডু ঊর্ধ্বে পুচ্ছ তখনই নাকি ভাল স্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখাতে হয়। স্ত্রীর কানের কাছে চিৎকার করে ইংরেজি বই পড়তে হয়। পুরনো দিনের লেখকের লেখা চলবে না। হাল আমলের লেখক চাই।

আমেরিকান লেখক হলে ভাল হয়। গোর ভাইডাল সল বেলো স্টেইনবেক। স্ত্রী ডাকলে হ্যাঁ বলা চলে না। বলতে হবে ইয়েস ! এমন কিছু বই পড়ে শোনাতে হবে যাতে ইয়াঙ্কি স্ল্যাং আছে। হ্যারলড্ রবিনস, হেডলি চেজ। এ সব করার উদ্দেশ্য, ভ্রূণের চারপাশে একটি ইংলিশ মিডিয়াম তৈরি করা। মানে বনেদটাকে বেশ শক্ত করে গেঁথে তোলা।

আমার শ্যালিকা এ সব ব্যাপারে ভারি এক্সপার্ট। আমার বউয়ের মত গাঁইয়া নয়। বহুকাল আগেই চুলে তেল মাখা ছেড়েছে। শ্যাম্পু করে করে চুলের চেহারা করেছে কি সুন্দর। ম্যারিলিন মনরোর মত। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। ঠোঁটে চকোলেট কলারের লিপস্টিক, তার ওপর লিপগ্লস। আজ পর্যন্ত, আমি একবারও ফ্যাক ফ্যাকে ঠোঁট দেখিনি। অলওয়েজ স্মার্ট। চোখে ব্ল্যাক প্যানথারের চোখের মত বিশাল এক গগলস। সেকসকে সোচ্চার করে রেখেছে। শাড়ি পরার অসাধারণ কায়দা কোথা থেকে সে রপ্ত করেছে! যেমন কোমর তেমনি তার কায়দার প্রদর্শনী। চীনে খাবার ছাড়া খায় না! মাঝে মধ্যে ফ্রাই খায়। স্যুপ দেখলে. আমার বউয়ের মত মেগ্‌গে করে ওঠে না। শুনেছি মাঝে মধ্যে একটা দুটো বিড়ি ফোঁকাও করে থাকে। নাইটি পরে শুতে যায়।

সেই মায়ের ছেলে পেট থেকে ড্যাডি ড্যাডি করে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! শ্যালিকা বলে, সাজ, পোশাক, আহার বিহারের ওপর মানুষের অনেক কিছু নির্ভর করে। বিকিনি পরলে বাঙালী মেয়েও, কিস মি কিস মি ডার্লিং বলে সি-বীচে ছুটতে থাকবে। শাড়ি পরলে, বলদ, গোয়াল, সাঁজালে, সিঁথির সিঁদুর, সন্ধ্যের শাঁখ, এই সবই মনে আসবে। মনে আসবে ঘুঁটে, গোবর, গুল, গঙ্গাজল। দোজ ডেজ আর গন পাঁচু!

এখন বাইকের পেছনে বয় ফ্রেন্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে অফিসে যাবার যুগ পড়েছে। জীবনের পেছনে লেখা থাকে—Look here। সাঁঝের বেলায় আর সাঁঝাল নয় পার্ক স্ট্রীটের আলো আঁধারী, ঝকাঝকম, ঝকাঝম বারে বসে লাল ঠোঁটে, লাল পানীয়ের গেলাস।

আমার ছেলের মা সারাজীবন কি করে এল ? ছাপা শাড়ি পরে এতখানি একটা খোঁপা করে শ্বশুর, শাশুড়ির সেবা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলা। পেটে পুঁই শাক, লাউয়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, খোসা চচ্চড়ি। সেই মায়ের ছেলে ব্যাবা, ব্যাবা করবে না ত, কি করবে ?

বউয়ের ত অনেক ধরন আছে। কেউ বউমা, মানে যার মধ্যে মা মা ভাবটা বেশ প্রবল। কেউ বধূ। যার মধ্যে কন্যাভাব প্রবল। কেউ শুধুই বউ, সাদামাটা, ঘরোয়া একটা ব্যাপার। কেউ ওয়াইফ। স্লিভলেস ব্লাউজ, অর্গান্ডির শাড়ি, সে এক আলাদা ব্যাপার। কেউ আবার মিসেস। একটু রঙ চটা। দেহে তেমন বিন্যাস নেই একটু এলোমেলো। বেঁচে থাকার ধরনটা গেলেও হয়, থাকলেও হয়। সংসার চলছে চলুক।

কথায় আছে, স্বভাব না যায় মলে, ইজ্জত না যায় ধুলে। ইজ্জত বলে না ইল্লত বলে কে জানে। একই মায়ের দুই মেয়ে। আমারটি এক রকম, শ্যালিকাটি আর এক রকম। ওই জন্যেই মানুষের উচিত শ্যালিকাকে বউ করে বউকে শ্যালিকা করা। সে ত আর হবার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে ফোঁস-ফোঁস করে জীবন কাটাই।

একদিন, দু'দিন ইংরেজী সিনেমায় নিয়ে গেলুম। ঘুমিয়ে ঘণ্টা পার করে দিলে। কি গো, ঘুমোচ্ছ কি, ছবি দেখ। অত বড় একজন অভিনেতা মারলেন ব্র্যান্ডো।

মুখে সুপুরি ঠুসে কি যে ইংরিজী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথামুণ্ডু।

বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কর। পরে আমাকে গল্পটা বলে দিও।

লাও, বোঝো ঠ্যালা।

দ্বিতীয়বার ঘুমের আয়োজন করতে করতে বললে, মোগলাই খাওয়াবে ত ?

ওই এক শিখে রেখেছে, কলকাতায় এলেই মোগলাই। মোল্লার দৌড়।

কেন চাইনিজ খাবে চলো।

না বাবা আরসোলার গন্ধ।

ফিস ফ্রাই।

না বাবা, হাঙরের তেলের গন্ধ।

আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ও সহজে ফয়সালা হবে না। এখন দয়া করে চুপ করুন, পরে বাইরে গিয়ে যা হয় করবেন।

ইস্! লজ্জার একশেষ। তারপর থেকে কোনও দিন আর বউকে কোনও ব্যাপারে চাপাচাপি করিনি! যা হবার তা হবে। এখন ছেলেটা বেশ চড়কো হয়েছে, তাকেই মানুষ করার চেষ্টা করি।

অনেক ধরাধরির পর বেশ নামজাদা এক সায়েবী স্কুল থেকে একটা ভর্তির ফর্ম মিলল। আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। ফর্ম জমা পড়বে, তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। রেজাল্ট দেখে দশজনকে নেওয়া হবে ?

এইটুকু ছেলের কি পরীক্ষা হবে। মুখে এখনও আধো আধো বুলি। কোমর থেকে প্যান্ট খুলে খুলে পড়ে যায়। কেউ কোনও উলটোপালটা কথা বললে আঁচড়ে কামড়ে দেয়।

ওই আঁচড়ানো কামড়ানোটাই ভয়ের। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে যদি কামড়ে দেয়। সারা জীবনের মত হয়ে গেল। নারসারি রাইম আর পড়তে হচ্ছে না। দুলে দুলে পড়ে যাও, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। পাড়ার বাঙলা স্কুলে ইস্তিরি চটকানো জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে কেরানিগিরি

কর। পিত্তি-চটকান ভাত, ট্যাঁড়স ভাতে কচি কাঁচালঙ্কা দিয়ে বাকি জীবন গিলে মর।

ছেলেকে খুব তালিম দিতে থাকলুম মাসখানেক ধরে। পাখির ইংরেজী, বার্ড। সাহেবরা উচ্চারণ করে ব্যার্ড। টিকটিকির ইংরেজী গেকো। পাখিটি—দ্য বার্ড, স্ত্রী লোকটি, দ্য উওম্যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? মানুষ কবে চাঁদে গিয়েছিল? কি তাঁদের নাম? সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। আমি স্যান্ডউইচ খাই, আই ইট স্যান্ডউইচেস। স্যান্ড মানে বালি, উইচেস মানে ডাইনীরা। আগামী কাল, টুমরো? হাড়ের ভেতর থাকে মারো। টুম্যারো। গতকাল ইয়েসটারডে। বলো বাবা, বলো। মানিক বলো! না, মানিক বড় সেকেলে, বাঙলা নাম। বলো জ্যাকি, বলো! আমি ভাল ছেলে, আই অ্যাম এ গোড, গোড না গুডই বলো, আই অ্যাম এ গুড বয়!

পরীক্ষার দিন সাত সকালে স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে গেলুম পরীক্ষা দেওয়াতে। কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা রাস্তায় দাঁড়ান, অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ছেলেও শালা তেমনি। নিজের ছেলেকে কেউ শালা বলে। রাগে বলে। সে ব্যাটা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় চেঁচাতে লাগল, না আমি যাব না।

বলতে চেয়েছিলুম, ডোণ্ট বি ফাসসি জ্যাকি। রাগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভুতো, মারব এক চড় রাসকেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফাদার কিচলু। তিনি বললেন, ও, দ্যাটস নট দি ওয়ে।

কি করব ফাদার। রাগে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

ওঃ নো নো, খুন চাপিলে চলিবে না! বি সফ্‌ট, বি এ ফাদার, নট এ বুচার।

কাম, মাই সান। মাই লিটল হোলি চাইলড।

ফাদার জানোয়ারটার কোমর দু-হাতে জড়িয়ে ধরে মিশনারী কায়দায় কাছে টেনে নিতে চাইলেন।

কোন্ মাল থেকে কি মাল বেরিয়েছে জানা ছিল না। ভুতো তার পুরনো দাওয়াই ছাড়ল। ঘ্যাঁক করে ফাদারের ডান হাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

ও গড, হি ইজ এ লিটল সেটান, অ্যান আগলি ডাকলিং। আই নিড সাম অ্যাণ্টিসেপটিক, এ টেট ভ্যাক।

টেট ভ্যাক লাগবে না ফাদার। ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন দেওয়া আছে।

অ্যাণ্টি র‍্যাবিজ দিয়েছিলেন কি?

সে তো কুকুরকে দেয় ফাদার।

হি ইজ মোর দ্যান এ ডগ।

আমি ওকে একটা কষে চড় মারতে পারি ফাদার! ভীষণ রাগ হচ্ছে।

নো নো ডোণ্ট ডু দ্যাট। একটি চড় আপনি আপনার গালে মারুন।

কামড়াবার পর ছেলে একটু শান্ত হল। ফাদারের গাউনের ঝোলা বেল্ট ধরে আমাদের দিকে তাকাকে তাকাতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল। আহা চেহারার যা ছিরি হয়েছে। তখন অত করে বারণ করলুম, ভদ্রমহিলা শুনলেন না, চোখে কাজল পরাবার কোনও প্রয়োজন ছিল ! সায়েবদের ছেলেরা কাজল পরে ? সারা মুখে কাজল চটকেছে। ভাগিস, ভূতের মত গায়ের রঙ, তা না হলে কি সুন্দরই না দেখাত !

স্কুল বাড়ির দিকে তাকিয়ে দু-জনে গাছতলায় বসে রইলুম পাশাপাশি। শালীর ছেলেটা কি স্মার্ট ! এই বয়েসেই ইংরেজি গালাগাল দিতে শিখেছে। আধো আধো ভাষায় কি সুন্দর লাগে শুনতে ! ও ছেলে বিলেত যাবেই। ওই জন্যেই লোকে মেম বিয়ে করে। ছেলেটা অন্তত সায়েব হবে ! আমার বউটাকে দেখ ! ঠিক যেন শাড়ি জড়ান প্যাকিং কেস ! প্যাকিং কেস থেকে ভূতই বেরবে।

সারা স্কুল বাড়িটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। অসংখ্য শিশু কাঁদছে। হাজার রকম সুরে। ঠিক যেন শুয়োরের খোঁয়াড়ে আগুন লেগে গেছে ! কি হল রে বাবা ! সব অভিভাবকই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কান্নার পরীক্ষা হচ্ছে নাকি। পরীক্ষক হয়ত প্রশ্ন করেছেন— হাউ টু ক্রাই ! একটু পরে হয়ত হাসি শোনা যাবে। যাক বাবা, এই একটা আইটেমে আমার ছেলে ফুল মার্কস পাবে। কেউ হারাতে পারবে না।

এক বাঙালী ভদ্রলোক আমার ছেলেকে চ্যাংদোলা করে স্কুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, ব্যাটা হাত পা ছুঁড়ে চেল্লাচ্ছে দেখ। কানের পোকা বেরিয়ে আসবে।

নিন মশাই, আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। ত্রিসীমানা থেকে দূর হয়ে যান। নিজে কেঁদে সব ছেলেকে কাঁদিয়ে এসেছে। নিয়ে যান, নিয়ে যান !

এসো বাবা এসো, কে মেরেছে বাবা।

মায়ের আদিখ্যেতা শুরু হল। আদর দিয়ে বাঁদর হয়েছে। দু চোখ বেয়ে কালো জল পড়ছে। ভূতের কান্না ত কালোই হবে !

ওটাকে নর্দমায় ফেলে দাও।

আহা, বাছা আমার ! ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রাসকেল আমার।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল্লুম— চল, তোর আর সায়েব হয়ে দরকার নেই। তুই বাঙালীই হবি চল।

ফুল আর ভুল

সব বাড়িরই একটা পাশের বাড়ি থাকে।

একটা বাড়ি নয়, চারপাশে বাড়ির পর বাড়ি। বাড়ির মৌচাকে এক একটি পরিবার। দিবারাত্র, হল হল গল গল করছে। এ ঢুকছে, ও বেরচ্ছে। এ চেল্লাচ্ছে, ও গান গাইছে। এ পাশে হরিনাম, ও পাশে রামনাম। বাঁদিকে জন্ম, ডান দিকে মৃত্যু। জীবন একেবারে জবজবে।

এর মধ্যে যে কোনও একটি বাড়ি খুব বেশিমাত্রায় পাশের বাড়ি হয়ে ওঠে।

এ বাড়ি থেকে দই-ইলিশ গেল ত, ও বাড়ি থেকে তালের বড়া এল। এ-বাড়ি থেকে সত্যনারায়ণের সিন্নি গেল, তো ও বাড়ি থেকে এল গোবরডাঙ্গার কাঁচাগোল্লা। দোতলার জানালায় এ বাড়ির উঠতি বয়েসের ছেলে বিশ্বসংসার ভুলে দাঁড়িয়ে আছে, ও বাড়ির জানালায় মেয়ে। দুজনেই মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, কেউ এসে পড়ল কিনা দেখছে। মৃদু মৃদু বাক্যালাপ চলছে। খিল্‌খিল্‌ হাসি ঝরছে। সবই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক কথা। এমন সব প্রশ্নোত্তর, যে প্রশ্নের কোনও মানে নেই, যে উত্তরেরও কোনও ধারা নেই। প্রশ্ন প্রশ্ন টেনে আনে। উত্তর উত্তর হয়ে ফিরে যায়। প্রেম এই রকমই এক মানসিক অবস্থা! একটা অসংলগ্ন, এলোমেলো সুটকেসের মত। সব আছে, সমস্যাটাই নেই। পায়রার অকারণ লাট খাওয়ার মত।

ছেলে ঃ ক'দিন তোমাকে দেখিনি কেন সুতপা?

সুতপা ঃ আপনাকেও তো দেখিনি কানুদা।

কানু ঃ বাজে কথা বোলো না।

সুতপা ঃ আপনিও বাজে কথা বলবেন না।

কানু ঃ বাজে কথা! আমি কাল সাতবার এই জানালায় এসে দাঁড়িয়েছি।

সুতপা ঃ থাক আর বলতে হবে না। আমি তিনবার এসেছি।

কানু ঃ মাইরি বলছি। এই দেখ সময় লিখে রেখেছি। ভোর ছটা, সাতটা। সাতটায় বিবিধভারতীতে সাধের লাউ হচ্ছিল।

সুতপা ঃ ও মা, কি মিথ্যুক, কি মিথ্যুক, সাতটার সময় সাধের লাউ কোনও দিন হবে না। ওটা লোকগীতি, হলে সাতটা পাঁচের পরে হবে। ধরা পড়ে গেছেন।

কানু ঃ বিশ্বাস করো। জ্বরের চার্টের মত সময় লিখে রেখেছি।

সুতপা ঃ ঘড়িটা ফেলে দিন কানুদা।

কানু ঃ তোমাদের রেডিওটা ফেলে দাও সুতপা।

সুতপা ঃ কাল সাতটার সময় হচ্ছিল পাতকী বলিয়া।

কানু ঃ আমি নিজে শুনেছি। তোমাদের ওপাশের দালানে হচ্ছিল। তোমার বোন বায়না করছিল।

সুতপা ঃ ও মা, কি মিথ্যেবাদী। টুসি ত মামারবাড়ি গেছে।

কানু ঃ (উজ্জ্বল মুখে) তোমার মা এখানে নেই ?

সুতপা ঃ থাকবে না কেন ?

কানু ঃ (চুপ্‌সে গিয়ে) তা হলে কার সঙ্গে গেল ?

সুতপা ঃ মেজমামা এসেছিল।

কানু ঃ অতটুকু মেয়ে একলা ছাড়া উচিত হয়নি। তোমার মায়েরও যাওয়া উচিত ছিল।

সুতপা ঃ ওইটুকু মেয়ে !

কানু ঃ ওইটুকু নয় ! ওর কতই বা বয়েস ?

সুতপা ঃ কত বয়েস ?

কানু ঃ চার কি পাঁচ।

সুতপা ঃ ও মা, কিস্যু জানেন না। পাঁচ ছিল পাঁচ বছর আগে।

কানু ঃ দেখলে মনে হয় না।

সুতপা ঃ তা হয় তো হয় না। ও যে ভীষণ ভোগে।

কানু ঃ তোমার মা যাবেন না !

সুতপা ঃ কোনও দিনও না।

কানু ঃ কেন ?

সুতপা ঃ ছোটমাসীর বিয়ের সময় মেজমাইমা মাকে কি সব বলেছিল !

কানু ঃ খুব অন্যায় ?

সুতপা ঃ বড়লোকের মেয়ে বলে খুব গরব।

কানু ঃ এই করেই বাঙালী গেল।

ভেতর থেকে বাঁজখাই ডাক ভেসে এল, সুতপা, সুতপা। আমি যাই, বলে সুতপা সরে পড়ল। কানু ফাঁকা ঘরে খানিকটা নেচে নিয়ে, মনে মনে গুনগুনিয়ে উঠল, আ, ইয়া, ইয়া, কবু ম্যায় কেয়া, সুকু সুকু। বড় বউদির ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

আমার বয়েসে সুতপা নেই। কানু হবার বয়েস তিনকাল আগে চলে গেছে। তখনকার কালের সুতপাদের মুখ দিয়ে কথা বেরতো না। পরিবারের এমন ট্রেনিং ছিল, ছেলে দেখলেই মনে করত, বাঘ দেখছে। আমার পাশের বাড়ির সঙ্গে রোমান্‌স অন্য ধরনের।

সাত সকালে উঠে স্টিম নিচ্ছি। চা চেপেছে শুনেছি, তিনি কখন কাপে চেপে সামনে আসবেন, তা আমার স্টিমদাত্রীই জানে। রোজ সকালে এই এক সমস্যা। সময় সময় মনে হয় চায়ের জন্ম আর মানুষের জন্ম যেন এক ব্যাপার। ইনি হতে চান না, উনি সহজে বেরতে চান না।

চায়ের অপেক্ষায় বসে বসে চ্যাটাস চ্যাটাস করে মশা মারছি। দেয়ালের গায়ে লেতকে পড়ে আছে, রাত-জাগা সেপাইয়ের মত বাজারের ব্যাগ। দুধের বোতল দুটি যেন যমজ সন্তান। বুকে ওঠার জন্যে ব্যাবা ব্যাবা করছে। সহধর্মিণী চায়ের জল চাপিয়ে স্নান ঘরে ঢুকেছিলেন। ভিজে কাপড়ে চলেছেন সেকস্ ছড়াতে ছড়াতে। যাবার সময় মুখ ঝামটা দিয়ে গেলেন, জলটা ফুটে ফুটে মরে গেল, একদিন চাটা একটু করে উপকার করতে পার না। বসে আছ, গদাই লস্কর চালে। আজ সাতদিন ধরে বলছি, বাথরুমের নর্দমার মুখটা বুজে গেছে, যা হয় একটা কিছু করো। ঝেঁটিয়ে হাতের নড়া খুলে গেল। বাবু এ কান দিয়ে ঢোকাচ্ছেন, ও কান দিয়ে বের করে দিচ্ছেন।

লোকে চা বিস্কুট খায়, ফলাহার করে। রোজ সকালে এইটাই আমার ব্রেকফাস্ট। চায়ের সঙ্গে চাঁট। ঘোটক-ঘোটকীর সংসার। কোন্ ঘটকে ভিড়িয়েছিল কে জানে!

আমাদের যখন এই সব প্রেমালাপ চলছে তখন পাশের বাড়িতে বেজে উঠল শ্যামের বাঁশি। শুধু বাঁশি নয়। একসঙ্গে তিন-চার রকমের ব্যাপার। একেবারে বিলিতি অর্কেস্ট্রা। সেজো বউ সাত বছরের ছেলেকে বিদ্যাসাগর বানাতে বসেছেন।

এই প্রক্রিয়াটা কি জিনিস আমি দেখে শিখেছি। রান্নার বইয়ের মত, এর ওপর আমিও একটা বই লিখতে পারি এইভাবে ঃ

উপকরণ ঃ একটি শিশু [ছ-সাত বছরের কচিপাঁঠা]
একটি টেবিল, দুটি চেয়ার।
চশমা চোখে, ফর্সা চেহারার রাগী রাগী একটি মা [এক সন্তানের জননী, সুস্বাদু] একটি স্কেল।
খাতা, পেনসিল, একটি 'হাসিখুশি' বা ওই জাতীয় কোনও বই।
লোডশেডিং
কলম আর পেনসিল ভর্তি লম্বা একটি বাক্স [নাড়লে যেন শব্দ হয়]
একটি আয়না।
আয়নার সামনে গালে সাবানমাখা একজন বাবা, হাতে সেফটি রেজার।
ঘরের বাইরে কলতলায় সাংঘাতিক মুখরা এক কাজের মহিলা, চারপাশে ছড়ান স্টেনলেস স্টিলের থালা, বাটি, গেলাস,

চীনামাটির কাপ-ডিস।
জানালার বাইরে একজোড়া কর্কশ-কণ্ঠ কাক।
দূরের কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসা বিধ্বস্ত রেকর্ডে সানাইয়ের সুর।

প্রকরণ ঃ ছেলে পেলসিনের বাক্‌স নাচাচ্ছে, খড়াস খড়াস শব্দে। টান মেরে কেড়ে নেবার চেষ্টা কর। কাড়াকাড়ি চলুক কিছুক্ষণ। তারপর একটা মোক্ষম রাগের টান। বাক্‌স ছেড়ে দিয়ে ছেলের, উরে বাবারে, উরে বাবারে বলে ক্রন্দন, তুমি আমার হাতে লাগিয়ে দিলে কেন ? আবার চিল চিৎকার।

গালে সাবান বুলোতে বুলোতে পিতার উক্তি, মারো এক থাপ্‌পড। বাঁদর ছেলে।

মাতা ঃ তুমি দয়া করে চুপ কর।

ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, আদো আদো গলায় বলা, তুমি অমন অসভ্যতা করলে কেন বাপি ! নাও বই খোলো, লক্ষ্মী ছেলে ! দেখি, কি পড়া আছে।

ছেলে ছ্যাড়াক করে একটা বই খুলতে গেল, খুব হতচ্ছেদ্যা করে। মলাটের খানিকটা উড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এক উড়োন চাঁটি, বেশ সজোরে।
চিল চিৎকার।

সাবানমাখা সাণ্টাক্লজ পিতা ঃ জুতো পেটা করো।
আঃ তুমি চুপ করো [উহ্যঃ এ এখন আমার পাঁঠা]
[দাঁতে দাঁত চেপে] ভদ্রভাবে বই খোলো। অসভ্যতা করলে মেরে বদনা ঘুরিয়ে দোব।

ছেলে হাতের ঝাপটা মেরে সব বই, খাতামাতা ছত্রাকার করে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তম মধ্যম গোবেড়েন।

পিতা সাবানমাখা বুরুশ হাতে মত্তমাতঙ্গের মত তেড়ে এসে, উঁ উঁ করে ছেলের গালে খানিকটা সাবান মাখিয়ে দেবেন, ছেলে গাল থেকে সেই সাবানপুঞ্জকে টেনে চোখে তুলবে। তুলে তারস্বরে চেঁচাতে থাকবে, জ্বলে গেলো, জ্বলে গেলো। হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কলতলা।

সেখানে দ্যাখা যাবে, ছাই শালপাতা, দীনুর মা, এক চিলতে জল, কাক, দীনুর প্রস্রাব সব মিলিয়ে একটা দক্ষযজ্ঞ চলেছে।

[দীনুর মাকে] একটু আস্তে ঘষো, আস্তে ঘষো, থালার আর কিছু থাকবে দীনুর মা ?

দীনুর মার কর্কশ উত্তর, লোকের পেছনে অত লাগেন বলে এ-বাড়িতে কাজের লোক টেঁকে না। সবাই বলে বউটা ভীষণ খিটখিটে।

কে বলেছে ? কে বলেছে খিটখিটে ?

সবাই বলে। কম লোক তো আর এ-বাড়িতে এলো না গেল না ? তিন মাসের বেশি তো কেউ টেঁকে না। এরপর আর লোক পাবে না, আমাদের ইউনিয়ন জেনে গেছে।

আধগালে সাবান, আধগাল কামানো গৃহস্বামীকে তেড়ে আসতে হবে। তিনি এসে বলবেন, দূর করে দাও, দূর করে দাও।

আঃ, তুমি সব ব্যাপারে নাক গলাতে আস কেন ? যাও তুমি ভেতরে যাও।

[যেতে যেতে] ছেড়ে দিও না, ছেড়ে দিও না, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দাও।

[হাত-পা নেড়ে] চলে গেলে কে বাসন মাজবে, তুমি ?

[ঘুরে দাঁড়িয়ে] শালপাতা, শালপাতা, কলাপাতার ব্যবস্থা হবে। মেঝে থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাব।

হচ্ছে আমার সঙ্গে, তুমি ওপর পড়া হয়ে জলঘোলা করতে আসছ কেন ?

আসব না ! ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। এদের আজকাল খুব মেজাজ বেড়েছে।

[দীনুর মা] বেশ, রইল তোমাদের কাজ, আমি চললুম। আমাদের কাজের অভাব হবে নি গো !

[গৃহস্বামী] তাই যাও। গ্রীষ্মের আম, শীতের কমলালেবু, পুজোর শাড়ি, শীতের র‍্যাপার, গেট আউট।

[দীনুর মা] অ্যা মা, যেমন মাগী তেমনি মিনসে গো। আয় দুনু, আবার ইনজিরিতে গালাগাল।

আঃ, তুমি ভেতরে যাও না বাপু। [দীনুর মার পায়ে পড়ে] ও দীনুর মা রাগ কোরো না। পুজোয় এবার কাঞ্জিভরম। জানই তো কর্তার মেজাজ তেমন ভাল নয়। ওই মেজাজের জন্যে সব জায়গায় মার খেয়ে মরে। [উচ্চ গ্রামে] কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, এতখানি বয়েস হল শিখলে না। যাই বলো দীনুর মা, মনটা কিন্তু ভীষণ ভাল। একেবারে শিশুর মত। এই সময় দুম্‌ করে একটা শব্দ, ও মা, আমি পড়ে গেছি। আ মোলো ! ওই পেছলে, কি করতে মরতে গেছ। হতচ্ছাড়া। নে চল, চান করবি চল।

[দোরগোড়ায় আবার কর্তা] ওই গোভাগাড়ে পড়েছে তো ! বেশ হয়েছে ? চৌবাচ্চায় একঘণ্টা চুবিয়ে রাখ। কে ফেলে দিলে দীনু বোধ হয় !

আঃ আবার তুমি ! তোমার ছেলেকে ফেলতে হয় না। সে নিজেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

এই সময় বাইরে ভিখারির আগমন। ননস্টপ চিৎকার—মাহা, মাহা।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। আ মোলো, যেন দমকলে দম দিয়ে এসেছে।

মন্তব্য ঃ এই রন্ধন প্রক্রিয়া একান্তই বঙ্গজ। ঠিকমত মশলাটশলা দিয়ে রাঁধতে পারলে অতি সুস্বাদু। রোজ সকালে খবর-কাগজের সঙ্গে প্রতিবেশীকে গরম গরম পরিবেশন করা চলে। গরম গরম খান, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে নেতিয়ে পড়বে। পদটি ছ্যাঁচড়া-জাতীয়। রাগী স্ত্রীলোকের হাতে খোলে ভাল। নাম, জীবনঘণ্ট ব্র্যাকেটে আধুনিক।

বাক্যবাণের টা সহযোগে চা পান হল। এর পর আবিষ্কারের পালা। বুকপকেটে সতের টাকা ছিল, দু টাকা হাওয়া। সংসারের যে কোনও কিলই গোঁসাইকে হজম করতে হয়। শাস্ত্রের বিধান।

[গৃহিণীকে কেশে গলা পরিষ্কার করে, বিনীত অধস্তনের কণ্ঠে]

হ্যাঁ গা, তুমি কি আমার পকেট থেকে দুটো টাকা নিয়েছ ?

[ডালে ফোড়ন] তোমার টাকা-ফাকার খবর আমি জানি না। একবার অপমানিত হবার পর, তোমার পকেটে আমি হাত দি না, বেঁচে থাকতে দোব না।

[স্বগতোক্তি ঃ আশ্চর্য ! কাল রাত দশটা দশে ছিল। সকাল ছটায় হাওয়া। যাঃ বাব্বাঃ।] বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে রানী, ঘরের মেয়ের মতই। কম বয়েস, সংসারের ঘোরপ্যাঁচ তেমন বোঝে না। সে বোকার মত বলে বসল, মামীমা কাল রাত সাড়ে দশটার সময় তুমি যে আমাকে দুটো টাকা দিয়ে বললে, যা বিশুর মাকে দিয়ে আয়, সিনেমার টিকিটের দাম।

তুই চুপ কর, ও তো আমার টাকা।

আমি শুনতে পাইনি।

শুনতে পেলেও আমার ভারি বয়ে গেল। হ্যাঁ, বেরোবার আগে আজ দশটা টাকা দিয়ে যাবে। ও মাস থেকে খুব ঘোরাচ্ছ। সেই ডাবওলা কাল এসেছিল, বলেছি আজ দোব।

দশ টাকার ডাব ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খাবার সময় মনে ছিল না ! এখন চোক একেবারে চড়কগাছ। পেট গরম, পেট গরম করে তখন ত খুব মাথা গরম করতে।

কিল খেয়ে কিল হজম করার বিধান শাস্ত্রে আছে। সংসারে এই বিধানেই শান্তির শ্বেত পারাবত ওড়ে। থলে আর বোতল নিয়ে হুড়মুড় করে বেরতে যাব। বাধা।

সুন্দরী বাধা। পাশের বাড়ির সেই ভদ্রমহিলা। ছেলেকে ঠ্যাঙানো স্থগিত রেখে তিনি এসেছেন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। আলকাতরার মত কালো চুল। বেশ লম্বা, ছিপছিপে। আমার বিপরীত। আমার মানে, আমার স্ত্রীর। কি সুন্দর ইনটেলিজেন্ট লুক। দুটো চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গিয়ে প্রবেশপথ ছেড়ে দিলুম। আমার কাছে কেন আসবেন ! যাঁর কাছে এসেছেন তাঁর কাছেই যান। আমি শুধু আড়চোখে বার কতক তাকিয়ে দেখি। একজন মধ্যবয়সী, কর্তব্যনিষ্ঠ সংসারী মানুষ এর বেশি আর কি করতে পারে ! তাকিয়ে দু-চারটে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনকে শাসন করা। মেয়েদের যেমন দোকানে গিয়ে শাড়ি পছন্দ হয় না। একটাকে ছেড়ে আর একটার ওপর হামলে পড়ে। বিবাহিত পুরুষদেরও সেই এক অবস্থা। বিয়ের পর প্রথম দু- এক বছর মন একেবারে পোষা পাখি। তারপর শুরু হল ছটফটানি, ওড়াউড়ি। উড়ব বললেই কি আর ওড়া যায়। শিকলিতে টান ধরে।

বাড়ির বাইরে সবে পা রেখেছি, পেছু ডাক এলো, শোনো শোনো একবার শুনে যাও। ফিরে এলুম। দুই গৃহিণী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পাশের বাড়ির বউটির মুখে মৃদু হাসির রেখা। মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি, আ হা হা হা হা।

বলো কি বলছ ?

তোমার কাছে চিমটে আছে ?

চিমটে ? চিমটে তো সাধুর আস্তানায় থাকে !

আরে বাবা, সে চিমটে নয়, আচ্ছা, মাথামোটা লোক ! ছোট ছোট চিমটে, সেই আগেকার দিনে বুড়োর মাথার পাকা চুল তোলা হত না ! সেই জিনিস।

কি হবে বলো তো ?

পাশের বাড়ি স্বর্গীয় কণ্ঠে বললেন, আর বলবেন না, এই দেখুন কাণ্ড।

কাণ্ড দেখার জন্যে মড়াখেকো ব্যাগ আর বোতল দুটো মেঝেতে নামিয়ে রেখে হাত দুটো মুক্ত করে নিলুম। মহিলা সবুজ রঙের সরু একটি কলম বের করলেন। সোনালি ক্যাপ। দেখেই মনে হচ্ছে বেশ দামী।

[একটু আদুরে আদুরে নাকি সুরে] দামী কলমটার কি অবস্থা করেছে বাঁদরটা !

[বেশ একটু উৎসাহের গলায়, যেন লটারির রেজাল্ট দেখব] কই দেখি, কই দেখি।

মহিলা এগিয়ে এলেন। সামনে ঝুঁকে এসে কলমের মুণ্ডুটা খুলে ফেললেন, বেরিয়ে এল মুণ্ডহীন একটা ধড়।

এই দেখুন মাথাটা ভেঙে নিবসুদ্ধু খাপে ঢুকে গেছে। সামান্য একটু জিভ বেরিয়ে আছে।

কই দেখি, কই দেখি। যেন সপ্তম আশ্চর্য দেখছি। ভাসুরকে দেখে ঘোমটাহীন ভাদ্রবউ যেমন জিভ কাটে, ক্যাপে ঢুকে পড়ে কলমও সেই রকম এতটুকু জিভ বের করে বসে আছে।

বিশেষজ্ঞের গলায় বললুম, অ, এই ব্যাপার। দাঁড়ান। একটু নারকোল তেল আন তো [সন্দেহের গলায় স্ত্রী] তেল কি হবে ?

তেল কি হয় ! তেল দেবো। তেল দিযে মারবো টান হড়কে বেরিয়ে আসবে।

আমার বউ পাশের বাড়ির বউকে বললে, কেন ভাই হাতুড়ের হাতে দিচ্ছ ! যারা পেন সারাই করে তাদের একবার দেখাও, এক মিনিটে ঠিক করে দেবে।

না দিদি, উনি মনে হয় ঠিকই বলছেন। ওইভাবেই বেরোবে।

তাহলে তুমি ভাই বাড়িতে বসে করে নাও। এর পর গেলে আর দুধ পাবে না।

ও এখনও দুধ আনা হয় নি। ছিছি, আমি দেরি করিয়ে দিলুম। ঠিক আছে আমি ততক্ষণ চেষ্টা করে দেখি। না পারলে আবার আসবো।

কি সুন্দর, হালকা পায়ে তিনি চলে গেলেন ! ঘরেতে ভ্রমর এসেছিল গুনগুনিয়ে। কথা কইবার আগে আর এক ডাঁশ ভ্রমর ঝাপটা মেরে উড়িয়ে দিলে।

[লাল চোখ, রাগ রাগ গলায় স্ত্রী, সঙ্গে ব্যঙ্গের সুর] হাঁ করে কি দেখছ ! যাও। খুব মজা তাই না, তেল দিয়ে জিভ বের করা হচ্ছিল'!

যাঁ বাব্বা !

দুধ নিয়ে দুধের বোতল দুটো সমীরের দোকানে রাখলুম। বাজারের ব্যাগ রাখলুম কুন্ডুর দোকানে। এঁকপাক ঘুরে দেখি। যদি একটি চিমটে পেয়ে যাই, জিনিসটা সহজেই বেরিয়ে আসবে। শাস্ত্র বলছেন, দেশের আর দশের জন্যে বাঁচতে শেখো। মানুষ নিজের জন্যে জন্মায় না, মানুষ জন্মায় পরের জন্যে। গোটা ষোল দোকান ঘুরলুম। ধ্যাৎ মশাই, চিমটে কোথায় পাবেন ? ওসব জিনিস আজকাল আর পাওয়া যায় না। চিমটে, পেতলের কানখুস্‌কি, কাঁচপোকার টিপ, আলুর পুতুল, নৈনিতাল আলু, সতী সাবিত্রী স্ত্রী। ফুটপাথে দেখুন, ফুটপাথে। নিউমার্কেটের কিউরিওর দোকানে কিংবা পার্ক স্ট্রিটের নিলামে।

আজকাল জ্ঞান দেবার জন্যে লোকে যেন মুখিয়ে থাকে। বেড়াল যেমন কুকুর দেখলে ফ্যাঁস করে ওঠে, মানুষও তেমনি মানুষ দেখলেই ভস্ ভস্ করে জ্ঞান দিতে থাকে।

ফেরার পথে দোলগোবিন্দের দোকানের ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলুম। একেই বলে খেল খতম করে বাড়ি ফেরা। কাঁটা একেবারে ঝুলে পড়েছে। বেশ বুঝতে পারছি, ঢোকামাত্রই উত্তমমধ্যম শুরু হয়ে যাবে। বাজল প্রায় সাড়ে আট, নটা

বাজতে পাঁচেই শুরু হয়ে যাবে আমার নৃত্য, খেতে দাও, খেতে দাও। দেরি হয়ে গেল, দেরি। তখন পাতে দমাদ্দম যা এসে পড়বে সবই যেন ব্লাস্ট ফারনেস থেকে বেরিয়ে এল। আগুন গরম। কোকেন খাওয়া জিভ না হলে সহ্য করা শক্ত।

যাক, একেই বলে, রাখে কেষ্ট মারে কে ? সেই মহিলা সশরীরের হাজির। আমাকে ঢুকতে দেখেই, যেন একটু অভিযোগের গলায় বললেন, এত দেরি হল, দিদি ছটফট করছেন।

মনে মনে বললুম, হায় সুন্দরী, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর !

মধুরভাষিণী বললেন, ওনার বাজার করাই ওই রকম। একবার বেরলেন তো ফেরার আর নাম নেই। কি যে করেন। মনে হয় কাক দেখেন।

অ্যাঁ, সে আবার কি ?

প্রকৃতি প্রেমী যে। নেচার নেচার করে নৃত্য করেন। ইলেকট্রিকের তারে কাক ঝুলছে, উনি হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আহা, কি সুন্দর ময়না দোল খাচ্ছে।

ময়না ?

কিছুই তো চেনেন না ! দোয়েল দেখে বললেন, রবিন রেড ব্রেস্ট। কি গাছ, কি গাছ করে সেবার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে পাঁচশো ফুট খাদের তলায় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। চুলেব মুঠি ধরে...

[আমি বাক্য সম্পূর্ণ করলুম] বৈধব্য বাঁচালে।

গৃহিণী জ্বলন্ত অঙ্গারের দৃষ্টি হানলেন, যার পুরোটাই প্রেমের নীলচে আগুন। ভাষা-অভিজ্ঞেরাই বোঝেন—মরণ আর কি ! বিধবা শব্দটা মেয়েরা পছন্দ করে না। চোখের সামনে ভবিষ্যৎ ভেসে ওঠে। কর্তা নেই। পাজামা, চটি, চশমা, চুরুট পড়ে আছে। শেষ ব্যবহার করা জিনিস। সেভিং সেটে ধুলো জমেছে। পেন, রুমাল, ছাতা। সকালবেলা বাথরুম থেকে সেই হেঁড়ে গলা ভেসে আসছে না। কর্তার সঙ্গে সঙ্গে সেই তামাক তামাক গন্ধও হাওয়া। মনের অবস্থা কেমন হয় আমি জানি [কল্পনাপ্রবণ, রোমাণ্টিক মানুষ তো !] সার্কাসের যে মেয়েটি তারের খেলা দেখাচ্ছে, সে যদি হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, জীবন-রক্ষাকারী দড়ির জালটি নেই, তাহলে যেমন লাগে, বৈধব্যের কথায় বউদের মনের অবস্থাও সেই রকমই হয়।

পাশের বাড়ির রোমাণ্টিক চেহারার সেই মহিলা বললেন, নেচার, আমিও খুব ভালবাসি দিদি। মাঝে মাঝে, ও ঠাট্টা করে বলে, বিভূতিভূষণ স্ত্রীং।

[আবার 'ও' আসছে কেন ? 'ও' এখন 'ফো', তোমার ফ্রেন্ড হতে পারে। ও ফো রাখ। আমি তো রয়েছি। লাভার অফ নেচার। ইংরিজীতে কি সাধে, বলে, বার্ডস অফ দি সেম ফেদার ফ্লক টোগেদার। আমরা দু-জন এক পালকের পাখি হয়ে পাশাপাশি চালিয়ে যাই বেশ কিছুদিন কেমন ? আমারটা রান্নাঘরেই

থাক। ডেঙ্গো, পুঁই, লাউ-চিংড়ি, হরিণঘাটা নিয়ে মশগুল হয়ে। তুমি মানিক রোজ পেনের খাপে মুণ্ডু ঢুকিয়ে আমার কাছে ছুটে ছুটে এস। আমি আজই যেখান থেকে পারি সন্না কিনে আনছি। কোথাও না পাই, বিকেল বেলা কার্জনপার্কে গিয়ে বসে থাকব। তেল মালিশ আসবে, কান সাফাই অলা আসবে। কানের লোকটাকে ধরব। ওর কাছে সন্না থাকবেই। যা দাম লাগে লাগুক, ওটাকে বাগাতেই হবে। তখন তুমি রোজ একটা করে ঢোকাও, আর আমি টেনে বের করি, একস্‌পার্ট মিডওয়াইফের মত। আর ওই উনি, ওঁর মতিগতি, হে ঈশ্বর অন্য রকম করে দাও। মাঝে মাঝে চা দিয়ে যাক, পাঁপর ভাজা দিয়ে যাক, ডালমুট, কাজু। পৃথিবীর নিয়মটা যদি এই রকম হত, বছর চারেক পরেই স্ত্রীদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা মাতৃভাব জেগে উঠবে। স্বামীতে পুত্রদর্শন হবে। স্বামী গোপালচন্দ্রকে মনে হতে থাকবে বালগোপাল। নাড়ুগোপাল মনে হলেও ক্ষতি নেই। কি সুন্দর! আমরা তখন দু-হাত তুলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলব, মা, প্রেম করে ফেলেছি। শিশু যেমন বলে অ্যা কোয়ে ফেয়েচি।]

রানী আবার কি সংবাদ নিয়ে এলো। তার তো এখন ঝোলা থেকে মাল বের করে ধোবার আর কোটবার কথা!

মেসো, তুমি দুধের বোতল কোথায় রেখে এলো গো! আন নাই!

মরেছে, দুধের বোতল পড়ে আছে সমীরের দোকানে। বেমালুম ভুলে বসে আছি। বুড়ো বয়েসে ঘোড়া রোগে ধরলে মানুষের এই হয়।

বাড়ির কাজের লোককে মহিলারা যে ভাবে শাসন করে, গৃহিণী সেই রকম গলায় বললে, দুধের বোতল কোথায়! ভেঙে আপদ চুকিয়ে দিয়ে এসেছ! আজকাল, নেশাভাঙ করছ না কি!

বাক্যিব ছিরি দেখ! প্রাইভেটলি যা হয় হোক। একজন বাইরের মহিলার সামনে আমার কেস খারাপ করে দেবার জন্যে, ইচ্ছে করে শাসন করা। বোঝাতে চাইছে, দ্যাখো এর কোনও পার্সোন্যালিটি নেই। এরা কেউ ডেমোসথেনিস পড়েনি দেখছি। কোনও জ্ঞানগম্যি নেই। লেখা পড়া শিখে তবে সংসার করতে আসা উচিত। তিনি আমার মনের কথা বলে গেছেন। সব মানুষেরই একটু এদিক সেদিক আনন্দ খুঁজে নেবার অধিকার অবশ্যই আছে, থাকবেও। বাইরে একজন থাকবেন, ফর ডেলি ইউস [আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিক এই শব্দই তিনি ইউস করেছেন, ডেলি ইউস, শুনলে সব চোখ কপালে তুলে শিবনেত্র হয়ে বসে থাকবেন] আর বাড়িতে থাকবে একজন সুশীলা স্ত্রী। তিনি হবেন বিশ্বাসী, সেবাপরায়ণা, সন্তানসন্ততির মা। সংসারটিকে একেবারে সাজিয়ে রেখে দেবেন। ডেমোসথেনিসের কথা শুনবো না, মেগাসথেনিসের কথা শুনবো না, তা হলে কার কথা শুনবো। আমি মহাপুরুষদের অবাধ্য হতে পারব না। কোনকালেই অবাধ্য ছেলে বলে আমার দুর্নাম ছিল না। তুমি তা হলে বউ হলে কেন, পাশের বাড়ির বউ হতে পারতে! তাহলে আমিও তোমার ক্যাপ থেকে পেনের মুখ খুলে আনার

জন্যে সময় নষ্ট করতুম। আনন্দ সহকারে করতুম। হিংসে মোটেই ভাল জিনিস নয়। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা বাঙালীকে একেবারে শেষ করে দিলে।

শেষ ঝাঁঝ মুক্তি পেল, মনটা কোথায় পড়ে থাকে শুনি।

গটগট করে ভেতরে চলে গেলেন। হেঁকে বললুম, ভাঙিনি, সমীরের দোকানে রেখে এসেছি। [তা হলে ওইখানেই থাক। নেপোতেই দুধ মারুক। এতকাল দই মেরে এসেছে।]

ভীষণ অপমানিত হয়েছি। মহিলা হলে বলতুম, ধরণী দ্বিধা হও। অবশ্য আমি মহিলা না পুরুষ আজও ভাল ভাবে বুঝে উঠলুম না। নিজেকে জানা অত সহজ নয়। মনের অবস্থা অতি শোচনীয়। মনে হচ্ছে, হেডমাস্টার মশাই ক্লাসের বাইরে কান ধরিয়ে নিলডাউন করিয়ে দিয়ে গেছেন। ভাল করে মুখ তুলে মহিলার দিকে তাকাতে পারছি না।

দিদি খুব রেগে গেছেন। কি বলে দুধের বোতল দুটো ফেলে চলে এলেন। সাত সকালে জ্বাল দিলেও আজকাল দুধ রাখা যাচ্ছে না, এতখানি বেলা হয়ে গেল! দুধ না কেটে যায়।

বলতে ইচ্ছে করছিল, বেশ করেছি, আমার দুধ আমি বুঝবো কাটে আমার কাটবে। এরা দেখি সব এক গোঁফের বিড়াল। ইনি ফ্যাঁস করেন ত উনি ফোঁস। রাগ চেপে বললুম, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়ে থাকে, [ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলুম তিনি এখন কোথায় তারপর গলা খাটো করে] তাছাড়া, আপনার ওইটা বের করার জন্যে সারা বাজার চষে ফেললুম, সন্না কোথাও পেলুম না।

সত্যি! আপনি কি ভালো। [মুক্তোর মত দাঁতে হাসি, মানুষকে একেবারে ম্যাড করে দেয়]

আস্তে আস্তে, চেঁচাচ্ছেন কেন? শুনতে পেয়ে যাবে।

ওমা তাই তো! আচ্ছা শুনুন, কলমটা আপনার কাছে রেখে গেলুম। যেখান থেকে পারেন, যেমন করে পারেন, আজকের মধ্যেই সারিয়ে আনতে হবে। ওর দামী কলম। জানার আগেই ঠিক জায়গায় রেখে দিতে হবে, তা না হলে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলবে।

ঠিক আছে দিন। যেমন করে পারি আজই আমি করে আনব।

উঃ আপনি কি ভালো, কি ভালো।

মহিলা ফড়ফড়িয়ে নাচতে নাচতে চলে গেলেন। মনে যেন চাবুক মেরে গেলেন। আমার যেমন দুর্ভাগ্য আবার চললুম বাজারে, দুধের বোতল আনতে। অন্যদিন একবারের বেশি দুবার বাজার যেতে হলে মেজাজ চড়ে যায় সপ্তমে, আজ আর তা হল না। মনে যেন বক্রেশ্বরের হট-ওয়াটার স্প্রিং টগবগ টগবগ, করে ফুটছে। রাস্তা হাঁটছি টাট্টু ঘোড়ার মত।

অফিস পৌঁছলুম দু ঘণ্টা লেট। নিত্য যাঁরা ফোড়ন কাটেন তাঁরা বললেন, কি হে আজকের অফিসে এলে, না কালকের। বার ভুল হয় নি ত!

ধ্যার, ব্যাটা তোরা কি বুঝবি ! ছা পোষা, ম্যাদামারার দল। আমার আজ ভুট্টার মত সব কটা দাঁত বের করে হাসতে ইচ্ছে করছে।

আজকাল আবার মানুষ সারাবার মত পেন সারাবারও হাসপাতাল হয়েছে। মেরামতীতে নানা সাজসরঞ্জাম, কলকব্জার প্রয়োজন হয়। পেনের কিছু হওয়া মানেই একেবারে সার্জিকাল কেস। চোখে ঠুলি সেঁটে কলমটা দেখতে দেখতে পেন-সার্জেন বললেন, কেস সিরিয়াস। এর ঘাড় মটকে দিয়েছে।

সে আবার কি মশাই, ভূতে ধরেছিল না কি !

সেই রকমই। [চোখ থেকে ঠুলি খুললেন] পেনটা খুব ভাল ছিল। জাপানী পাইলট। গোল্‌ড নিব। যান, বাড়ি নিয়ে যান। আচারের বয়ামের মধ্যে রেখে দিন।

সে কি মশাই !

দেখছেন না, ভেতর থেকে ভড় ভড় করে তেল বেরচ্ছে।

যা হয় একটা করে দিন দাদা।

দিতে যে পারি না, তা নয়, তবে অনেক খরচ পড়ে যাবে।

কত ?

গোটাপনের পড়ে যাবে।

অ্যাঁ, সে কি ?

ওপরের পুরো সেকসানটা পালটাতে হবে। তাও আপনার রঙে রঙ মেলান যাবে না। ব্ল্যাক হবে। তা হোক, মানাবে ভাল। গ্রের সঙ্গে ব্ল্যাক।

একটু কমালে হয় না ? পনের বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে।

তা হলে পারলুম না। নিয়ে যান। একটা পুরো সেকসান পাল্টাতে হবে, প্রায় নতুন জীবন দান। স্পেয়ারস কি অত সহজে পাওয়া যায় মশাই ! এ কি মানুষ, যে যত বার বউ মরবে তত বার বিয়ে করা যাবে !

ঠিক আছে পনেরই দোব।

[আমার কলম হলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতুম। পনের টাকায় নতুন কলম হয়ে যাবে। এ যে বড় দুর্বলতার কলম ! সারাই খরচ আমি মহিলার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারব না। নিজের পকেট থেকে যাবে]

ওস্তাদ চোখে ঠুলি লাগিয়ে কাজ শুরু করলেন। সন্না দিয়ে ক্যাপ থেকে ভগ্নাংশের ফরসেপ ডেলিভারি হল ! জিভ আর নিব একই রইল, ধড়ও যা ছিল তাই রইল, গলা থেকে মুণ্ডুর অংশ পুরোটাই পালটে গেল। পনের টাকা ধরে দিয়ে, বুকে পেন [একটা নয়, দুটো—পি ই এন পেন, আর পি এ আই এন পেন, টাকা খরচের যন্ত্রণা] নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়িমুখো হলুম।

কত পরিকল্পনা ! প্রথমেই নিজের বাড়িতে ঢুকবো না। পেনটা যথাস্থানে হাসি হাসি মুখে বীরের ভঙ্গীতে গচ্ছিত করে দেবো। চেয়ারে বসে এমন একটা ভাব করব যেন কত ক্লান্ত ! তারপর এই ধরনের বাক্যালাপ হবে ঃ

সারা কলকাতা ঘুরে ঘুরে, পায়ের টেংরি খুলে গেল। কোথাও আর হয় না, শেষে একটি মাত্র বড় দোকানে পেয়ে গেলুম।

অনেক খরচ পড়ল ?

খরচ কোনও ব্যাপারই নয়। জিনিসটা যে হয়েছে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।

না না, সে কি ! যা পড়েছে আপনি বলুন। আপনি দিতে যাবেন কেন ?

আপনি আমাকে পর ভাবছেন ?

ছি ছি, পর ভাবলে অত জোর করে বলতে পারতুম ? [কাম টু দি পয়েন্ট]

দেখুন ঠিক হল কি না ? রঙে রঙ মেলাতে পারলুম না, এইটাই দুঃখ। তবে কনট্রাস্টে রূপ খুলেছে।

সুন্দর হয়েছে। বসুন চা করে আনি।

তার আগে এক গেলাস জল।

[একা ঘরে বসে গুন গুন গান, ছলিয়া মেরা নাম, ছলিয়া মেরা কাম]

বাড়িটা অসম্ভব শান্ত মনে হচ্ছে। আমাদের পাশের বাড়ির এ সময় এতো শান্ত থাকার তো কথা নয়। সকাল আর সন্ধেই তো রমরমার সময়। দুচার জন পাড়া প্রতিবেশী বাড়ির সামনে জটলা করছে। সব ঘরে আলোও জ্বলছে না। কি জানি বাবা, ইনকামট্যাকস রেড হয়ে গেছে নাকি ! সে তো শুনি বড়লোকদের বাড়িতে হয়।

সদরে ঢুকেই দেখি সেই শিশুটি, রোজ সকালে যাকে মানুষ করার জন্যে ধোলাই আর পেটাই হয়। আমাকে দেখেই বললে, জেঠু, বাবা মারা গেছে।

[জন্ম মৃত্যু বোঝার বয়েস তো হয়নি, তাই অমন সহজে বলতে পারলে]

এবাড়ির সেজো ভাই হন্তদন্ত হয়ে বেরচ্ছিল। [আমাকে দেখেও দেখল না। চরিত্রহীন ভেবেছে না কি !] জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে ভাই ?

সেজদা স্কুটার অ্যাকসিডেন্ট করেছে, হাসপাতালে।

আর তার দাঁড়াবার সময় নেই, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। একপাশে সরে দাঁড়ালুম। কেউই আমাকে আর তেমন লক্ষ্য করছে না। [বিপদের দিনে মানুষ ওরকম করতেই পারে। জনাকয়েক মহিলা আর পুরুষ বেরিয়ে এলেন। মহিলারা অশ্রুমোচন করছেন নীরবে। সকলের মাঝখানে সেজ বউও রয়েছেন। তিনি প্রায় ভেঙে পড়েছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। চিনলেন বলে মনে হল না। এই সময় এই নিন আপনার পেন বলা যায় না। সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে। মানুষ বড় না, মানুষের পেন বড় ! আমি স্কুটার অ্যাকসিডেন্ট করলে, আমার স্ত্রীও কি এই রকম শোকার্ত হবেন ! সন্দেহ হয়। একবার করে দেখব ? আমি সাইকেলই জানি না তো স্কুটার। একদিন বাস থেকে পড়ে গিয়ে দেখব ! নিজে নিজে পড়া যাবে না। অপেক্ষা করে থাকি যদি কোনও দিন ফেলে দেয় তখন তোমার অগ্নিপরীক্ষা হবে সুন্দরী। বাসের যা অবস্থা,

একদিন আমি পড়বই। আমি কেন সকলকেই পড়তে হবে, যেমন জন্মিলে মরিতে হবে।]

বাড়ি চলে এলুম। প্রতিবেশী হিসেবে আমার আর বিশেষ কি করার আছে! এ বাড়ির কারুর সঙ্গে দেখা হলেই, নিষ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করব, কি কেমন আছে?

একটু ভালো। না, তেমন সুবিধের নয়।

হ্যা, ঈশ্বর করুন যেন ভালো হয়ে ওঠে। কলকাতার রাস্তায় স্কুটার চলে না। নাঃ চলে না। আর যেন চাপতে দিও না। আপদ বিদেয় কারো, বিদেয় করো।

শুনলে তো!

শোনাতে হবে।

[নাঃ, আর দাঁড়ান ঠিক নয়। জিজ্ঞেস করেছি, কর্তব্য শেষ। আরও গভীরে গেলে যদি টাকা পয়সা চেয়ে বসে!]

বাড়ি ঢোকামাত্রই গৃহিণীর সম্বর্ধনা বেশ ভালই হল।

কোথা থেকে আড্ডা মেরে ফিরলে?

কেন অফিস থেকে!

তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না বুঝলে। হয় ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরতে হবে, না হয় বেঁধে রাখতে হবে খাটের পায়ায়। বাঁজা লোকেরা বড় দায়দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়।

যাব্বাবা! [যা বলল, সে তো মেয়েদেরই কলঙ্ক! উস মে হামারা কেয়া হায় ডার্লিং!]

যাব্বাবা নয়, জামা কাপড় আর ছাড়তে হবে না, চলো, ওই অবস্থাতেই।

কোথায় যাবো, সিনেমায়!

আজ্ঞে না, হাসপাতালে।

একটু চা খেয়ে যাব না!

সারা দিন ক'কাপ হয়েছে অফিসে। একদিন, একবেলা চা না খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

হাসপাতালের এমার্জেনসিতে অরুণকুমার চিৎ হয়ে পড়ে আছে। শোনা যাচ্ছে প্রায় অচৈতন্য। এখুনি একটা এমার্জেনসি অপারেশানের প্রয়োজন। ব্যস দ্যাখা হল, কি হয়েছে জানা গেল, কি হতে চলেছে তাও জানা গেছে।

এবার তা হলে বাড়ি চলো।

দাঁড়াও না। এ মানুষটা সবেতেই ব্যতিব্যস্ত! নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। দেখতে পাচ্ছ না পাড়ার ছেলেরা কি রকম করছে।

আরে ধ্যুর। ওরা হল মাস্তান টাইপের ছেলে। ওরা তো করবেই।

আর তুমি কি করবে চাঁদু। ফুলে ফুলে মধু খাবে, তাই না? দাঁড়াও এখানে। যাবার সময় হলে আমি বলব!

[আজকাল মেয়েরা কি ভাষা শিখেছে রে ভাই ! ফুল আর নেই সব হুল। কোথায় বাড়িতে গিয়ে বিছানায় একটু আরাম করে লটকে পড়ব। কাগজ পড়তে পড়তে ভালো মন্দ কিছু চিববো, তা না পাশের বাড়ির এই যুবকটি একটি স্কুটার কিনে এই নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয় মানুষটিকে বাঁশ দিয়ে কাৎ হয়ে পড়লেন। এখানে দর্শকের মত দাঁড়িয়ে কি লাভ হবে ! এই তো এরা সবাই রয়েছে। এরাই তো ম্যানেজ করে দেবে। আসলে তা নয়, মেয়েরা একবার বাইরে বেরলে সহজে আর ঢুকতে চায় না। অনেকটা টুথপেস্টের মত, বেরতে জানে ঢুকতে জানে না। পাড়ার ছেলেরা করবে না কেন ! স্যামসন না কে যেন ডেলাইলার জন্যে মাথা মুড়িয়েছিল। নামটা মনে পড়ছে না, হারকিউলিসও হতে পারে। আমিও তো করেছি। এই তো পেন সারিয়ে এনেছি !]

হঠাৎ একটা রব উঠল, রক্ত চাই, রক্ত চাই। রক্ত দিতে হবে।

দু চার জন বীর হাতা গুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। [কত বড় দাতা সব ! এক ফোঁটা রক্ত হতে চায় না, সেই রক্ত দিতে ছুটল] আবার শোনা গেল গ্রুপ মিলছে না, গ্রুপ মিলছে না।

আমার স্ত্রীরত্নটি যেখানে থাকবে সেইখানেই একটি গোলমাল পাকিয়ে বসে থাকবে ! এমন বিশ্বাসঘাতিকা ইতিহাসে নেই ! হঠাৎ ওপরপড়া হয়ে বলে উঠল, এরটা দেখুন তো, এরটা দেখুন তো !

ব্যস্ কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালে যা হয়, তাই হল। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল, যমদূতের মত একজন বললেন, শুয়ে পড়ুন। মনের অবস্থা কি হয় ? আমার যেন সতীদাহ হচ্ছে।

মিউ মিউ করে বললুম, আজ্ঞে আমার অ্যানিমিয়া আছে মনে হয়।

ধ্যুৎ মশাই, এই যার লাশ, তার অ্যানিমিয়া। [ডাক্তারদের কথার যেমন ছিরি]

আজ্ঞে ব্লাড ক্যানসারও থাকতে পারে।

কেন ঘাবড়াচ্ছেন মশাই !

এমন বরাত। টেস্টে গ্রুপও মিলে গেল।

মিলেছে মিলছে বলে কি উল্লাস। নিয়ে নাও বোতলখানেক।

একেবারে এক বোতল নেবেন স্যার। [গুঁতোর চোটে লোকে রাম নাম বলে, আমি বদখদ একটা লোককে স্যার বলছি]

আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই। মানুষের শরীরে বালতি বালতি রক্ত, তার থেকে এক বোতল নিলে কি হবে। তা ছাড়া আপনি তো হাই-প্রেসারের রুগী। উপকারই হবে।

কে বলেছে হাইপ্রেসার ?

আপনার স্ত্রী।

গুলিয়ে ফেলেছে মশাই। হাই-প্রেসার নয়, হাই মেজাজ।

ওই হল। নে শ্যামু, নে টানতে থাক।

এক বোতল তো এক বোতল ! ভদ্রলোকের এক কথা। টলতে টলতে রক্ত-শূন্য বীর ফিরে এল।

রক্ত-শোষক বললেন, বাড়ি গিয়ে এক গেলাস গরম গরম দুধ খাইয়ে দেবেন।

স্ত্রী বললেন, আমার দুধ কেটে গেছে।

পথে অনেক দোকান পড়বে খাইয়ে দেবেন। [কাকে কি বলছেন ? স্ত্রী আমাকে দুধ খাওয়াবে ! ওয়ান পাইস ফাদার মাদার]

ভীষণ রেগে গেছি।

রাগ করে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে মনের সঙ্গে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করছি। পাশের বাড়ির সঙ্গে দেয়ানেয়ার একটা খতিয়ান মেলে ধরেছি। চামচে, কাপডিশ, চিনি, চা, দুধ, বই, টেবিলল্যাম্প, ছাতা। গেছে, এসেছে, আসে নি। শেষ গেল রক্ত। পাল্লার ভার এদিকেই বেশি। তা ছাড়া, এখন মনে হচ্ছে, কত বড় একটা তৃপ্তি ! যাকে ভাল লাগে, তার সঙ্গে দেহের মিলন না হোক, রক্তের মিলন হবে। সেই যে আজকাল বিজ্ঞাপন দেখি, আপনি কি আপনার স্ত্রীর আরও গভীরে যেতে চান ?

গায়ের ওপর একটা হাত এসে পড়ল।

শত্রুর হাত। চুড়ির শব্দ।

শোনো !

বলে ফ্যালো।

রাগ করেছ ?

করলেই বা কি হবে ?

বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। হঠাৎ আজ এত প্রেম ?

শোনো, তোমার আর অরুণ ঠাকুরপোর তো এক গ্রুপের ব্লাড।

হ্যাঁ। এক বোতল তো দিয়ে এলুম।

তাহলে ? [মহিলার গলা কেমন যেন ধরে এসেছে। দিনের সেই প্রখরতা আর নেই। কি একটা আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা] তা হলে আমাদের কেন হল না ?

একটি বন্ধ্যা নারীর চাপা কান্নায় আমাদের সুখ-শয্যা কণ্টক-শয্যা হয়ে গেল। জন্মান্তরে না গেলে এ সমস্যার সমাধান নেই। মন ফিরে গেল সুদূরে। সেই ফুলশয্যার রাত। সেদিনের সানাইয়ের সুর কি আজ কান্নার সুর হয়ে ফিরে এল ?

তনয়

লাফাতে লাফাতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকলাম। আমার বদরাগী স্ত্রী, যার নাম মিনতি, মেজাজ ভাল দেখলে যাকে আমি আদর করে মিনু বলে মিন মিন করে ডাকি, সামনের প্যাসেজ হাতে ঘড়ি বেঁধে, নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ পরে পায়চারি করছিল। ভুরুর কাছে কপালের ওপর সেই মেজাজ খারাপের ভাঁজ, চোখে ওয়াইন কলারের চশমা। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে ফাগের মত লাল অন্ধকার উড়ছে। পশ্চিম আকাশে বিশাল একটা তারা সন্ধ্যার প্রদীপের মত ভাসছে।

'হে হে এসে গেছি ম্যাডাম।' বউকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি মাঝে মধ্যেই বোকার মত হে হে করি। আমার হ্রেষাধ্বনি।

'ফিফটিন মিনিট্‌স লেট। বলেছিলুম সাড়ে ছটায় ঢুকবে। এখন পৌনে সাত।'

'খুউব চেষ্টা করলুম, হে হেঁ খুউব চেষ্টা, অফিস থেকে বেরোলুম, তীর বেগে দৌড়লুম, জাম্প করে সামনে যা পেলুম তাইতেই গোঁত্তাগুঁত্তি করে ঢুকে ঝুলতে ঝুলতে, উঃ কাঁধ থেকে হাতটা যেন ছিঁড়ে যাচ্চে।'

'ছেলে মানুষ করতে হলে একটু কষ্ট করতেই হবে, আমাদের দশমাস, তোমাদের সারা জীবন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। সেই গানে আছে না, মা হওয়া কি মুখের কথা। চল, ভেতরে চল।'

'দেরি আছে, আর একজন কখন ঢোকে দেখি। দেখতে হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে।'

'অপূর্ব ফেরেনি এখনও খেলার মাঠ থেকে?'

'অত সহজে?'

অপূর্ব আমার ছেলের নাম। কিশোর দ্রুতগতিতে যৌবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। গলায় বয়সা লেগেছে। বাপের চেহারা পেয়েছে, মায়ের মেজাজ। পড়লে ভাল ফল দেখাতে পারত, মাথায় খেলা ঢুকে বারোটা প্রায় বাজতে বসেছে। সামান্য অবাধ্যতা এসেছে। কথায় বার্তায় বেপরোয়া ভাব। জেদী। নিজের ব্যাপারে করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। যেমন আজ। নির্ঘাৎ মায়ের হাতে চড় চাপড় খাবে। অন্য দিন হলে এই সময় আমি ধর্মতলায় ফুরফুর করে উড়ে বেড়াতুম। কে সি দাশে চায়ের আড্ডা। কিংবা বন্ধুবান্ধব সহ ইভনিং শোয়ে ইংরেজী সিনেমা।

নটা সাড়ে নটার আগে বাড়ি ফেরা আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। সেই কোষ্ঠীর ফলাফল এখন বংশদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। ছেলে বিগড়োয় বাপের জন্য। মিনতির স্পষ্ট অভিযোগ—লাইক ফাদার লাইক সান। যেমন দেখবে তেমনি শিখবে। পরের হাতে ছেলে মানুষ হয় না। নিজেকে দেখতে হয়। আমার কি ? লোকে বলবে, অমুকের ছেলেটা বিশ্ববখাটে হয়ে গেল। মার বদনাম নয়, বাপের বদনাম। এখন থেকে সজাগ হলে তোমারই মঙ্গল। নয় তো কাঠ খেলে আঙরা বেরোবে।

ঠিক কথা। ক্যাঁটকেঁটে শোনালেও সারগর্ভ। না, কাঠ খেতে চাই না, বদহজম হবে। আজ থেকে আমার ত্যাগের জীবন, আড্ডা ত্যাগ, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ, অফিস ছুটির পর বাস ট্রাম খালি হবার আশায় আর সময় কাটানো নয়, লাঠালাঠি করে বাড়ি ফিরেই ছেলেকে পড়তে বসানো। বাপের শাসন, মায়ের ভালবাসা আর তদারকি। ভবিষ্যতের ইমারত তৈরি করতে হবে ত্যাগের মশলা দিয়ে। প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে দু' ফেরতা সেই কলিটা আওড়ে নিলুম—সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে। ট্যাং ট্যাং করে সাতটা বাজল। ঘড়িটার কি রকম রসকষহীন কেঠো আওয়াজ। সংসার একটা তিরিক্ষি জায়গা। সব সময় যেন কুচকাওয়াজ চলেছে। দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মিত হাসছেন। স্বামী বিবেকানন্দ গাইছেন—পড়িয়ে ভব সংসারে ডুবে মা তনুর তরী—

গেট খোলার শব্দ হল। বাপকা বেটা এলেন। আমার মিনুর গলা শোনা গেল, 'কটা বাজল ? বলি কটা বাজল ?'

'আমার হাতে ঘড়ি নেই।'

'ঘড়ি না থাক চোখ আছে। তোমাকে বলে দিয়েছি যেই দেখবে হাতের রোমকূপ দেখা যাচ্ছে না তখনই বাড়ি ঢুকবে। এই আমি শেষ বলে দিচ্ছি, একচুল এদিক ওদিক হলে কাল থেকে আর বাড়ি ঢুকতে দেব না।'

'যাও যাও—বাড়ি ঢুকতে দোব না, তোমার বাড়ি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড় মারার শব্দ। আমার ছেলের তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, 'গায়ে হাত তুলবে না মা বলে দিচ্ছি, ওয়ার্নিং, এরপর মা বলে আর মানব না।' আবার একটা চড়ের শব্দ। নাটক বেশ জমে উঠেছে। প্রথম দৃশ্যেই জমিয়ে দিয়েছে। আমার কি ভূমিকা জানি না। তবে নিয়তির ভূমিকা হলে, 'ওরে তুই মারিসনি আর চড়' বলে তারায় সুর ধরে স্টেজে লাফিয়ে পড়াই উচিত। যদিও নিয়তির পোশাক নেই। তোয়ালে পরে বাথরুমে ঢোকার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। কমলি যখন ছাড়বে না তখন উলঙ্গ হয়ে থাকলেও ছুটতে হবে। আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেডও চুপ করে থাকতে পারে না। ঢ্যাং ঢ্যাং ঘণ্টা, হোসপাইপের হুস হুস জল। তবে সব আগুন আবার জলে নেভে না, বেড়ে যায়। ফোম ছিটোতে হয়, কম্বল চাপাতে হয়।

'কি হচ্ছে কি অপূর্ব, ছি ছি, এই কি ভদ্র সভ্য ছেলের উপযুক্ত কথা। অ্যাঁ, এই কি তোমার সভ্যতা ?'

অপূর্ব অপ্রস্তুত। ভাবতেই পারেনি নটার বাবা সাতটায় হাজির। ভূত দেখছে না ত? থ হয়ে গেছে।

'ভেরি ব্যাড, অফুলি ব্যাড।'

আমার মিনু ফোড়ন কাটল, 'চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরিজি বললেই হবে না, শক্ত মুঠোয় ওই লম্বা চুলের ঝুঁটি ধরতে হবে। তোমার মত মিনমিনে বাবাকে দিয়ে হবে না। ডাকা হাঁকা বাপ চাই।'

হাঁকতে ডাকতে আমি তেমন পারি না। আমার হল গিয়ে প্লেজেণ্ট পার্সোন্যালিটি। ভেতরটা আমার কুসুমের মত কোমল। এই কথা কটাই কত কষ্ট করে বলতে হযেছে। ছেলেটার মুখ দেখেই মায়া হচ্ছে। আমার মুখেরই আদল। আমারই রক্ত শরীরে বইছে। মুখটা ঘামে ধুলোয় ক্লান্ত। দুটো রাম চড় ইতিমধ্যেই হজম করেছে। মান অপমান বোঝার বয়স হয়েছে। শাসন ত না মেরেও করা যায়। কে বোঝাবে মিনতিকে। ফিজিসিয়ান হিল দাইসেল্ফ। 'তুমি ভেতরে যাও আমি দেখছি।' এখন দুজনকেই তোয়াজ করতে হবে। এর মধ্যেই সামনের রাস্তা দিযে যেতে আসতে দু-একজন উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। বিনি পয়সার নাটক কে ছাড়ে! মিনতির স্বভাব হল, হারব বললেই হারেগা খামচে খুমচে মারেগা। যেতে যেতে বললে, 'তুমি যা দেখবে জানাই আছে, গত চোদ্দ বছর ধরে দেখেই ত আসছ।'

'তা হলে তুমিই দেখ।'

'আমি তো ক্লাস সেভেন অবধি দেখেছি। এরপর আমার বিদ্যেতে তো আর কুলোচ্ছে না।'

'তবে ফোডন ঝাড়ছ কেন শুধু শুধু। চুপ করে বসে বসে দেখ।'

'চুপ করে বসে বসে দেখ। দেখে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।'

'মুখ ভেঙাবে না।'

'মুখ ভেঙাবে না। যেমন বাপ তেমনি ছেলে। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।'

'যেমন মা তেমনি ছেলে।'

'খবরদার।'

'খবরদার।'

হয়ত হাতাহাতিই হয়ে যেত। অপূর্ব ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'আঃ কি হচ্ছে মা। চুপ কর না। বাবা এইমাত্র অফিস থেকে খেটে খুটে এল।'

'আমিও চুপ করে বসে নেই। সারাদিন সংসারের ধকল সামলাচ্ছি।'

'আহা কি আমার ধকল রে! এইটুকু ত সংসার। কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই।'

অপূর্ব আমার হাতটা ধরে বলল, 'আঃ বাবা চুপ কর না, এবার চুপ কর, যাও তুমি বাথরুমে যাও।'

মিনতিকে মুখ ভেঙচে বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। ভাগ্যিস দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে আর এক পক্কড় লেগে যেত। বাথরুমে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিলুম। কেন মেজাজ খারাপ হয়, কেন মানুষ এমন করে ? কেন মিনতির শাসন মানেই মার ? অপূর্বর মত এমন সুন্দর ছেলে কেন বিগড়ে গেল !

ছেলে কেন বিগড়োয় ? আদরে। আর কিসে ? উদাসীনতায় যেমন মা, তেমনি বাপ। একেবারে সোনায় সোহাগা। আমি ভাবতুম, সংসার, সে আর এমন কি শক্ত ব্যাপার ! একটা চাকরি। মাথা গোঁজার একটু জায়গা, বিবাহ, সাবধানে একটি দুটি সন্তান, তারপর এই হাসি, কান্না, অসুখ, আরোগ্য, পালাপার্বণ, স্ফুর্তি, বেড়ানো, আড্ডা, সিনেমা, চুলে পাক, চোখে চাল্‌শে, গেঁটে বাত, কোমরে ব্যথা, দন্তশূল, বিদায়। ছেলে মানুষ ? সে তো অটোমেটিক মানুষ হয়ে উঠবে। তার জন্যে অত ভাবার কি আছে ? একটা ভাল স্কুল, একজন ভাল শিক্ষক, ভাল খাওয়া। চড়চড় করে বেড়ে উঠে, হাসতে হাসতে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, প্রফেসার। ভাগ্যে থাকলে সবই ভাল, না থাকলে সবই গেল ! সকালে খেয়ে-দেয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়। সবচেয়ে বড় কাজ উপার্জন। বিকেলে সান্ধ্য মজলিশ। সারাদিনের পর সামান্য রিলিফ। এমন কিছু অন্যায় কাজ নয়। বাড়ি ফিরে ভীষণ শ্রান্ত। পরের দিন বেরোনোর জন্যে বিশ্রাম চাই, একটু সুখ চাই ! এক কাপ চা, হালকা একটা বই, শান্ত পরিবেশ। ঘুম ঘুম ভাব। কত স্বপ্ন, কত পরিকল্পনা। তোমরা পড়, পড়ে যাও, আমি ত আছিই, তাছাড়া গৃহশিক্ষক আছেন, স্কুল আছে। অঙ্ক-ফঙ্ক সবই ত প্রায় ভুলে বসে আছি। এখন ছেলে পড়াতে হলে নিজেকে আবার পড়তে হবে। সে কি সম্ভব ! সারাদিনের পর ছেলে ঠেঙানো। আমি খরচ করতে রাজি আছি।

কেউ বলতে পারবে না, বাপের কৃপণতার জন্যে ছেলেটার বারোটা রে গেল। ছেলের মা কি ভেবেছে ? বাপ আছে। আমার কাজ রান্না-বান্না, সেল , টিফিন, শাসন, আদর একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে সিনেমা, বেড়ানো, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, মান, অভিমান, কলহ, ভাব। গোলে তালে-ঠেকা মেরে মেরে কনসার্ট চালিয়ে যাও। সব ঠিক হ্যায় তো ঠিক হ্যায় নেহি ত ব্লাড প্রেসার, ধর শালাকে, মার শালাকে। গেল গেল সব গেল। হই হই রই রই ব্যাপার।

অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলেন পড়ানো ব্যাপারটা নির্ভর করে অভ্যাসের ওপর। ন্যাক থাকা চাই। সবই অভ্যাসের ব্যাপার, হাঁটার অভ্যাস, খাওয়ার অভ্যাস, কাজ করার অভ্যাস, অভ্যাস যোগ। এই দুর্যোগে সেই যোগই চালু করা যাক দুর্গা বলে ! নিজের ছেলেকে পড়াচ্ছি ভেবে যদি খারাপ লাগে ভাবি অন্যের ছেলেকে পড়াচ্ছি। গৃহশিক্ষক আমি। মাসের শেষে একশো টাকা ! কাজ আর টাকা এক করতে পারলে বেশ সহনীয় হয়ে ওঠে।

আমি যে জায়গায় ছেলেকে নিয়ে বসেছি সেখান থেকে আমার শোবার ঘর দেখা যাচ্ছে। মিনতি কেমন মজা করে খাটে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে ঠ্যাং

এর ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে। যত ম্যাও তুমি সামলাও ম্যান। আমি হলুম সকালের কেয়ার-টেকার, তুমি হলে রাতের। না, হিংসে করে লাভ নেই। সত্যিই তো ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে। একমাত্র বংশধর। এখন কি কায়দায় পড়াব? সাবেক আমলের পণ্ডিতমশায়ী কায়দায়, না আধুনিক কালের বন্ধু ভাবে। এস কমরেড এগিয়ে এস। দেখি কতদূর কি করেছ!

অপূর্বকে এখন বেশ সৌম্য দেখাচ্ছে। ছেলেটাকে বেশী খোঁচাখুঁচি না করলে বেশ ভদ্র আর সভ্য বলেই মনে হয়। 'কি পড়াবে?'

'এস আগে ইংরেজীটাই দেখি, না কি?'

'তা দেখতে পারো, তবে কিনা অঙ্কটা বেশ ঝামেলা করছে।'

'বেশ তাহলে অঙ্ক দিয়েই শুরু করা যাক।'

অঙ্কর একটা সুবিধে আছে। ছবি আঁকার মত, একজন কষে আর একজন দেখে আর মাঝে মধ্যে হুঁ হুঁ করে যায়। শিক্ষক এক একটা পর্ব শেষ করে বলছেন, বুঝেছ ত! ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ বলে পাশ কাটিয়ে চলেছে।

গোটাকতক অঙ্কের পরই একটাতে মোক্ষম ফেঁসে গেলুম। মাথা আর খেলছে না। বুঝলে বুঝলে বলে দু'কদম এগিয়েই গতিরোধ। অপূর্ব প্রথমটায় হয়তো দেখছিল, তারপর সারাদিনের ক্লান্তি, চোখ বুজে আসছে ঘুমে। মাথাটা মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ছে। আমি এতক্ষণ খাড়াই ছিলুম, এখন মনে হল বুদ্ধিটা কাত হলে হয়তো খুলবে। ব্রেনটা সেই সকাল থেকেই খাড়া হয়ে আছে একটু কাত না করলে অঙ্কটাকে ঠিক জুতে আনা যাবে না। নাঃ নিজের ব্রেনই ভাল নয়, তা ছেলের ব্রেন কি করে ভাল হবে।

আর পারা যায় না। সকালে ভাল করে কাগজ দেখা হয় না, কাগজটা পড়ে আছে। একটা থ্রিলারের এমন জায়গায় আটকে আছি, সব সময় মনে হচ্ছে একবার খুলে দেখি পরেরটা কি। অপূর্বও কাত মেরেছে। কতক্ষণ সোজা রাখব। নিজের ঝোঁক না এলে পড়তে বসে খাড়া থাকা শক্ত। আমার নিজের চোখই বুজে আসছে। উঃ সেই কোন্ ভোরে উঠেছি। বুদ্ধি ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে আসছে। সংখ্যা ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসছে। অঙ্কের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে!

খাতার ওপর মাথা রেখে ভোঁস ভোঁস করে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম কে জানে। মিনতির হাতের ঠেলায় ঘুম ভাঙল। 'বাঃ বাঃ বেশ পড়া হচ্ছে। একদিকে বাবা কাত অন্য দিকে ছেলে কাত। কাকে কি বলব!'

অপূর্ব আমার আগেই উঠেছে। চোখ জবাফুলের মত লাল। দুলে দুলে কি একটা পড়ছে গুনগুন করে ভোমরার মত। নিজের অপরাধ চাপা দেবার জন্যে বললুম, 'আগে কিন্তু অপূর্ব ঘুমিয়েছে। আমি অনেকক্ষণ জেগেই ছিলুম। তারপর কাত হয়ে নিজেকে সামান্য একটু আরাম দিতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম। কেলেঙ্কারি কাণ্ড।'

বুঝেছি সব বুঝেছি। ছেলে পড়ানো তোমার কম্ম নয়। সারা জীবন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দাও। রোব্বার নটার আগে বিছানা ছাড়বে না। অন্য দিন ছটা থেকে ঠেলাঠেলি করতে করতে সাতটায় যদি দয়া করে ওঠ। খুব হয়েছে, চল এখন খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর।'

খুব একটা চাপা পরিবেশে আমাদের খাওয়া শেষ হল। বিষণ্ণ একটা ভবিষ্যতের ছায়া বর্তমানের সমস্ত আনন্দ অন্ধকার করে দিয়েছে। কত লোকের কত ভাল হয়। জীবনবাবুর ছেলে ফার্স্ট হয়। প্রশান্তবাবুর ছেলে পাশ-টাশ করে বিশাল টাকা মাইনেয় জাহাজের রেডিও অফিসার হয়েছে। অমরেশবাবুর ছেলে বিলেত গেছে। উঃ আমাদের যে কি হবে!

অপূর্ব যখন চলে ফিরে বেড়ায় তখন মনে হয় প্রায় সাবালক হয়ে এসেছে। আর কটা বছর! এরপরই জীবিকার বাজারে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে। যুদ্ধ জয়ের জন্যে নিজেকে কতটাই বা প্রস্তুত করেছে। এখন যে ভাবে চলছে, সেই ভাবে চললে ভরাডুবি। মিনতির পাশে আর শুতে ইচ্ছে করে না! শুলেই দুর্বলতা। নিজের ওপর তেমন আর ভরসা নেই। আগে মনে করতুম আমি খুব সক্ষম পিতা। আমার রক্তে ঘুরছে প্রতিভার মশলা। এক একটি দিকপাল সৃষ্টি করে ড্যাং ড্যাং করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। দেওয়ালে হাসি হাসি মুখে ছবি হয়ে ঝুলব। বছরে একবার গোড়ের মালা পরব। সবাই বলবে মিনতি রত্নগর্ভা।

আলো নেভানো ঘরে বিক্ষুব্ধ মন মরা দম্পতি। ঘড়ির টিক টিক শব্দ। বয়েস বাড়ছে। শক্তি কমে আসছে, স্মৃতি ক্ষীণ, শরীর ভাঙছে। নানা রকম ভয় চারপাশ থেকে চেপে আসছে। সবচেয়ে বড় ভয় আবার একটা নতুন দিন শুরু হয়ে যাবে ঘণ্টা কয়েক পরেই। আবার ঘর্ষণ, আবার স্ফুলিঙ্গ, আবার অসন্তোষ। ব্যর্থ দিনের শেষে চাপা রাত। আবার দিন, আবার রাত। একটু একটু করে পরাজয়, ধীরে ধীরে হঠে আসা।

অন্ধকারে মিনতির গায়ে হাত রাখতে গিয়ে গালে হাত পড়ে গেল। চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে জলের ধারা নেমেছে। মিনতি কাঁদছে। এক সময়, এখনও মনে পড়ে, এই বিছানায় দুজনে পাশাপাশি শুয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কত হেসেছি, খুনসুটি করেছি। সেই সব স্লেটের লেখা ভাগ্যের নিষ্ঠুর হাত কি ভাবে মুছে দিয়ে গেল!

'তুমি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলে কেন মিনতি?' কোন জবাব নেই। 'কেন কাঁদছ বলবে ত!'

'মন ভাল নেই।'

'কেঁদে কি সমস্যার সমাধান করা যায়। ছেলে বিগড়েছে, শোধরাবার চেষ্টা করতে হবে। এই বয়েসটাই হল বেগড়াবার বয়েস। এই চার দেওয়ালের বাইরে বিশ্রী একটা জগৎ হাঁ করে আছে। তোমার আমার, সকালের সন্তানকেই গ্রাস

করতে আসছে। সঙ্গদোষ বড় দোষ। শুধু কঠোর হলেই চলবে না। স্নেহ দিয়ে সঙ্গ দিয়ে ছেলেকে ফেরাতে হবে।'

মিনতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। বাইরে খুব ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। জানালার ফোকরে সিঁ সিঁ শব্দ হচ্ছে। কত রাত হল তবু ঘুম আসছে না। সব স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হযে যাচ্ছে। বাবার কথা মনে পড়ছে। তিনি বলতেন, জীবনে অনেক ভুল করেছি তার মাশুলও দিয়েছি। আমি পরাজিত। তুমি জয়ী হও, তাহলে আমি একটু শান্তিতে যেতে পারব। আমি সে কথা শুনিনি। ভুল করাই বোধহয় মানুষের কর্ম। আমি ত জয়ী হতে পারিনি আমিও নানাভাবে পরাজিত ! আমার ছেলেকেও আমি একই ভাবে বলতে চাই, তুমি জযী হও। সেও ত পরাজয়ের পথে চলেছে। ভাগ্য হাসছে ! আমরা কাঁদছি।

দুই

সকালবেলা নীরদবাবু এলেন। শীত যাই যাই করছে তবু পরনে একটি লংকোট। মাথায় গোল বোলারস হ্যাট। হাতে ছড়ি। সাবেক কালের দৃপ্ত ভঙ্গি। মর্নিং ওয়াক সেরে ফেরার পথে একবার ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন। কে কেমন আছে। সংসার কেমন চলছে। এক কাপ চা খাবেন। কিছুক্ষণ গল্প গুজব করবেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়বে আমাকে বেরোতে হবে। ছড়ি হাতে উঠে দাঁড়াবেন। কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছবেন। 'আমি তা হলে চললুম' বলে গটগট করে বেরিয়ে যাবেন ! হয়তো নিজের জীবনেও অনেক সুখ দুঃখ আছে, ঘাত প্রতিঘাত আছে ! কিছুই গায়ে মাখেন না। সবই যেন কোটের গায়ে ধুলো। ঝাড়লেই উড়ে যায়। অদ্ভুত একটা ভগবৎ বিশ্বাসের আচ্ছাদনে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন।

টুপিটা খুলতে খুলতে বললেন, 'সব ঠিক আছে ত ?'

একমাথা সাদা চুল। কালো করে দিলেই এখনও যুবক। লাঠিটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে সোফায় বসলেন।

খবরের কাগজটা গুটিয়ে রেখে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ এমনি সব ঠিকই আছে।

'এমনি বললে কেন ? এমনি মানে তা অ্যাপারেণ্টলি। তার মানে ভেতরে একটু গোলযোগ ?'

'তা বলতে পারেন।'

'শরীর গোলমাল ?'

'তার চেয়েও মারাত্মক। মনের দিক থেকে আমরা ভেঙে পড়েছি।' মনের মতন মানুষ পেলে দুঃখের কথা শোনাতে ভাল লাগে। মনটা অসম্ভব হালকা হয়ে যায়।

'মনটাকে সারেণ্ডার করে দাও। বল—তোমার কর্ম তুমি কর মা, দেখবে সাহস পাচ্ছ, লড়াই করার শক্তি পাচ্ছ। অটোমেটিক সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে ! তোমার কাজ দাঁড় টেনে চলা, ঘাটে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব যাঁর তিনি ত হাল

ধরে বসে আছেন। বিশ্বাসকে নামিয়ে আনো। ইজিপসিয়ানদের মত বল, আই অ্যাম টোডে, আই অ্যাম ইয়েসটারডে, আই অ্যাম টোমরো, অ্যাজ আই পাস থ রেকারেণ্ট বার্থস, আই অ্যাম এভার ইয়ং অ্যাণ্ড ভিগরাস। মনটাকে দুলতে দিলেই ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলবে। স্টেডি রাখ।'

নীরদদা হাসতে লাগলেন দেবতার মত। মিনতি চা নিয়ে এল। চোখে চশমা, মুখ গম্ভীর। সাত সকালেই চোখে চশমা মানে মাথা ধরব ধরব করছে। নীরদদা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বললেন, 'সকালেই মেঘলা মুখ কেন বউমা ?'

'ছেলেটাকে নিয়ে বড় অশান্তিতে আছি।'

'কেন কি করেছে ? কথা শুনছে না ?'

'কথা ত শুনছেই না, উল্টে কথা শোনাচ্ছে। লেখাপড়া ছেড়েই দিয়েছে। সারাদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে হই হই আড্ডা।'

নীরদদা বললেন, 'কোথায় সে, ডাক তাকে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমাদের ছেলে খারাপ হতে পারে না। গাছ দেখে ফল চেনা যায় বউমা।'

আমি বললুম, 'নীরদদা ফল দেখেও ত গাছ চেনা যায়। হয়তো গাছটাই ভাল জাতের নয়।'

'ওহে তুমি চুপ কর। তোমার কেবল নেগেটিভ্ থট্স। কই ডাক তাকে।' ডাক শুনে অপূর্ব এল। নীরদদা বললেন, 'এদিকে এস, আমার পাশে কিছুক্ষণ চুপ করে বস। ছটফট কোরো না।'

বাইরের মানুষের কাছে অপূর্ব ভারি ভদ্র। একই ছেলের দুটো ব্যক্তিত্ব! খুব স্বাভাবিক একজন ভদ্রলোকের মত নীরদদার পাশে বসে আছে, পায়ের ওপর পা তুলে। নীরদদা অপূর্বর ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, 'দেখি তোমার ডান হাতটা।' গভীর মনোযোগ দিয়ে হাতের তালুটা দেখলেন। 'ফাইন রবি রেখা, সোজা নেমে গেছে, তোমরা এই ছেলের জন্য ভাবছ।'

মিনতির মুখের চেহারা সামান্য পাল্টাল। ভাগ্য-টাগ্য খুব বিশ্বাস করে। গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়, পাথর-মাদুলি, ফুল-বেলপাতার অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী। নীরদদা হাতটা সরিয়ে রেখে ছেলের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মুখেই মানুষের পরিচয় লেখা থাকে। কি দেখলেন নীরদদাই জানেন। আমাদের বললেন, 'বাড়িতে পুরোন ডায়েরী আছে ?'

'ডায়েরী!'

'হ্যাঁ একটা ডায়েরী চাই। অপূর্বকে তোমরা একটা ডায়েরী দেবে। শোন অপূর্ব, তুমি রোজ ডায়েরী লিখবে। যা যা করবে প্রাণ খুলে লিখে যাবে, কিচ্ছু চেপে যাবে না, ভাল কাজ, খারাপ কাজ, নির্ভয়ে লিখে যাবে। আর রোজ একবার করে আমার কাছে আসবে। তোমাকে আমি উপদেশ দোব না। আজকালকার ছেলেরা বুড়োদের উপদেশ পছন্দ করে না। আমরা দুজনে প্রাণ

খুলে গল্প করব। আচ্ছা তুমি এখন যাও।'

অপূর্ব টপাটপ আমাদের প্রণাম করে হাসি মুখে চলে গেল। মুখটা দেখে মনে হল পুরো ব্যাপারটাকেই সে একটা মজা ভেবে নিয়েছে। আমাদের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, নীরদদার নির্দেশ সবই যেন তামাশা। এই বয়েসটা বড় অদ্ভুত। কিসের নেশা, কিসের ঘোর, কিসের স্বপ্ন!

মিনতি বললে, 'ওর এই বাইরে বেরোনটা বন্ধ করতে পারলে ছেলেটা ভাল হয়ে যেত! কিন্তু লপেটা বন্ধু জুটে সর্বনাশ করে দিলে।'

নীরদদা উঁহু উঁহু করে উঠলেন, 'ভুল ধারণা বউমা। ঘরে বেঁধে রাখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তেলেভাজার কড়া দেখেছ, এক কড়া তেল টপাটপ ফুলুরি পডছে, তলিযে গিয়েই ভেসে উঠে ভাজা ভাজা হচ্ছে মুচমুচে ভাজা। বাইরের জগৎটা হল তেলেভাজার কডা, এক একটি প্রাণ এসে পড়ছে, ভাজা ভাজা হচ্ছে। ঠিকমত ভাজা হলে তবেই না স্বাদ, তবে হ্যাঁ দেখতে হবে বেশী ভাজা হলেই বাতিল। মিশতে দিতে হবে কিন্তু নজর রাখতে হবে খরে না যায়।'

টুপিটা হাতে নিযে নীরদদা উঠে দাঁড়ালেন, 'উৎসর্গ করে দাও, জানবে ভাল সংস্কার নিয়ে এলে কখনও বিপথে যাবে না, যেতে পারে না। আচ্ছা আমি চলি।' নীরদদা গটগট করে বেরিযে গেলেন। পিছনে খানিকটা আশা ফেলে রেখে গেলেন।

তিন

আমাদের সামনের বাড়িতে এক গাইয়ে জ্যোতিষী আসেন। বেশ বলিয়ে-কইয়ে মানুষ। যোগাযোগটা আমার দিকের নয়, মিনতির। এ বাড়ি ও বাড়ি আসা যাওয়া করতে করতে এই জ্যোতিষী ভদ্রলোকের অসীম অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় মিনতি আবিষ্কার করে ফেলেছে। বাঁকা ভাগ্যকে ইনি সহজেই সোজা করে দিতে পারেন। গ্রহ নক্ষত্রদের সমস্ত ষড়যন্ত্র এনার নখদর্পণে।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি এলাহি কাণ্ড। বাইরের ঘরে প্রভাতবাবু গম্ভীর মুখে বসে আছেন। কোলের ওপর থেকে একটা গাছ কোষ্ঠী গড়িয়ে নেমে গেছে মেঝেতে। কোষ্ঠীটা আমার ছেলের। প্রায় হাত পাঁচেক লম্বা। গত-বছর আর এক জ্যোতিষী এই বস্তুটি শ' দুয়েক টাকার বিনিময়ে বানিয়ে ছিলেন। তিনি বিচার করে যে সব ভাল ভাল কথা বলেছিলেন তার কোনটাই মেলেনি। যা কিছু খারাপ বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। কোষ্ঠীর ফলাফল যখন পাল্টাবে না তখন জ্যোতিষী পাল্টে কি আর ভাগ্য ফিরবে? এ সব ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। বিশ্বাসও করি না অবিশ্বাসও করি না। ভাল বললে আশায় নেচে উঠি খারাপ বললে দিনকতক চিতিয়ে পড়ি। তারপর সব ভুলে-টুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে হারিয়ে যাই।

বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে মিনতি বসে। তার হাতে আরো

দুটো কোষ্ঠী গোটানো। একটা মনে হয় আমার, অন্যটা মিনতির। শুধু ছেলেরটা দেখলেই ত আর হবে না। সন্তানের ভাগ্যের উপর পিতামাতার প্রভাবও কম নয়।

আমাকে ঢুকতে দেখে মিনতি মুখ তুলে তাকাল, 'এই যে এসে গেছ ?'

'হ্যাঁ এসে গেলুম।'

'প্রভাতবাবুকে সামনের বাড়ি থেকে জোর করে ধরে আনলুম।'

প্রভাতবাবু ছক থেকে মুখ তুলে তাকালেন। নমস্কার বিনিময় হল। প্রভাতবাবু আবার গ্রহ নক্ষত্রের জগতে তলিয়ে গেলেন। মিনতি বললে, 'তুমিও এসে বোস না!'

'আসছি দাঁড়াও।'

ভেবেছিলুম ভেতরে ঢুকে দেখব অপূর্ব হয়তো মন দিয়ে পড়ছে। নিতান্তই দুরাশা। তিনি যথারীতি শোবার ঘরে কম আলোটা জ্বেলে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছেন। হতাশ করে দেবার মত দৃশ্য। আমরা সারাদিন বাইরের জগতে হা অন্ন, হা অন্ন করে গোলামি করছি, আর ইনি মনের আনন্দে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন! ভাগ্য কোষ্ঠীতে নেই। ভাগ্য তৈরি হচ্ছে চোখের সামনে, ঘুমের জগতে। মিনতি এই সামান্য ব্যাপারটা কেন যে বোঝে না। সন্ধ্যের দিকটায় যেই সে প্রভাতবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ছেলে অমনি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এর নাম মধুর শৈশব। পড়বে কি, সারা বিকেলের মাঠের ক্লান্তি বিছানায় ঢেলে দিয়েছে। সারাটা দিন চাকরি-বাকরি ছেড়ে একে চোখে চোখে না রাখলে তাবিজে-কবজে অশ্বডিম্ব হবে। দুনিয়াটা কি অদ্ভুত অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কেউ কারুর কর্তব্য করবে না। ছাত্র ছাত্রের কর্তব্য করবে না, স্ত্রী স্ত্রীর কর্তব্য করবে না, সামাজিক মানুষ তার সম্পর্কে উদাসীন। ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। ভাঙনের জয়গান গাই।

'কই তুমি এলে ?' মিনতির গলা ভেসে এল। আর গিয়ে কি হবে। মন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে ওই প্রভাতবাবুকেই হয়তো কড়া কথা শুনিয়ে দোব। তখন মিনতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাবে। কথায় বলে বিপদের দিনে একতা বজায় রাখতে হয়। একটা ঘোর অমঙ্গলের ছায়া চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে নইলে সমূলে বিনষ্টি।

বসার ঘরে আসতেই প্রভাতবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'যা দেখছি—'

'কি দেখছেন ?'

'মঙ্গল একেবারে ফিউরিয়াস হয়ে বসে আছে। কোন কাজ মাথা ঠাণ্ডা করে করতে দিচ্ছে না।'

'তাহলে কি হবে ?'

তিনটে কোষ্ঠীই পাশাপাশি খোলা। প্রভাতবাবু একবার এটা টানেন তো ওটা ছাড়েন। সাংঘাতিক কাণ্ড চলেছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'তা ছাড়া আপনার কেতু। ফিফ্‌থ হাউসে গ্যাঁট হয়ে বসে আপনার সাংসারিক শান্তি

হরণ করছে। ছেলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে দিচ্ছে না। তারপর এই বউদির কোষ্ঠী, বৃহস্পতি বেজায় বলবান। সংসারে টান থাকবে না, সব মিলিয়ে কেলোর কীর্তি। বিয়ের আগে কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিলেন ?'

'যখন বিয়ে হয় তখন কি আর ও সবে বিশ্বাস ছিল মশাই।'

'কেন যে আপনাদের বিশ্বাস আসে না। সামান্য সাবধান হলে মানুষের জীবনটা কত সুখের হতে পারে। আপনারও সংসারে তেমন টান নেই, বউদিরও নেই।'

'টান নেই কি মশাই ! সংসার সংসার করে চুল পেকে গেল। চামড়া ইওলো হয়ে গেল।'

'বললে কি হবে। কোষ্ঠী বলছে নেই। কদাচিৎ স্ত্রী-পুত্র চিন্তায়ুক্ত, সদা উদ্বিগ্ন মনা। এ সব হল গিয়ে বাউল, বামুণ্ডুলের কোষ্ঠী। রাহুর প্যাঁচে পড়ে সংসারে ঢুকে বসে আছে। এই যে আপনার ছেলে, জানুয়ারীতে না জন্মে আর একটা মাস পরে যদি জন্মাত, সংসারের চেহারাটাই পাল্টে যেত। কিন্তু গ্রহ। গ্রহ যাবে কোথায়। জানুয়ারীতেই জন্মাতে হবে। শত্রুর ঘরে মঙ্গলকে নিয়ে, বুধকে স্ট্রং করে এসে হাজির হলেন।'

প্রভাতবাবুর কথা শুনতে শুনতে মনে হল ছেলে যেন আমার চায়ের ব্লেন্ড। পঁচিশ ভাগ দার্জিলিং পঁচাত্তর ভাগ সিটিসি। স্ট্রং লিকার ফ্লেভার কিছু কম। প্রভাতবাবু বলে চলেছেন, 'যেমন একগুঁয়ে তেমনি জেদী। ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে একটি কাজও করানো যাবে না। পড়ব ত পড়ব না পড়ব ত না পড়ব। মাঝে মাঝেই উট্‌কো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। তেরিয়া, মারমুখী। বুধের প্রভাবে বুদ্ধি তেমন পাকবে না। সারা জীবনই ছেলেমানুষ। চপল, চঞ্চল।'

'তাহলে কি হবে ?' মিনতির গলায় মারাত্মক উদ্বেগ।

'ভগবানই ভরসা।'

'এ যুগে ভগবানের ওপর তেমন ভরসা করা যায় না।'

'তাহলে...'

'তাহলে কি ?'

'একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। সামান্য কিছু খরচ হবে।'

মনে মনে ভাবলুম পথে এস বাবা। এই ত লাইনে পড়ে গেছ। মিনতি প্রশ্ন করল, 'সেটা কি ?'

'একটা কবচ, সুরক্ষা কবচ। ভাল দিন দেখে একটা যজ্ঞ করে গ্রহ শান্তি। যে জিনিসটা বেরোবে সেটাকে রুপোর কবজে ভরে তাবিজ করে পরিয়ে দিন। মঙ্গলের ব্যাড এফেক্টটা কেটে যাবে !'

'খরচ কত ?'

'কত আর ? সামান্যই, শ আড়াই। একটা ছেলের মঙ্গলের জন্যে আড়াইশো কি আর এমন খরচ। আর তা না হলে স্টোন। স্টোনে আরো বেশী খরচ। তবে হ্যাঁ দেখতে ভাল !'

মিনতি আমার মুখের দিকে তাকাল, 'তুমি কি বল ?'

'কি আর বলব ? তোমার বিশ্বাস থাকে করাও।'

প্রভাতবাবু একগাল হেসে বললেন, 'দাদার বুঝি বিশ্বাস নেই ? খুব আছে। বিশ্বাস না থাকলে কেউ এত খরচ করে এই সব গাছ কোষ্ঠী করায় !'

মিনতি এগিয়ে গিয়েও শেষ মুহূর্তে একটু প্যাঁচ মেরে বসল। সংসার চালায় আড়াইশো টাকার বেদনা বোঝে।

'টাকাটা আমি কিন্তু ইনস্টলমেণ্টে দোব।'

'ই ছি ছি ছি।' প্রভাতবাবু বসে বসেই ঝিঁকি লাফ মারলেন !

মিনতি থতমত খেয়ে বললে, 'কেন, কেন ?'

'এ কি টিভি না ফ্রীজ বউদি ! গ্রহশান্তির ব্যাপার কি কিস্তিতে হয় ?'

তা ঠিক। এক কোপেই গলা নামাতে হয়। ফেলে রাখলেই বিপদ। মেরে বেরিয়ে যাও। জানা কথাই কাজ হবে না। কাজ না হলেই পার্টি চেপে ধরবে।

মিনতি আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো বল না।'

'ইচ্ছে যখন হয়েছে করিয়ে ফেল !'

'এই ত দাদার মত হয়েছে।' প্রভাতবাবুর এক মুখ হাসি। এক কাপ চা মেরে আড়াইশো টাকার অর্ডার পকেটে পুরে প্রভাতবাবু সামনের বাড়িতে গান শেখাতে চলে গেলেন। কারুর সর্বনাশ কারুর পোষ মাস। ভাল ব্যবসা। যে ব্যবসায় মূলধন হল মানুষের বিপদ, মানুষের দুর্বলতা।

মিনতি কাঁচুমাচু মুখ করে বললে, 'দুম করে আড়াইশো টাকার ধাক্কা। সবই ছেলেটার ভবিষ্যতের জন্যে। আমার এখন শাড়ি আর সায়া চাই না। কবচটা আগে হোক তারপর তোমার সুবিধেমত দিও।'

'তোমার শাড়ি সায়া, এদিকে আমার গেঞ্জি, পাজাম, আণ্ডারওয়্যার সব ছিঁড়ে বসে আছে।'

'কি করা যাবে, ভবিষ্যতের জন্যে বাপ মাকে ত একটু কষ্ট করতেই হবে।'

'ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করছ, এদিকে তোমার ভবিষ্যৎ ত সন্ধ্যে থেকেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কোন্ বাড়ির ছেলে এই অসময়ে ঘুমোচ্ছে তুমি একবার দেখাও ত। এইত আসার পথে দেখে এলুম, সব বাড়িতেই পড়ার রোল উঠেছে।'

'আরে সেই জন্যেই ত কবচ। প্রভাতবাবুকে পাকড়াও করে নিয়ে এলুম। বলা যায় না কবচে হয়তো কাজ হবে। অনেক সময় হয়। হয় না ?'

'কি জানি। তুমিই জানো।'

চার

দুপুরের দিকে অফিসে একটা টেলিফোন এল। মিনতির উদ্বেগ জড়ানো গলা, 'একবার আসতে পারবে ?'

'কেন কি হল ?'

'তুমি এস, তেমন কিছু নয়, তবে এলে ভাল হয়। তাড়াহুড়ো করো না, ধীরে ধীরেই এস, তবে এস।'

'কোন বিপদ ?'

'তেমন কিছু নয়, এলেই জানতে পারবে।'

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে খুব খারাপ লাগল। তিনটে মানুষের সংসার, কত সুখের হতে পারত। এমন বরাত, সব সময় একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। নির্ঘাত অপূর্ব একটা কিছু করে বসে আছে। ছেলেটা আমাদের মারবে। কথায় বলে, পেটের শত্রু বড় শত্রু।

দরজার গোড়ায় মিনতি বসে আছে বিষণ্ণ মুখে। দেখে ভারি কষ্ট হল। বছর দশেক আগে এই বাড়ি, এই বউ কেমন ছিল। ছোট্ট একটি শিশু সারা বাড়িতে হই হই করে বেড়াচ্ছে। আমরা দুজনে হাসছি, খেলছি, মজা করছি। আর এখন! আলকাতরা মাখানো একটা ভবিষ্যৎ তেড়ে আসছে।

'কি হয়েছে ? এখানে বসে ?'

'ভেতরে গিয়ে দেখ।'

ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ নাকে এল। শোবার ঘরে মৃদু নীল আলো, নীল মশারি, বালিসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটা মাথা। মিনতি উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

'কি করে হল, পড়ে গেছে ?'

'না মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। পাঁচটা স্টিচ পড়েছে।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ, ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এল, রক্তে মুখ চোখ ভেসে যাচ্ছে। ডিসপেনসারিতে কোন ডাক্তার নেই, শেষে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্টিচ, ওষুধ, ইনজেকসান।'

'ঘুমোচ্ছে ?'

'না আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, গা-ও বেশ গরম।'

'হঠাৎ মারামারি!'

'জানি না।'

মশারির ভেতর থেকে অপূর্বর গলা, 'বাবা এলে ?'

'হ্যাঁ, তুমি এ কি করেছ ?'

'ভেতরে এস, বলছি।'

মশারির বাইরে একটা টুলে বসলুম। অপূর্বর মুখ লাল। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। চোখের পাশে চোয়ালের ওপর কালশিটে। ঘুসি-টুসি খেয়েছে।

'তুমি ভেব না, কালই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সে ত যাবে, তুমি মারামারি করলে কেন ?'

'ওরা তোমাকে অপমান করেছিল।'

'আমাকে ? কারা ? কারা তারা ?'

'ওই মোড়ের রকে বসে আড্ডা মারে দুটো ছেলে। যেতে আসতে আমাকে টিটকিরি মারে। আজ তোমাকে তুলে কথা বলেছিল, আমি সহ্য করিনি।'

'কি বলে ছিল ?'

'বলেছিল ওর বাপটা সখী সখী।'

'ছেলে দুটোকে তুমি চেনো মিনতি ?'

'খুব চিনি। দুটোই বিশ্ববখাটে ! এর চেয়ে বয়সে বড়। এইটুকু পুঁচকে গেছেন ওদের সঙ্গে মারামারি করতে।'

অপূর্ব দৃপ্ত গলায় বললে, 'বাবার অপমান আমি সহ্য করব না। আজ মার খেয়েছি, কাল মার দোব।'

মিনতি বললে, 'শুনলে কথা। এটা যে কার মত হয়েছে, বংশ ছাড়া স্বভাব।'

আমাকে সখী বলছে, শুনে নিজেরই রাগ হচ্ছে। তবে আমি হলে এই ভাবে প্রতিবাদ করতে পারতুম না। শুনেও শুনতুম না, উপেক্ষা করতুম। যুগটা ত সুবিধের নয়। নিরীহ মানুষরা এখন কোটরে বাস করে। ছেলেকেই বোঝাবার চেষ্টা করি, 'আরে রাস্তার লোফাররা কত কি বলে, সব কথা কি গায়ে মাখলে চলে ?'

অপূর্ব লাফিয়ে উঠল, 'আমাকে বলে বলুক, তোমাকে বলবে কেন ? আমাকে ত রোজই বলে সখী সংবাদ, আজ তোমাকে বলেছে। ওরা দু-তিনজন ছিল তাই আজ মারতে পেরেছে, এরপর এক একটাকে যখন একলা পাব মেরে বৃন্দাবন দেখিয়ে দোব। আমার নাম অপূর্ব।'

রাত খুবই বিষণ্ণ। নয়া জামানার সঙ্গে মানিয়ে চলা যাচ্ছে না। পুরোন বিশ্বাস জীবন যাত্রার ধরন সবই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। খেতে হয় খাওয়া। ছেলেটা চোট খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে। স্বাভাবিক হতে সময় নেবে।

অনেকক্ষণ আমরা দুজনে বাইরের বারান্দায় বসে রইলুম। এক আকাশ তারা পিটপিট করছে শিশুর চোখের মত। চারপাশ কেমন পালটে গেছে। এক সময় এদিকে কত নারকেল গাছ ছিল। এখন একটি মাত্র গাছে সাথী হারা মৃত্যুর দিন গুনছে। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে চারপাশে। টি ভি অ্যান্টেনা অন্ধকারে আকাশ হাতড়ে ছবি খুঁজছে। কত নতুন মুখ এসে গেছে এই এলাকায়। পুরোন মুখ আর চোখেই পড়ে না।

মিনতি এক সময়ে বললে, 'ছেলেটাকে কোন বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও না।'

'অতই সোজা ! তুমি তো জানো আজকাল একটা ছেলেকে কোথাও ঢোকানো কত কঠিন। অতি কষ্টে ধরাধরি করে এই স্কুলে ঢুকিয়েছি।'

'আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম থেকেই বলে আসছি, পরিবেশ ভাল নয়, নিজে দেখতে পারবে না একটা বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও তবু মানুষ হবে।'

'সবই বুঝলুম, প্রথমত খরচ, দ্বিতীয়ত একটা ছেলে, কাছ ছাড়া করে দোব ! তাই আর গা করিনি। এখন দেখছি সত্যিই ভুল করেছি।'

'তুমি কালই আশ্রমের মহারাজকে গিয়ে একটু ধর। হাতে পায়ে ধরলে তোমার কথা শুনবেন।'

'খরচ !'

'সে যা হয় হবে। এক বেলা খেয়েও ছেলেটাকে যদি মানুষ করা যায়।'

জোনাকির মত সামান্য একটু আশার আলো অন্ধকারে ভেসে এল। হয়তো সম্ভব হবে। হয়তো মানুষ হবে। হয়তো ঘুরে যাবে। হয়তো ফিরে আসবে হারানো ছেলে। এমন ত হয় দাঁত ওঠার সময় কত কষ্ট। উঠে গেলে আবার স্বাভাবিক। এটা হয়তো টিথিং প্রবলেম।

'ঠিক আছে, কাল থেকে আবার উঠে পড়ে লেগে যাই। চল এখন শোওয়া যাক। অপূর্বর গা-টা একবার দেখ। জ্বর বাড়ছে, না কমছে।'

পাঁচ

স্বামী স্ত্রী যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলুম মনে হল আমাদের পুনর্জন্ম হল। দীর্ঘ দিনের জ্বর যেন এক পুরিয়া ওষুধে ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল। মহারাজ অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। অপূর্ব বোর্ডিংয়ে চলে যাবে। দূরে। তা হোক। ওর পক্ষে দূরই ভাল। আশ্রমের নিজস্ব পরিবেশে ধরাবাঁধার মধ্যে লেখা পড়া করবে। খাওয়া দাওয়ার একটু কষ্ট হবে। মাছ, মাংস, ডিম চলবে না, তবে সকাল সন্ধ্যে দুধ পাবে। প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে কি। তা ছাড়া, আমরা ত একেবারে উঁচু ক্লাসে ভর্তি করি না।

রিক্শায় ফিরতে ফিরতে মিনতি বেশ খুশি খুশি গলায় বললে, 'যাক বাবা একটা হিল্লে হল। দেখলে ত তুমি বলছিলে হবে না, কিন্তু হল ত। ছেলেটার বরাত ভাল বলতে হবে।'

'এখনই লাফিও না। অতি অখ্যাত জায়গা, বড় একটা কেউ যেতে চায় না তাই হয়তো হল। ছেলেটাকে আসলে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'ভালই হবে বুঝলে। দল ছাড়া না হলে শোধরাবে না।'

বাড়িতে ফিরে মিনতির হাবভাব দেখে মনে হল ছেলের ওপর হঠাৎ যেন খুব সদয় হয়ে উঠেছে। দিনে দিনে একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। মা আর ছেলে বলে মনে হত না। মনে হত দুই শত্রু। কথায় কথায় ঠোকাঠুকি। এক পক্ষের সেই শক্ত ভাবটা কেটে গেছে। এখন যেন—কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনও নয়। সব কথাতেই আগে বাবা শেষে বাবা।

খেতে বসে অপূর্ব বলল, 'আমি যাব না। আমাকে তোমরা কিছুতেই পাঠাতে পারবে না। বেশী জোর করলে দুর্গাপুরে আমার বন্ধুর বাড়িতে চলে যাব। জীবনেও আমার সন্ধান পাবে না।'

মা বললে, 'ছিঃ ও কথা বলিসনি। ভাল জায়গা, ভাল বোর্ডিং। তোর মত আর কত ছেলে আছে। বিশাল খেলার মাঠ। জীবনে মানুষ হয়ে ফিরে আসবি। তখন তোর কত খাতির, আদর যত্ন, ভাল চাকরি, মোটা মাইনে, গাড়ি বাড়ি।'

'ঘোড়ার ডিম। আমি ও সব কিছু চাই না। পড়তে হয় বাড়িতে পড়ব।'

'বাড়িতে তুমি পড়বে না অপূর্ব। যত বছর যাচ্ছে ততই তুমি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ যাচ্ছি, বেশ করছি।'

মিনতি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সমস্যা নতুন আর এক দিকে মোড় নিয়েছে।

'কথা শুনলে ?'

'হ্যাঁ, শুনছি।'

'তুমি কিছু বল।'

'কি বলব! যে কোন কথাই শুনবে না তার কথাতেই আমাদের চলতে হবে। সব কিছুই ওর ভাল ভেবে করা। শুনলে শুনবে, না শুনলে না শুনবে। মেরে ধরে কিছু হবে না। মারের যুগ চলে গেছে।'

'ও এত বড় লায়েক আমাদের ব্যবস্থা বানচাল করে দেবে!'

'তাইত হচ্ছে।'

মিনতি ছেলেকে বললে, 'না তোমাকে যেতেই হবে। দেখি তুমি কেমন না যাও!'

'দেখা যাবে।'

মন চাইছিল না তবু আমাকে বলতে হল, 'এ কি তোমার কথার ধরন অপূর্ব। এভাবে কেউ বড়দের সঙ্গে কথা বলে, বিশেষত মা বাবার সঙ্গে ?'

'তোমাকে ত আমি কিছু বলিনি বাবা, যার পরামর্শে এ সব হচ্ছে আমি তাকেই বলছি।'

'তুমি কি ভাবো এটা শুধু তোমার মার ইচ্ছেয় হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ তাই। এর পেছনে শুধু মা।'

'কিছু আর বলার নেই তোমাকে।'

রাতটা হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে গেল। সন্ধ্যের আলো নিবল। চারপাশ থেকে অদ্ভুত একটা হতাশা, একটা অক্ষমতার ভাব ঘিরে এল। কর্তৃত্বের দেয়ালে ফাটল ধরে গেছে। আর কি হবে! দার্শনিক উদাসীনতায় সব কিছু সইয়ে নিতে হবে। কে জানত জীবন এত সমস্যা সঙ্কুল!

মিনতির মাথা ধরছে, বিছানায় চলে গেছে। অপূর্ব তার নিজের ঘরে। মার অবর্তমানে একবার তার সামনা সামনি হলে কেমন হয়। ঘরে আলো জ্বলছে, হয়তো জেগে আছে। আমাদের কথা মত কোন দিনই ও দরজা বন্ধ করে শোয়

না। ঠেলতেই খুলে গেল। আলো জ্বললেও ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ন্ত শরীর। চিত হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত কপালে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক। শান্ত শ্বাস প্রশ্বাস। শিথিল মুখের চেহারা। আমার ছেলে! পাশেই পড়ে আছে একটা খেলার ম্যাগাজিন। আমি যদি দেবদূত হতুম, ওর কপালে আমার হাত ছুঁইয়ে বলতুম, তুমি সুন্দর হও, তুমি শান্ত হও, তুমি মহান হও।

কোণের দিকে পড়ার টেবিল। বইপত্র ডাঁই হয়ে আছে। বড় অগোছালো ছেলে। চেয়ারের পিঠে একটা প্যাণ্ট ঝুলছে। টেবিলের নীচে দুপাটি মোজা। কলমের মুখটা খোলা। সামনে একটা কাগজ পড়ে আছে। ছবি আঁকার চেষ্টা হচ্ছিল। গাছ, বাড়ি, বেড়া। একপাশে পড়ে আছে সেই ডায়েরিটা। নীরদদা ডায়েরি লিখতে বলেছিলেন। কিছু লিখেছে কি?

চেয়ারে বসলুম। প্রথম পাতায় নিজের নাম। দ্বিতীয় পাতায় একটা নজরুলের গান। পরের পাতায় নিজেদের ক্লাবের চাঁদার হিসেব। তার পরের পাতায় সেদিনের মারামারির বিবরণ ঃ আমার বাবাকে যারা অপমান করে তারা আমার দুশমন। আর একদিন কিছু বলুক অ্যায়সা ঝাড় খাবে। বাবার বন্ধু আমার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন, মঙ্গল ভীষণ স্ট্রং, আমি মিলিটারিতে যাব, মেজর হব। বাবাকে তখন আমি প্লেনে করে বেড়াতে নিয়ে যাব।

পরের পাতায় লিখেছে ঃ ওরা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার প্ল্যান করেছে। আমি একটু বদমাইশি করি। ওটা আমার স্বভাব। বাবা মাকে ভীষণ ভালবাসি। ওরা আমাকে তেমন ভালবাসে না। আমার বাবা বড় ভাল মানুষ। মা-ও ভাল তবে মাথাটা একটু গরম। আমার চেয়েও গরম। আমি দুর্গাপুরে পালাব। সেখানে গিয়ে স্টীল প্ল্যাণ্টে চাকরি করব। ভাল ফুটবল খেলব। তারপর একদিন বড় খেলোয়াড় হব। তখন কাগজে ছবি বেরোবে। বাবার কষ্ট দেখলে আমার ভীষণ দুঃখ হয়।

ডায়েরিটা মুড়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলুম। রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়! অদৃশ্য বাঁধন আমাদের বেঁধে রেখেছে। সত্যিই আমরা ওকে তাড়াতে চাই। তাড়িয়ে সুখে থাকতে চাই, নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাই। আমরা ক্রিমিন্যাল। মজা করতে করতে বাবা মা। ত্যাগ নেই, প্রকৃত স্নেহ নেই, শুষ্ক কর্তব্য আছে। নিজেদের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মজায় থাকতে চাই। আমরা কারুর মন বুঝি না, নিজেদের মন নিয়েই ব্যস্ত। অপদার্থ।

বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম সরল, নিষ্পাপ একটি মুখের দিকে। বড় হৃদয়হীন পৃথিবীতে এসে পড়েছ তুমি। এখানে নিজের জোরেই তোমাকে বাঁচতে হবে, লড়াই করে।

ছয়

তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে চোখে। কানে আসছে অপূর্বর গলা, 'মা, মা, পয়সা দাও চুল কেটে আসি।'

'হঠাৎ সাত সকালে সব কাজ ছেড়ে চুল কাটা ? এটা আবার কি খেয়াল ?'

'এই এত বড় বড় চুল নিয়ে আশ্রমে যাওয়া যায় নাকি ? সকালে সেলুন খালি থাকে, ছোট ছোট করে ছেঁটে আসি।'

'তুই তাহলে যাবি ?'

'হ্যাঁ যাবই ত।'

'তাহলে কাল খেতে বসে ও রকম করলি কেন ?'

'তোমাদের রাগাচ্ছিলুম।'

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলুম। মিনতি হাসি হাসি মুখে ঘরে এসে ঢুকল। সবে চান করেছে। চুল এলো। মশারির কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, 'জানো, বাবুর মত হয়েছে। আজই পুজো দোব। ওঠ ওঠ উঠে পড়।' মিনতি এমন করে বলল যেন কোন উৎসবের সকাল।

চা খাবার সময় মিনতি বললে, 'জানো ছেলেটাকে এই তিন দিন খুব ভাল করে খাওযাতে হবে। তুমি একটু বেশী করে মাছ এনো।'

চুল কদমছাঁট করে অপূর্ব ফিরে এল কোলে একটা কুকুরছানা। মিনতি অবাক হয়ে গেল, 'এটাকে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলি ?'

'নিয়ে এলুম মা। একজন দেবে বলেছিল। আমি ওদিকে বড় হব এটা এদিকে বড় হবে।' বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল, 'এটাও ছেলে মা, ওর নাম রেখো টম। বিলিতি কুকুর, নেড়ী ভেবো না।'

কুকুরটা ভাল করে চলতে শেখেনি। লগবগ লগবগ করতে করতে একটা কোণের দিকে চলল।

দরজার সামনে ম্লান মুখে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব বলল, 'তুই একটু দাঁড়া জগো !' ছেলেটির নাম জগো। কে এই জগো ?

মিনতি জিজ্ঞেস করল, 'এ ছেলেটি কে রে ?'

'ও খুব গরীব মা। বিশুদার চায়ের দোকানে কাজ করে।'

'এখানে কি করবে ?'

'কিছু না। ওকে আমার কয়েকটা জামা প্যাণ্ট দিয়ে দোব। আমার তো আর লাগবে না।'

'লাগবে না। কেন ?'

'ওখানে ত আর কাপ্তেনী চলবে না। বেলবটম-ফটম পরা চলবে না।'

'এখানে এসে পরবি। তুই কি চিরকালের জন্যে যাচ্ছিস ?'

'কবে আসব কে জানে। কয়েকটা ও পরুক।'

নিজের জামাকাপড় নিয়ে যে পাগল ছিল সে নিজেই হাতে করে গোটাকতক জামা-প্যাণ্ট জগোকে দিয়ে দিল। একজোড়া চটিও দান করে দিল। এ যেন সন্ন্যাসীর চালচলন ! নতুন একটা বেল্ট কিনেছিল। সেটা হাতে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, 'বাবা এই বেল্টটা তুমি নাও।'

'আমি কি করব রে ?'

'তুমি পরবে। বেশ স্মার্ট দেখাবে।' এক মুখ লাজুক হাসি, 'কি করে পরতে হয় জানোত ? ঠিক আছে, তোমাকে আজ পরিয়ে দোব।' বেল্টটা সামনের টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে ফিরে এসে সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা গেল। মা আর ছেলে মুখোমুখি বসে লুডো খেলছে। ঘন ঘন ডাইস নাড়ার কুটকুট শব্দ। মিনতির কোলে কুকুরটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। অপূর্ব মহা উৎসাহে বললে, 'জানো বাবা, মাকে কেটেকুটে ভুটিনাশ করে দিলুম। তুমি একটু বসবে হাত মুখ ধুয়ে।'

মিনতির জায়গাটা আমি নিলুম। তুলতুলে নরম গরম কুকুরছানাটা আমার কোলে চলে এল। দু হাত দূরে আমার মুখোমুখি বসে আছে আমার ছেলে।

'তুমি আজ খেলতে যাওনি ?'

'না।'

'কেন ?'

'আর কি হবে ? আমি ত চলেই যাব। আবার কবে আসব, তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাই।'

খেলছি, চাল দিচ্ছি, মনটা কিন্তু ভারি হয়ে আসছে। বাড়িটা শূন্য হয়ে যাবে। মা মা ডাক, তেড়ে ফুঁড়ে ওঠা, সব স্তব্ধ হয়ে খাঁ খাঁ করবে।

খাওয়া দাওয়ার পর অপূর্ব বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করে গেল। কত রকমের গল্প। ওর বন্ধুবান্ধবদের কথা, তাদের বাড়ির কথা। একবার অভিনয় করেছিল ক্ষুদিরাম, সেই অভিনয় রজনীর কথা। একদিন আমি ওকে খুব মেরেছিলুম সেই কথা। ছেলেটা হঠাৎ যেন একেবারে পাল্টে গেছে। পাল্টেই যখন গেল তখন কেন দূরে পাঠাচ্ছি ? আর ত ফেরা যায় না। সব ব্যবস্থাই পাকা। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

এক সময় মজলিশ ভেঙে গেল। নিস্তব্ধ বাড়িতে ঘড়ির শব্দ প্রখর হয়ে উঠেছে। আলোগুলো জোর জোর হয়ে জ্বলছে।

সাত

ভোর রাতে আমরা দুজনে স্টেশনে নামলুম। এদিককার হাওয়ায় এখনও শীতের ভাব।

'একটা মাফলার আনলে ভাল হত অপূর্ব।'

'ও কিচ্ছু হবে না বাবা। তুমি সুটকেশটা আমার হাতে দাও।'

'না গো। তোমার হাতে ত বেডিংটা রয়েছে। ওটা বেজায় ভারি।'

'তুমি দুটোকেই আমার মাথায় চাপিয়ে দাও না।'

'ধ্যার পাগল।'

একটা সুবিধে স্টেশনের গায়েই আশ্রম, ছাত্রাবাস, বিদ্যাভবন। ভোরের আলোয় বেশ লাগছে। ট্রেনে সারাটা রাত বড় অস্বস্তিতে কেটেছে। বিদায়ের

মুহূর্তটা বড় বিষণ্ণ ছিল। ছেলের মাথায় হাত রেখে মার চোখে জল। মিনতি এমনিতে বেশ কঠোর মহিলা, তবু মা ত। এই চোদ্দটা বছর একদিনের জন্যেও ছেলেকে কাছছাড়া করেনি। হঠাৎ বিচ্ছেদ। চোখের পলক পড়ছে না, শুধু ফোঁটা ফোঁটা জল। ছেলে মাকে বলছে, 'তুমি কেঁদো না ত। চিয়ার আপ মাদার। কই দেখ ত আমি কাঁদছি? আমি কত বীর।'

ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল ট্রেনটা হারিয়ে গেল। স্টেশনের এপাশ ওপাশ দুপাশই দৃশ্যমান এখন। অপূর্ব বললে, 'জায়গাটা ভালই। কি বল বাবা?'

'তাই ত মনে হচ্ছে রে!'

'তুমি মাকে গিয়ে বলো, জায়গাটা বেশ ভাল।'

এগোতে এগোতে স্টেশানের চারপাশের ঘিঞ্জি ভাবটা কেটে গেল। ফাঁকা ঢেউ খেলানো মাঠ। বেঁটে বেঁটে গাছ। পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ছবির মত দৃশ্য। আশ্রমের গেট খোলাই ছিল। মন্দির থেকে সমবেত প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। মন্দ লাগছে না। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। যাক ছেলেটার মনের প্রসার ঘটবে। শহরের ঘুপসি জীবন থেকে মুক্ত হয়ে বিশালের মুখোমুখি। নিজের অপরাধ বোধ খানিকটা কেটে গেল। না ভাল সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

আশ্রমের মহারাজ অফিস ঘরে একটা চৌকির ওপর পা মুড়ে বসেছিলেন। স্নান হয়ে গেছে। বিশাল গম্ভীর মূর্তি। হাতে জপের মালা ঘুরছে টকটক করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও কথা বলেন না। সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রসম্মত আচরণ, না পৃষ্ঠ কশ্চিৎ ব্রুয়াত। গৃহী মানুষদের প্রতি কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের ভাব। সংসার কূপে পড়ে আছে কামিনী কাঞ্চনের দাস।

অপূর্ব চলে গেল ছাত্রাবাসে! আমার স্থান হল গেস্ট হাউসে। কতক্ষণই বা থাকব। একটা দিনের মামলা। গেস্ট হাউসে বসে থাকতে থাকতে মনে হল, এক সময় প্রথম পুত্রকে মানত করে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়া হত, আমি আমার প্রথম পুত্রকে বিশাল একটি প্রতিষ্ঠানের গহ্বরে নিক্ষেপ করে গেলুম। ক্রমশ দূর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। পরিচিত থেকে অপরিচিত। সমাজে চলতে গেলে পিতামাতার পরিচয় দিতে হয়, একদিন অপূর্ব সেই ভাবেই আমাদের পরিচয় দেবে। অমুক আমার বাবা তমুক আমার মা। সেই আকর্ষণ আর থাকবে না, সেই স্নেহের টান, সেই আবেগ। যাকগে যা হয় হবে।

সারাদিনে বারকতক দূর থেকে অপূর্বকে দেখলুম। অভয়ারণ্যে ট্যুরিস্টরা যেমন দূর থেকে হরিণের পাল দেখে। একবার দেখলুম কলের কাছে থালা আর গেলাস ধুচ্ছে। আর একবার দেখলুম একটা চেয়ার মাথায় করে একতলা থেকে দোতলায় উঠছে। এখানে মায়ের স্নেহ নেই, বাবার প্রতিরক্ষা নেই। কঠিন শাসনের নিয়মে বাঁধা পরিবেশ। আমরা যখন আরামে নরম বিছানায় শুয়ে থাকব অপূর্ব তখন কাঠের চৌকিতে পাতলা তোশকের ওপর। আমরা যখন বড় বড় মাছের দাগা খাব অপূর্ব তখন বিউলির ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট

দিয়ে ভাত চটকাবে। হঠাৎ অসুখ হলে মাথার কাছে মা বসে থাকবে না। কি সুন্দর জীবন শুরু হল। মহারাজ আবার বলে দিলেন, 'বেশী আসবেন না, বেশী চিঠি দেবেন না, কথায় কথায় বাড়ি পাঠাবার অনুরোধ করবেন না। ছেলের মন ছিটকে যাবে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে।'

সন্ধ্যের দিকে অপূর্ব আমার কাছে এল। হাতে এক গেলাস দুধ, কাগজে মোড়া দুটো সন্দেশ।

'বাবা, এইটা তুমি চট করে খেয়ে নাও। আমি জানি দুপরে তুমি কিছুই খেতে পারনি। রাতেও পারবে না।'

'কেন রে ?'

'একেই তুমি কম খাও। তার ওপর এই রকম খাবার তুমি জীবনে খাওনি।'

'এ দুধ কোত্থেকে পেলে ?'

'আমাকে দিয়েছিল।'

'সন্দেশ ?'

'আমার কাছে কিছু পয়সা ছিল উল্টোদিকের দোকান থেকে তোমার জন্যে কিনে আনলুম। বেশ বড় বড় খেয়ে দেখ বাবা।'

'তুমি খাও। সারাদিন তোমারও খাওয়া হয়নি। বাড়িতে এতক্ষণে তোমার বার পাঁচেক খাওয়া হয়ে যেত।'

'তোমার জন্যে এনেছি খেতেই হবে।'

'আচ্ছা আমরা একটু আশ্রমের বাইরে যেতে পারি না !'

'অনুমতি নিতে হবে গো।'

মহারাজ মাঠে পায়চারি করছিলেন। অনুমতি পেতে অসুবিধে হল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে চলে গেলুম। গ্রাম গ্রাম, শহর শহর ভাব। হাটতলা। ভাঙা পাইস হোটেল। বেশ বড় একটা মিষ্টির দোকান পাওয়া গেল। গরম রসগোল্লা কড়ায় ফুটছে। আমার পেটুক ছেলের নজর সেই দিকেই। বেঞ্চিতে বসে গোটাকতক বাপ বেটায় সাবড়ে দিলুম। মনে হল আমরা সপরিবারে পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে এসেছি। কিছুতেই ভাবতে পারলুম না অপূর্বকে রেখে একা ফিরে যেতে হবে। যেমন করে সংসার ফেলে মানুষ পরলোকে চলে যায়। ফেরার পথে আমরা দুজনে একটা সাঁকোর ওপর বসলুম। দুপাশে চাষ ক্ষেত। আকাশে কয়েক লক্ষ জ্বলজ্বলে তারা। কি একটা পাখি কটর কটর শব্দ করছে। মাটির গন্ধ মাখা হালকা হাওয়া। আমাদের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে। বসে থাকতে থাকতে অপূর্ব বললে, "মা এখন কি করছে কে জানে। সেদিন আমরা কেমন লুডো খেললুম। মার হাতে একদম ছয় পড়ে না।'

'কেমন লাগছে তোমার জায়গাটা ?'

'ভীষণ ফাঁকা তাই না।' আকাশের আলোয় ছেলেটার চোখ দুটো চিকচিক করছে। জল নয় ত ?

আশ্রমে ফিরে এলুম। অপূর্ব বললে, 'তুমি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পোড়ো, পাঁচটায় বাস, তোমাকে ডেকে দোব।'

অন্ধকারে অপূর্ব হাবিয়ে গেল।

আট

বাসেই ফিরব ঠিক করেছি। আশ্রমের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক পাঁচটার সময় বাস আসবে। অপূর্বর মুখচোখ দেখে মনে হল রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

'বাবা তোমরা মাঝে মাঝে আসবে ত ?'

'বাঃ আসব না! প্রায়ই আসব।'

'চিঠি দেবে ?'

'নিশ্চয় দোব। তোমার কাছে পোস্টকার্ড আছে নিয়মিত চিঠি দিও।'

'ওই যে বাস আসছে। বাবা, মাকে বোল কুকুরটাকে সময় মত খেতে দিতে।'

'হ্যা গো, তোমার কুকুর যত্নেই থাকবে।'

বাসে উঠে জানালার ধারে বসলুম। অপূর্ব জানালার কাছে সরে এসেছে। আমার হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। হাতে হাত ঠেকাল। বাস ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

'সাবধানে থেক।'

বাসের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ছুটছে। বাসের গতি বাড়ছে অপূর্বরও গতি বাড়ছে। কি করতে চাইছে ছেলেটা ? পড়ে যাবে যে! কতক্ষণ ছুটবে এই ভাবে! হাত নেড়ে নিষেধ করলুম তাও শুনছে না।

'কনডাকটার বাসটা একটু থামাও ত ভাই।'

উঠে পাদানিতে নেমে দাঁড়ালুম। অপূর্ব একটু পিছিয়ে পড়েছিল, ছুটতে ছুটতে কাছে এল।

'তুমি কিছু বলবে ?'

'না ত।'

'তবে ছুটছ কেন ?'

'আমি ত একজন স্পোর্টসম্যান, তোমাকে দেখিয়ে দিলুম আমি কি রকম ছুটতে পারি।'

দু চোখের জল টল টল করছে। ঘণ্টা বাজিয়ে বাস ছেড়ে দিল। অপূর্ব স্তব্ধ হয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চিৎকার করে বললুম, 'তুমি এবার সাবধানে ফিরে যাও।' দুজনের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। আমিও চোখে ঝাপসা দেখছি। হঠাৎ বাস একটা বাঁক নিল। পাদানি থেকে উঠে এসে আমার আসনে বসে পড়লুম।

বাঁদিকে মাঠ ফুঁড়ে সূর্য উঠছে।

সরষে

'আমি অনশন করব, আমৃত্যু অনশন।'

সকালের চায়ের কাপ হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন প্রকাশবাবু। নাটকের ঘটনাস্থল কলকাতার উপকণ্ঠে, মধ্যবিত্ত পাড়ার সদ্যনির্মিত একটি বাড়ির দোতলার ঘর। পশ্চিম খোলা। জানালায় আকাশ, পরিমিত গাছপালা। দুএকটি বাড়ি। গোটা কতক পায়রা। চরিত্র দুটি প্রাণী। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত, ডাকসাইটে শিক্ষক প্রকাশ মুখোপাধ্যায়, আর তাঁর স্ত্রী মহামায়া মুখোপাধ্যায়। বিবাহের আগে ছিলেন চট্টোপাধ্যায়। কাপ থেকে চা ছলকে ডিসে পড়ল। আর একটু জোরে ঠেললে মহামায়ার হাতের তৈরি, নীলের ওপর সাদার কাজ করা টেবিল ক্লথে পড়ত। সেই সম্ভাবনায় মহামায়ার ভুরু কুঁচকে ছিল। মনে মনে প্রস্তুতও ছিলেন, একটু পড়ুক, তারপর কি করতে হয়, আমিও দেখাব। সাতদিন হয়ে গেল বাতের ব্যথায় উঠতে বসতে পারছি না। ডাক্তারের কথা, ওষুধের কথা বলে বলে মুখে ফেকো পড়ে গেল। একদিন নিয়ে এলেন ট্যাপা ট্যাপা একগাদা রসুন। এক-কোষী রসুন রোজ সকালে একটা করে জল দিয়ে কোঁত্ করে গিলে ফেল মায়া, সাতদিনে তোমার বাত বাপ বাপ করে পালাবে। আর একদিন নিয়ে এলেন ইয়া মোটা এক স্টিলের পাঞ্জাবী বালা। এটি মায়ের নাম করে ধারণ করে ফেলো মহামায়া, বাত তো ভালো হবেই, দেখবে যৌবনও ফিরে আসছে আবার। শেষে নিয়ে এলেন হাত তিনেক ইলেকট্রিক তার। কোমরে আড়াই প্যাঁচ মেরে বসে থাকো মায়া, প্রথম বর্ষার প্রথম বিদ্যুতেই অ্যাকসান পেয়ে যাবে। শরীরে কয়েক ওয়াট কারেন্ট ঢুকলেই তোমার হাত-পায়ের গাঁট খুলে যাবে, যৌবনকালের মত সারা বাড়ি ধুম্‌ধুম্ করে আবার দাপিয়ে বেড়াবে। কেপ্‌পন অনেক দেখছি বাবা, এই মানুষটার মত এমন হাড় কেপ্‌পন আমি দেখি নি।

মহামায়া ভারিক্কি গলায় বললেন, 'চাটা ছলকে টেবিল ক্লথে পড়ে গেলে কি হতো?'

আকাশের দিকে ফেরানো মুখ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'যেতো, যেতো।'

'সাত সকালে বাবারে মারে করতে করতে চা করে নিয়ে এলুম, উলটে ফেলে দেবার জন্যে! যত বয়েস বাড়ছে, তত তোমার রাগ বাড়ছে। ছেলে মেয়ে, বউমা এই নিয়ে হাসাহাসি করে, তোমার প্রেসটিজে লাগে না?'

'না, লাগে না। ওরা হাসার জন্যে, ব্যঙ্গ করার জন্যে জন্মেছে; আমি

জন্মেছি সেই উপহাস আর ব্যঙ্গ কুড়োবার জন্যে। যুগটাই তো পড়েছে, বাপ-জ্যাঠার কাছা খোলার যুগ। অপমান আমার নয়, অপমান ওইসব চপল বালক-বালিকার। যাদের জীবন্‌টাই হলো অনন্ত, অখণ্ড, অপার, অপরিমেয়, অনিয়ন্ত্রিত, অলস তামাসার।'

পরপর একগাদা অকারান্ত শব্দ শুনে মহামায়া বললেন, 'বাপ্‌স। রাগের চোটে মুখ দিয়ে অমরকোষের স্রোত বইছে। নাও খুব হয়েছে, চা খেয়ে নাও। ছেলেমানুষের মত্‌ কথায় কথায় অত ক্ষেপে যাও কেন?'

প্রকাশ এবার জ্বলন্ত মুখ ঘোরালেন, 'নো মোর সুগার কোটেড ওয়ার্ডস ম্যাডাম, মিষ্টি কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না, জল চাই, জল। এতকাল যে ট্যাকটিক্‌সে বোকা বানিয়ে এসেছো, সে কায়দায় আর বোকা বানানো যাবে না। বোকারাও ধাক্কা খেতে খেতে একদিন বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, তখন আর তাকে বোকা বানানো যায় না, তখন নিজেকেই বোকা বনে যেতে হয়। কথা যত কম হয় ততই ভালো। তোমাদের সব কটাকে আমি চিঁনে নিয়েছি। সব শেয়ালের এক রা।'

'আমরা কি করলুম যে শেয়াল-টেয়াল বলছ?'

'এই সংসারে আমি এখন উপেক্ষিত। এ নেগলেকটেড ওল্ড ফুল। আমার কোনও স্ট্যাটাস নেই। আমি গৃহপালিত দিশি কুত্তার মতো।'

'আঃ, কি যা তা বলছ?'

'ঠিকই বলছি, ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। তোমরা যেই দেখলে, বুড়ো ব্যাটার লাস্ট ফার্দিং বাড়ি তৈরিতে খরচ হয়ে গেছে, রেস্তো টুঁ টুঁ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্‌স নীল, মরলে একজোড়া চশমা, আর ছেঁড়া একজোড়া চপ্পল ছাড়া আর কিছুই ব্যাটা রেখে যাবে না, তখনই তোমরা সব নিজমূর্তি ধরলে। ক্যাপসুল খুলে গেল। ঠিকই করেছ। জগতের নিয়মেই চলছ। প্রত্যাশা থেকেই মানুষের হতাশা আসে। মনের আর দেহের জোর থাকলে বানপ্রস্থে চলে যেতুম। এতকাল ধরে বোকাটাকে কুরে কুরে খেয়েছ, জ্ঞান যখন হলো তখন বোকা দেখলে ছোবড়াটা পড়ে আছে। নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। চোখে চালসে, হাত-পা কাঁপছে। পড়ে পড়ে মার খাও। বাঁধা মার। সাংখ্য কি বলছেন জানো, জীব তিন ধরনের দুঃখ পায়, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখের কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়, আর...।'

'তোমাদের সাংখ্যে গোলি মারো। সারাদিন ওই ছাইপাঁশ পড়ে পড়ে মাথাটি একেবারে গেছে। একদিন সব আগুন লাগিয়ে দেবো, আপদ চুকে যাবে।'

'বাঃ চমৎকার মাস্তানী ভাষা শিখেছ তো। একজন অবসরপ্রাপ্ত, সম্মানিত, জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত প্রধান শিক্ষকের স্ত্রীর ল্যাংগোয়েজ দেখো। আমাকে জুতো মারা উচিত। আমার গলায় যাঁরা পদক ঝুলিয়েছিলেন, তাঁদের বলো, এবার এসে জুতোর মালা ঝুলিয়ে দিয়ে যাক। যে নিজের বাড়িকে শিক্ষিত করতে পারল না, সে সারাটা জীবন উৎসর্গ করে গেল দেশের শিক্ষায়। অপদার্থ পাঁঠা।'

'আমি অত কথা শুনতে চাই না, তুমি চা খাবে কিনা ?'

'না, খাবো না। আমি খ্যাচখ্যাচি করতে চাই না, নাকে কাঁদতে চাই না, আমি সবেকপন্থী শান্তিপ্রিয় মানুষ, আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত। তুমি এখন যেতে পারো। যাবার সময় তোমাদের এই হতচ্ছেদ্যার পিঁপড়ে ভাসা, সর ভাসা, কেলে গামছা নিঙড়োনো গরম জলটা নিয়ে যাও।'

মহামায়া চেয়ার ছেড়ে উঠে চায়ের কাপের সামনে ঝুঁকে পড়লেন, তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'কোথায় তোমার পিঁপড়ে আর সর ! দেখাও তো ! আর বর্ণ ? এমন সোনার বর্ণ চা তোমাকে গ্র্যান্ড হোটেলও দিতে পারবে না। না দেখেই, ধেই ধেই নাচ। সারা জীবন ছাত্র ঠেঙিয়ে...।'

প্রকাশ স্ত্রীকে কথা শেষ করতে দিলেন না, নিজেই টেনে নিলেন, 'গাধা হয়ে গেছি, গাধা। ধোপার গাধা হলে তবু পরিত্রাণের পথ ছিল, স্ত্রীর গাধা হয়ে মরেছি। ইহকাল, পরকাল দুটোই গেল।'

'আমি তোমাকে গাধা বলেছি ?'

'ওই কথার পর অবধারিত ওই কথাই আসে। আমার বয়স হয়েছে, ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না।'

'দ্যাখো, সকাল বেলা শুধু শুধু ঝগড়া কোরো না। কোথায় তোমার পিঁপড়ে আর সর। তুমি দেখাও।'

প্রকাশ চশমা পরে চায়ের কাপ সামনে টেনে নিয়ে প্যাথোলজিস্টের মতো চা পরীক্ষা করতে লাগলেন। মহামায়া বিজয়িনীর মত হাসছেন, 'পাবে না, পাবে না, ব্যর্থ চেষ্টা।'

প্রকাশ বললেন, 'ছিল, থাকতে থাকতে গলে গেছে।'

'গলে গেছে ?' মহামায়া ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

'হেসো না, হেসো না। ডোন্ট লাফ। আজ হয় তো নেই ভাগ্যক্রমে, অথবা ছিল, অন্যদিন গোটা কতক পিঁপড়ের লাশ, বাসী দুধের সর থাকবেই থাকবে। বুড়োর ব্রেকফাস্ট।'

'অন্যদিনের কথা আমি জানি না। বউমা কি করে আমি বলতে পারব না।'

'অ, তোমার বউমা তাহলে যা খুশি তাই করতে পারে ! সাত খুন মাপ,'

'আঃ, কেন পরের মেয়েকে মিথ্যে মিথ্যে দোষী করছ ?'

'অ, আমি হলুম মিথ্যেবাদী, আর তুমি হলে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। এ সংসারে তোমরা দলে ভারি বলে দিনকে রাত করবে ?'

'বউমা তোমার যথেষ্ট সেবা করে। শ্রদ্ধা করে। ভয়ও করে। কেন পরের মেয়ের নামে মিথ্যে বল সব !'

'আমি অন্যের সেবা নেবো কেন ? তুমি আমার জন্যে কি করো ? এই বেওয়ারিশ বুড়োর জন্যে !'

'আমি কিছু না করলে এতদিনে ভেসে যেতে।'

'তার মানে তোমার আদরের বউমা কিছু করে না!'

'উঃ, আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল তো। এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা। তুমি কি আগুন জ্বালাতে চাচ্ছ, শুধু শুধু অকারণে?'

আগুন-টাগুন নয, আমার পথ শান্তির পথ। আমরণ অনশন। ধীরে ধীরে নিবে যাওয়া। অনেকদিন এসেছি মহামায়া। পুরনো হয়ে গেছি। গরুর দুধ চলে গেলে গোয়ালা কসাইখানায় দিয়ে আসে। তখনও তার দুপয়সা কামাই হয়। দুর্ভাগ্য তোমার, আমি গরু নই।'

'হোল ফ্যামিলি তোমার জন্যে তটস্থ তবু তোমার মন যায় না। এরপর আমাদের আর কিছু বলার নেই।'

'অই, অই সেই শব্দ। আমাদের, তার মানে তোমরা একটা দল, অনেকটা একালের মাস্তান পার্টির মত। আর আমি হলুম গিয়ে একা মাইনরিটি। শাসনের নামে দুঃশাসন চলেছে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। লাশ পড়ে যাবে। মেজরিটি যা করবে সব মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। নইলে তুমি খিটখিটে বুড়ো, একল ষেঁড়ে, বাহাত্তুরে ধরেছে, চিরকালের স্বার্থপর। দে বেটাকে একঘরে করে। ধোপা নাপিত সব।'

মহামায়া হাত পা নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'মাস্টার না হয়ে তোমার উকিল হওয়া উচিত ছিল। নাম করতে পারতে, দুটো পয়সার মুখও দেখা সম্ভব হতো। আমরা মানে, আমরা যারা তোমার সেবা করছি।'

প্রকাশবাবু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'সেবা? তোমরা আমার সেবা করছ! গোপাল সেবা? সিংহাসনে একবার করে ওঠাচ্ছ আর শোয়াচ্ছ। শালগ্রামের শোয়াও যা বসাও তাই। বোঝার উপায় নেই, বসে আছি না শুয়ে আছি। যুগ যুগ জিও।'

'এটা কি ভাষা?'

'যুগের ভাষা।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝলে? সব নাট-বল্টু ঢিলে হয়ে গেছে। সারা জীবন ছাত্র ঠেঙালে ওই রকমই হয়।'

'কি হয়—গাধা?'

'সে কথা বলেছি?'

'সব কথা কি আর বলতে হয়। বলার আগেই বুঝে নিতে হয়।'

'এ বুড়োটা তো মহা ঝগড়াটে।'

'অ, আমি এখন বুড়ো, আর নিজে ভারী যুবতী? যৌবনে শরীর একেবারে মাখামাখি।'

মহামায়া রাগে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন, 'চা খেতে হয় খাও, না খেতে হয় ফেলে দাও। সাত সকালে এই হুলো বেড়ালের মত ঝগড়া আমার ভালো লাগে না। বয়েস বাড়ছে না কমছে?'

বাতের ব্যথা ভুলে মহামায়া দুম দুম করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। নাতিটা দালানের একপাশে পুতুল নিয়ে খেলছিল। দিদাকে দেখে বললে, 'একটু চুন-হলুদ করে দেবে দিদা, আমার এই গুণ্ডা ছেলেটা পা মচকে ফেলেছে।'

অন্যদিন হলে কোলে তুলে নিতেন, আজ মেজাজ ভালো নেই, বললেন, 'তোমার মামীকে বলো।'

নাতি আপন মনেই বললে, 'বাবা, মেজাজ একেবারে টপ।'

ছেলে দাড়ি কামাচ্ছিল, মহামায়া বললেন, 'তোর বাবা সকাল থেকেই অনশন শুরু করলেন, আমৃত্যু।'

'বাবা! গান্ধী রিলিজ হতে না হতেই সত্যাগ্রহ? কিসের দাবিতে অনশন?'

'ওঁকে নাকি আমরা সবাই উপেক্ষা করছি। কুকুর বেড়ালের চেয়েও অধম জ্ঞান করছি।'

'বৃদ্ধরা একটু অভিমানী হয় মা। কি করেছিলে?'

'কি আবার করব?'

'কোনও খোঁচাখুঁচি করোনি তো?'

'না রে বাবা, দুর্বাসা মুনিকে খোঁচাতে হয় না, পান থেকে চুন খসলেই তেলে বেগুনে।'

'ঠিক আছে। তুমি আর নাড়াচাড়া করতে যেও না, আমি যাচ্ছি। এই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নিয়েই হয়েছে সমস্যা।'

'বাড়ির যা অবস্থা, ওটাকে এখন নামিয়ে দে না বাবা।'

'তোমার মা তিলকে তাল করা অভ্যাস। বৃদ্ধদের হ্যান্ডল করার আলাদা কায়দা আছে। অনেকটা ট্রানজিস্টার রেডিওর মত, শুধু টিউনিং নব ঘোরালেই হয় না। ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করতে হয়।'

'যাও তাহলে। এখন দক্ষিণমুখো বসে আছেন, পুব কি পশ্চিমমুখো করে দ্যাখো।'

'বলেছো ভালো। এবারে পুজোয় পশ্চিমে নিয়ে যাবো, সেই কথাটাই বলি। হয়তো চিত্ত প্রফুল্ল হবে।'

প্রকাশবাবুর বড় ছেলের নাম প্রশান্ত। বড় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজিকিউটিভ। দু এক মাসের মধ্যে রাশিয়া যাবার কথা আছে। তাই চিবুকের তলায় দাড়ির চাষ করছে, সযতন সম্পাদনায়। দাড়ির একটা আলাদা অ্যারিস্টোক্র্যাসি আছে। সেকালের জারেদের দাড়ি ছিল, একালের পলিটিস্যানদের থাকে। টলস্টয়ের দেশে দাড়ি ছাড়া যাওয়া যায়! প্রশান্তর সবে বিয়ে হয়েছে। স্ত্রীর নাম ঊর্মিলা। মিষ্টি স্বভাবের সুন্দরী মেয়ে। প্রকাশবাবুরই নির্বাচন। পুত্রবধূ পাশে পাশে, কাঁধে কাঁধে থাকবে, মিহি মিহি হাসবে, বাবা বাবা করবে, প্রকাশবাবুর মনে এইরকম একটা চাপা বাসনা ছিল। তা সংসার বধূটিকে গ্রাস করে ফেলেছে। সারাদিনে বার কয়েক দেখা হয়। জমবার আগেই মহামায়া

নামক পরম শত্রুটি ডেকে সরিয়ে নেয়। সম্প্রতি হোমিওপ্যাথির চর্চা শুরু করেছেন। রুগী তেমন আসে না। খুঁজে খুঁজে বের করেন। স্ত্রী মহামায়ার হোমিও ধরবে না। পান-দোক্তা খেয়ে খেয়ে সিস্টেমটাকে চড়িয়ে ফেলেছে। হোমিওপ্যাথির জন্যে নরম, সাত্ত্বিক জমি চাই। যুধিষ্ঠির জীবিত থাকলে আদর্শ রুগী হতে পারতেন। এক পুরিয়া ওষুধে পাশা খেলার নেশা ছুটে যেত। অতবড় কুরুক্ষেত্র আর হতো না। মহাভারত লেখা হতো অন্যভাবে। ভীমকে আর একটু রোগা করে দিতেন। অর্জুনের নার্ভাস-ব্রেকডাউন সেরে যেত বায়োকেমিকে। কৃষ্ণ বড় টকেটিভ ছিলেন, মনে-হয় ডিপ্রেসানে ভুগতেন, তারও ওষুধ ছিল। দুর্যোধন, দুঃশাসন ছিলেন ওভার সেক্সড। এক ডোজ মাদার টিংচার ছাড়লে দ্রৌপদী বেচারার ওই অবস্থা হতো না। গান্ধারীকে দিতেন বার্থ কনট্রোলের দাওয়াই। হ্যানিম্যান সায়েব যে বড় দেরিতে জন্মালেন। ভেবেছিলেন পুত্রবধূটিকে মনের মত রুগী তৈরি করবেন, তা আর হলো না। আজ পর্যন্ত একবারও ফ্যাঁচ করে হাঁচল না। বিয়ের জল পড়ে বরং...না থাক, ওসব কথা না ভাবাই ভালো। কন্যাসমা।

এখন একমাত্র সম্ভাবনাপূর্ণ রুগী মেয়ের ছেলে, ওই নাতিটি। একমাত্র রোগ পেটের গোলমাল। এন্তার খাচ্ছে আর হজমের গোলমালে সব এলোমেলো করে ফেলছে। এ রুগীও বেশি দিনের নয়। গরমের ছুটি শেষ হলেই মীরাটে পালাবে।

প্রকাশবাবু হাঁক মারলেন, 'বুড়ো।'

বুড়ো এই ডাকটির অপেক্ষাতেই ছিল। ছেলে এই বয়সেই অনেক কথা শিখেছে। দু'পক্ষ জোরে জোরে কথা হলে বলে, খিচাইন হচ্ছে। দাদু আর দিদা এতক্ষণ জোরে জোরে কথা বলছিল বলে ঘরে ঢোকেনি। এখন পুতুলটিকে বুকে চেপে ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল, 'কি বলছ দাদা?'

'এদিকে এসো।'

'তুমি কি খুব রেগে আছ?'

'তা একটু আছি।'

'তাহলে পরে আসব।'

'কেন?'

'এখন তো তুমি কিছু দেবে না।'

'অ, পৃথিবীতে কেবল দাও আর দাও, তাই না বুড়ো? শুধু দাও, কেবল দিয়ে যাও। আচ্ছা, তোমাকে আর কোনওদিন আসতে হবে না, মায়া, মায়া, সব মায়া!'

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রকাশবাবু তিনবার টুসকি মারলেন। একসময় অল্পস্বল্প সংগীতচর্চা করতেন। গুনগুন করে গান ধরলেন, ভিখারী বাসনা করি হইতে চায় লক্ষপতি, লক্ষপতি হলেও সে হইতে চায় কোটিপতি। আরও দু'চার লাইন এগোতো, ছেলে প্রশান্ত ঘরে ঢুকে ভাব চটকে দিল। এই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা

প্রকাশবাবুর অসহ্য লাগে। রাখতে হয় পুরো রাখো ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মত, নয়তো মেরে সাফ করে দাও। এ কি ধরনের ক্ষৌরী!

যাক, মুখ নিচু করে থাকাই ভালো। সংসারের কোনও কিছুর দিকে আর তাকাবেন না। প্রতিজ্ঞা। গীতা বলছেন, উদাসীনবদাচরেত। পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে প্রশান্তবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। গানের পরের লাইনকটা মনে ভাসছে, কোটিপতি হলেও সে ইন্দ্রত্ব লভিতে চায়।

প্রশান্ত এক গাল হেসে বললে, 'কি, মর্নিংওয়াকে যাচ্ছেন?'

কানের পাশে সাবান শুকিয়ে আছে। নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা দুটো খুসকি উড়ে যাচ্ছে। দাড়ির যত বাড়বাড়ন্ত চুলের ততটা নয়। সামনের দিকে পাতলা হয়ে এসেছে। শ্যাম্পু করে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রশান্তর দেহগত নানা ত্রুটি আজ পিতার চোখে ধরা পড়ছে। স্বার্থপরের মত নেওয়াপাতি একটি ভুঁড়ি নামছে। আলোচাল খাওয়া বিধবাদের মত চোখমুখ ফুলো ফুলো। ভোগীর চেহারা। এ চেহারা ত্যাগীর নয়।

প্রকাশবাবু কাটা কাটা গলায় বললেন, 'কেন, বলো তো? বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে তোমাদের সুবিধে হয়?'

প্রশান্ত হকচকিয়ে গেল। স্নিগ্ধ প্রাতঃকাল, পাখি ডাকছে। দিবসের এই সময়টিতে কারুর মেজাজ এমন উত্তপ্ত হয়ে থাকলে পরিবেশের সঙ্গে মেলে না। আমতা আমতা করে বললে:

'আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন।'

'তোমার ধারণা বুঝি সেই রকম। নিজেকে ঠিক মত চেনো কি? কখনও অ্যাসেস করে দেখেছ? দেখার চেষ্টা করেছ কোনও দিন! পার্সেন্টেজ অফ স্বার্থপরতা কত, উদাসীনতার পার্সেন্টেজ কত, লোভ কত, লালসা কত, ভণ্ডামি কত! সময় পেলে একবার খতিয়ে দেখো।'

কথা শুনে প্রশান্তর পা থেকে মাথা অবদি জ্বলে উঠল। আশ্চর্য! ভদ্রলোক অকারণে খোঁচা মারছেন। খেতে একটু ভালবাসি। সে আসক্তি তো ওঁরও ছিল। এখনও আছে। লালসা? সে বস্তুটা কি? মানেটা ঠিক জানা নেই। অভিধান দেখতে হবে। স্বার্থপরতা? স্বার্থপরতার কি দেখলেন? দক্ষিণের ঘরটা তো নিজেই ছেড়ে দিলেন। পশ্চিমের ঘরে সব তুলে নিয়ে এলেন। কারুর কথা শুনলেন না। এখন সারা দুপুর রোদের তাপে কষ্ট পান? শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, লোডশেডিং অর নো লোডশেডিং আমার সেই এক অবস্থা। পাখার বাতাস যেন ব্লাস্টফার্নেসের ঝাপটা। ভণ্ডামি? ভণ্ডামি মানে? তিলক সেবা করে কীর্তনও করি না, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা এঁকে ববম্-ববম্ হুঙ্কারও ছাড়ি না।

প্রশান্ত রাগ রাগ গলায় বললে, 'আপনি অকারণে আমাকে তিরস্কার করছেন। আমাকে যতটা ঘৃণিত ভাবছেন, আমি ঠিক ততটা ঘৃণিত নই।'

'না না, ঘৃণিত হবে কেন? তুমি যথেষ্ট সম্মানিত, বড় চাকরি করো,

মোটা টাকা মাইনে পাও। তুমি আধুনিক যুগের একজন সম্মানিত, অতিসম্মানিত সফল মানুষ। আরও উঠবে, আরও ওপরে উঠবে। তোমার গাড়ি হবে, তোমার বাড়ি হবে। হয় তো পদ্মভূষণ খেতাবও পেয়ে যাবে। তোমার সুন্দরী স্ত্রী অহঙ্কারে মট মট করবে। তবে একটা কথা কি জানো, কেউ কেউ তোমাকে স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ উদাসীন ভাববে।'

'সেই কেউয়ের মধ্যে অবশ্যই আপনি একজন।'

'আমার ভাবায় কি এসে যায় প্রশান্ত? আমার সব দুধ সংসার দুয়ে নিয়েছে। শুকনো গরু গোয়ালে পড়ে আছি। দুবেলা দুটি জাবনা পাই। চারপেয়ে গরু হলে কসাইখানায় দিয়ে আসতে। তা যখন পারলে না, তখন অবহেলা, অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা, অবমাননা দিয়ে, এক-এক দিনে একশো দিনের পথ এগিয়ে দিচ্ছ। সেই মহাকসাইখানার দিকে হু হু করে ছুটে চলেছি।'

'এ সব কথা আপনি বলতে পারছেন?'

'অবশ্যই পারছি।'

'উপেক্ষা? আপনাকে আমরা উপেক্ষা করি? অপমান করি?'

'মজাটা কি জানো প্রশান্ত, তোমরা এতই উদাসীন, কি করো তা বোঝবার মত তোমাদের বোধশক্তিও নেই। একটা উদাহরণ দেবো?'

'নিশ্চয় দেবেন।'

'আজ থেকে সাতদিন আগে তোমাকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনতে বলেছিলুম। মনে পড়ছে? তুমি সে ওষুধ এনেছিলে?'

প্রশান্ত করুণ মুখে বললে, 'আজ্ঞে, সাত কাজে ভুলে গেছি।'

'অবশ্যই ভুলে যাবে। ভুলতে তোমাকে হবেই। তুমি যে আমার পুত্র। তোমাকে আমি পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি। কিন্তু তোমার বউ যদি কিছু আনতে বলত, তুমি ভুলতে না, ভুলতে পারতে না। সারা দিন জপ করতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে।'

'আপনার এ ধারণা ঠিক নয়। আমার ভুলো মন। একটা কাজ সাতদিনের চেষ্টায় করি। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।'

'রাইট ইউ আর। আমি জানতুম তুমি ওই ফাঁক দিয়েই গলতে চাইবে। মহাঅস্ত্র তোমার হাতে—টু আর ইজ হিউম্যান টু ফরগিভ ডিভাইন। তা হলে তোমার দু নম্বর ক্যালাসনেসটা শোনো, মনে আছে, তোমাকে একদিন বলেছিলুম, কানে আমি একটু কম শুনছি, মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। সঙ্গে সঙ্গে তুমি খুব বোলচাল ছাড়লে। পটপট কয়েকজন স্পেশ্যালিস্টের নাম বললে। বললে, কালই আমি ব্যবস্থা করছি। দু' মাস হয়ে গেল। কাল কালসমুদ্রে চলে গেল।'

প্রশান্ত সামান্য বিব্রত হয়ে বললে, 'আপনি একটু সুস্থ আছেন দেখে আমি একটু সময় নিচ্ছিলুম।'

'সুস্থ আছি! এ খবর তোমাকে কে দিলে?'

'মা।'

'ও, তুমি আজকাল ঘোড়ার মুখে ঘাস খাও বুঝি! তোমার সঙ্গে কি আমার ভাসুর ভাদ্রবউ সম্পর্ক! আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? কে আর ঝক্‌কি ঝামেলা নেয়, কি বলো? বুড়ো তো বেশ আছে! ঘুরছে ফিরছে, বসে বসে জাবর কাটছে। আমি তো তোমার শ্যালিকা নই। চিংড়ির মালাইকারি খেয়ে ঠোঁট চুলকে উঠল বলে সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ টাকা ফিয়ের ডাক্তার এসে গেল।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ট্রুথ, ব্ল্যাটান্ট ট্রুথ। নির্ভেজাল সত্য। স্বার্থ ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। ওই ছোট্ট ছেলেটা, যার এখনও পুরোপুরি জ্ঞান হয় নি, সেও স্বার্থ বুঝেছে। স্বার্থ ছাড়া একপাও নড়ে না।'

অন্দর থেকে মহামায়ার তর্জনের গলা শোনা গেল, 'খোকা চলে আয়, কথায় কথা বাড়ে, টাকায় বাড়ে সুদ। চলে আয়।'

প্রকাশবাবু ভুরু কুঁচকে ছেলেকে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ সরে পড়ো। বার্ধক্য বড় ছোঁয়াচে ব্যাধি, স্মল পক্‌সের মত। মশারি ফেলে দিন গুণতে হয়। হ্যাঁ, যাবার আগে আমার অভ্যন্তর ভাগটি অবলোকন করে যাও।'

প্রকাশবাবু জামা তুলে গেঞ্জিটি দেখালেন, 'কি বুঝলে?'

'আজ্ঞে, একটু লালচে হয়ে আছে।'

'লালচে নয় কালচে। তোমার শাসনব্যবস্থায় সাবানের বড়ই অভাব ঔরঙ্গজীব। আর তোমার গর্ভধারিণী! তাঁর কথা না বলাই ভালো। আর তোমার অর্ধাঙ্গিনী! তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে, আধুনিক, কমরেড।'

মহামায়া আবার বললেন, 'চলে আয় খোকা। ঘাঁটাসনি।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে যাও। বিষ্ঠাবৎ পরিত্যজ্য। যত ঢিল মারবে, তত গন্ধ বেরোবে। যাবার আগে আর একটা জিনিস দেখে যাও। এদিকে এসো।'

প্রশান্ত পিতার সঙ্গে ঘরের কোণে তাকের কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। প্রকাশবাবু একটা মুঁখ ফাঁদালো শিশি দেখিয়ে বললেন, 'এটা কি জানো?'

'আজ্ঞে না, কড়াই-টড়াই হবে।'

'রাইট ইউ আর। একে বলে কুলত্থ কড়াই। সামান্য জিনিস অথচ এর ওপর আমার জীবন অনেকখানি নির্ভর করছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই তো চাই। হ্যাঁ আর না, এই দিয়েই জীবনটা চালিয়ে যাও। হোয়্যার ইগনোরেন্‌স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ। আমার কিডনি দুটো একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে জানো কি?'

‘আজ্ঞে, সেই রকমই শুনেছি।’

‘তার জন্যে তোমার কোনও দুশ্চিন্তা আছে?’

‘আজ্ঞে অবশ্যই আছে?’

‘যাক শুনে সুখী হলুম। তোমার মায়ের কোনও দুশ্চিন্তা আছে, না বিধবা হবার জন্যে নাচছে?’

‘ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন?’

‘তর্কশাস্ত্র কি বলছে জানো, কার্য দেখে কারণ অনুমান করা যায়।’

‘আজ্ঞে, ও শাস্ত্রটা আমার তেমন পড়া নেই। আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হয় তো হবে।’

‘এইবার এদিকে এসো।’

প্রকাশবাবু ছেলেকে নিয়ে দেয়াল ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়ালেন।

‘এটা কি মাস?’

‘আগস্ট।’

‘কত তারিখ?’

‘সাতাশ।’

‘কটা লাল ঢ্যারা দেখছ?’

‘আজ্ঞে, পয়লা তারিখে একটা ঢ্যারা, আর পনেরতো একটা ঢ্যারা।’

‘মাত্র দু'দিন। তোমার মাকে খেচকে খেচকে, অনেক জল ঘোলা করে, মাত্র দু'দিন কুলত্থ-কড়াই ভেজানো জল পেয়েছি। প্রতিদিন খাবার কথা। বুঝলে কিছু?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, কাজের চাপে মা ভুলে গেছে।’

‘মাই সন, কাজের চাপ নয়, শিয়ার নেগলেক্ট। আমার মরা-বাঁচায় তার কিছু এসে যায় না বুঝলে? এই হলো সংসার। ছিলুম দুধেল গরু। এখন আমি গোবরে গরু। একেবারেই ওয়ার্থলেস। যাক, তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলুম। এবার তুমি যেতে পারো।’

দুই

মহামায়া ডাকলেন, ‘বউ মা!’

দিশাহারা বউমা গুটি গুটি শাশুড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল, ‘বলুন মা।’

‘আমার চাল নিয়েছ না কি?’

‘ভাত এখনও বসাইনি।’

‘সে কি, খোকা তা হলে কি খেয়ে গেল?’

‘এক গেলাস জল।’

‘বাঃ, তোমার হাতে ছেলেটাকে তুলে দিয়ে ভালই হয়েছে দেখছি।’

‘আমার কি দোষ বলুন। কিছুতেই খেতে চাইলে না। বললে অশান্তির অন্নের চেয়ে উপবাসই ভালো।’

'ভালই করেছে। আমিও কিছু খাবো না। অনশনের প্রতিবাদে অনশন।'

'কি যে আপনারা করছেন, মা।'

'বুড়োকে আমিও টাইট দিতে জানি। ভেবেছে সবাই ছাত্র।'

'বুড়ো বলবেন না, মা। বিশ্রী শোনায়।'

'বুড়োকে বুড়ো বলব না তো কি ছোকরা বলব ! সারাটা জীবন একা পেয়ে শুধু ধামসে গেল। আমি যেন সাঁওতালদের ধামসা রে। শরীরে দয়া, মায়া, মমতা বলে কিছুই নেই। শুধু রাগ, আর অভিমান। বাপের এক ছেলে যে, একলষেঁড়ে তো হবেই। তোমার বয়েস হয়েছে। কচি খোকাটি নও। কোথায় পাঁচজনকে নিয়ে হেসে-খেলে থাকবে, তা নয়, নিত্য নতুন ফ্যাঁকড়া বের করে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। ধিকিকে ধিকিয়ে জ্বলার চেয়ে এবারে একেবারে জ্বলেপুড়ে যাক।'

'মা, আপনার শরীর কিন্তু ভালো নয়, লো প্রেসার। খাওয়া বন্ধ করে দিলে শরীর আরও খারাপ হবে।'

'সে কথাটা আমাকে না বলে, তোমার দুর্বাসা শ্বশুরকে বলো।'

'আমার সে সাহস নেই।'

'তাহলে যা করছ তাই করো গে যাও। কেবল বাচ্চাটাকে উপোস করিয়ে রেখো না।'

'মাগুরমাছের ঝোলভাত করে ওকে খাইয়ে দি।'

'আর তুমি ?'

'অনশন।'

'এই সময়টায় তোমার ভালো খাওয়া-দাওয়া করা উচিত। নিজে মরো ক্ষতি নেই। পেটেরটাকে মেরো না। বুড়োর সঙ্গে আমার লড়াই ! তোমরা এর মধ্যে জড়িয়ে পোড়ো না।'

'সংসারে আগুন লাগলে সকলকেই পুড়ে মরতে হবে। কি আর করা যাবে, মা !'

'বেশ তবে তাই হোক। ওই ওরা বলে, চলছে চলবে, আমরা বলি জ্বলছে জ্বলবে। কত্তাকে শুধু বলে দিও আমিও আমৃত্যু অনশন চালিয়ে যাবো। দেখি কার কত হিম্মত।'

মহামায়া গোটা তিনেক গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার আর রুমাল নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। 'আজ শুধু থুবে যাব সারাদিন। দেখি লালকে সাদা করা যায় কি না ?'

প্রকাশবাবু এদিকে দাবার ছকে ঘুঁটি সাজিয়েই বই দেখে চাল রপ্ত করছেন। মনটাকে ঘোরাতে না পারলে মনটা ভীষণ খাই-খাই করছে। মানুষের জীবনে খাওয়া বিশ্রী একটা বদভ্যাস। 'সারা জীবন তো এত খেলি প্রকাশ, আর কত খাবি।'

নিজেকেই নিজে শাসন করলেন। নাতিটি এসে পাশে বসেছে। আপেলের

মত টুকটুকে দুটি গাল। খরগোশের মত ঝকঝকে দুটি চোখ। নাতি বললে, 'তুমি তাহলে কি খাবে দাদু?'

'হরিমটর।'

'এই যে তুমি বললে কিছু খাবে না। মটর কি করে চিবোবে দাদু, তোমার যে দাঁত নেই।'

'হরিমটর চিবোতে হয় না। গিলেই খাওয়া যায়।'

'দিদাও হরিমটর খাবে!'

'দিদা কোন্ দুঃখে খাবে! দ্যাখো গে যাও, এতক্ষণে একগাদা চচ্চড়ি নিয়ে বসে গেছে চিবোতে।'

'এ রাম, তুমি কিছুই জানো না। দিদাও তোমার মত অনশন করেছে। আজ তো রান্নাই হয় নি।'

'অ্যাঁ, সে কি রে! তুই কি খেলি?'

'আমি ঝোল-ভাত খেয়েছি।'

'আর ওরা?'

নাতি বুড়ো আঙুলটি দাদুর চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললে, 'কাঁচকলা, কাঁচকলা।'

'অ্যাঁ, বলিস কি? বুড়ীর যে আবার লো-প্রেসার? শেষে বুড়ী মেরে খুনের দায়ে পড়ব না-কি?'

'দাদু, তুমি একটা লজেন্স খাবে?'

'নো-ও।'

'বাব্বা কি রাগ!'

'হ্যাঁ, রাগ। রাগই হলো পুরুষের ভূষণ, বুঝলি বুড়ো।'

'যাই, দিদাকে একটা লজেন্স খাইয়ে আসি।'

'তোমার দিদা এখন কোথায়?'

'ও ঘরে শুয়ে আছে।'

'কি বলছে?'

'পাকা পাকা কথা বলছে। বলছে, এবার আমার যেতে পারলেই ভালো। সারা জীবন একটা লোকের অত্যাচার আর কত সহ্য করা যায়! লোকটা কে দাদু?'

'কে জানে? কার কথা বলছে?'

'আমি জানি।' নাতি বিজ্ঞের মতো বললে, 'সে লোকটা হলে তুমি।'

বুড়ো ছুটে পালাল। প্রকাশবাবু দাবার ছকে ঘুঁটি নাড়াতে নাড়াতে অনুভব করলেন, রাগ ক্রমশ পড়ে যাচ্ছে। আর রাগ যতই কমে আসছে ততই কিছু একটা খাবার ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে। চারটে প্রায় বাজল। চায়ের সময়। মনটা ফস ফস করছে। কিছু নেশা জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। চা,

সিগাবেট। মহাত্মা গান্ধীব এসব নেশা ছিল না। তাই অনশন অত সাকসেসফুল হতো। ফুলকো ফুলকো চিঁড়ে ভাজা খেতে ইচ্ছে কবছে। নাঃ, বাগটাকে আবাব ফিবিয়ে আনতে হবে। বেগে না গেলে মানুষেব পক্ষে কিছু কবা সম্ভব নয়। বাগে দুর্বল মানুষও অনাযাসে জানালাব শিক বাঁকিযে ফেলতে পাবে। কি নিযে বাগা যায। কাব ওপব বাগা যায। কেউ যে ধাবে কাছে ঘেঁষতে চাইছে না। প্রকাশবাবু ঢক ঢক কবে আবাব খানিকটা জল খেলেন।

জল খেযে খেযে পেট ফুলে উঠল। ভালই হচ্ছে, ওযাটাব থেবাপী। জলই তো জীবন। এই সময কেউ খাবাব অনুবোধ কবতে এলে আবাব একবাব বেগে ওঠা যায। কেউ যে আসছে না।

ছটাব সময বাড়িব সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। বেযাইমশাই এলেন। বড অমাযিক, আলাপী মানুষ। আজ না এলেই পাবতেন। এ তো বাজনৈতিক অনশন নয যে, নেতাবা আসবেন লেবুব জল খাওযাতে। এ হলো পাবিবাবিক অনশন।

প্রকাশবাবু বেশ গোছগাছ কবে, গম্ভীব হযে চেযাবে বসলেন। পাশেব টেবিল থেকে একটি ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। যে সে ম্যাগাজিন নয, বেদান্তকেশবী। এক ঢোঁক জল খেযে শুকনো ঠোঁট ভিজিযে নিযে মুখে একটি লবঙ্গ ফেলে বাখলেন। কুটুম মানুষ। পাবিবাবিক কেচ্ছা জেনে ফেললে বড লজ্জাব হবে। মহামাযাকেই ভয। হাঁউ হাঁউ কবে সব বলে না ফেলে। এমনভাবে বলবে, সব দোষ যেন আমাব। যত বুড়ো হচ্ছি ততই নাকি ছেলেমানুষ হযে যাচ্ছি। স্বার্থপব সংসাবেব বিবুদ্ধে এ আমাব একক সংগ্রাম! কবেঙ্গে ইযে মবেঙ্গে। কিন্তু কি আমি কবতে চাইছি, সেটাই তো বুঝতে পাবছি না।

সংশযে প্রকাশবাবুব সংগ্রামেব শক্তি যেন দুর্বল হযে পড়ল।

বাইবে জুতোব শব্দ শোনা গেল। বেযাইমশাই আসছেন। খুব মজলিশী মানুষ। গল্পে গানে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা পাব কবে দিতে পাবেন। চতুর্দিকে ফলাও ব্যবসা। প্রচুব অর্থ। মধুপুব, শিমুলতলায বাড়ি। খান দুযেক গাড়ি। দক্ষিণ কলকাতায হাল ফ্যাশানেব বাড়ি।

সত্যেনবাবু দবজাব বাইবে চটি ছেড়ে হাসি হাসি মুখে ঘবে ঢুকলেন। দুই বেযাই প্রায সমবযসী। ইনি একটু হৃষ্টপুষ্ট, উনি শীর্ণ। ইনি আনন্দপ্রধান, উনি বাগপ্রধান।

চেযাব টেনে বসতে বসতে সত্যেনবাবু বললেন, 'কেমন আছেন বেযাইমশাই?'

'ওই চলছে একবকম। চলে যাচ্ছে কোনওবকমে।'

'আপনি কি কোনওদিন ভালো বলবেন না?'

'যে টনিকে ভালো বলা যায, সেই সিলভাব-টনিক আমার আযত্তেব বাইরে। আমাব পৃথিবী হলো, অ্যানিমিক পৃথিবী। দিনগত পাপক্ষয কবে চলে যাওযা।'

'সব সময় অমন বেসুরো বাজেন কেন বেয়াইমশাই! একটু সুরে বেজে দেখুন না, বেশ ভালো লাগবে। সব সহজ হয়ে যাবে। এখানে কাঁদতে এসেছি, না হাসতে এসেছি?'

'মশায়, আপনার চোখে একরকম চশমা আমার চোখে আর একরকম চশমা। দুজনের দেখা কি সমান হতে পারে?'

'আপনার মত পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে কথায় আমি পারব না। দয়া করে গাত্রোত্থান করুন। ধুতি পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে নিন।'

'কেন বলুন তো! আজ আর আমি আপনার কোনও অনুরোধ রাখতে পারব বলে মনে হয় না। একটু বেএক্তার হয়ে আছি।'

'সেই জন্যেই ঈশ্বর মনে হয় আমাকে পাঠালেন। উঠুন উঠুন। আপনার কোথায় কি আছে বলুন, হাতের কাছে এনে দি।'

'না, না, সে কি কথা, সে কি কথা। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'জীবনে আপনি এমন সুন্দর কীর্তন কখনও শোনেন নি। মহাপ্রভু জগৎসুন্দর অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা যাবার পথে চৈতন্য আশ্রমে একটি মাত্র অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন। রাত আটটায় শুরু। জন্মাষ্টমীর প্রাক্‌কালে একটি রজনী। চলুন চলুন, মনটাকে একটু ভিজিয়ে আসি। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু...'

সত্যেনবাবু আপন মনে গান ধরলেন। গলা শুনলেই বোঝা যায় একসময় সংগীতচর্চা করতেন। দু'লাইন গেয়ে গান থামিয়ে সত্যেনবাবু বললেন, 'বেয়ানের কি হোলো! আজ নীরব কেন কবি, ফুলের জলসায়!'

উদাত্তকণ্ঠে বেয়ান, বেয়ান করতে করতে সত্যেনবাবু অন্দরের দিকে এগোলেন। বাবার গলা শুনে শর্মিলা এগিয়ে এলো, 'তুমি কখন এলে?'

'তা মিনিট পনের হবে। কত্তার সঙ্গে কথা বলে এলুম। আমার বেয়ান কোথায়?

'মা শুয়ে আছেন।'

'অ্যাঁ, সে কি রে! ভর সন্ধেবেলা শুয়ে থাকার মানুষ তো তিনি নন। হ্যাঁ রে, শরীর ঠিক আছে তো!'

শর্মিলা, কি আর বলবে। আমতা আমতা করে বললে, 'এই উপোস-টুপোস চলছে তো!'

'উপোস? অম্বুবাচী তো হয়ে গেছে।'

'আঃ বাবা, কি বলছ তুমি? অম্বুবাচী বিধবারা করেন।'

'আয় অ্যাম সরি। আয় অ্যাম অফুলি সরি।'

ওদিকে প্রকাশবাবু ঝট করে একটুকরো কাগজে লিখলেন, 'দয়া করে বাইরের কুটুমের সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলো না। লজ্জায় তা হলে মাথা কাটা যাবে।' ফিস ফিস করে বুড়োকে বললেন, 'যা, চুপি চুপি তোর দিদার হাতে গুঁজে দিয়ে আয়।'

মহামায়া চিরকুটটা পড়ে, হুঁঃ করে একটি শব্দ ছাড়লেন। শর্মিলা ঘরে ঢুকে বললে, 'বাবা এসেছেন।'

'শুনেছি।'

মহামায়া মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরের বাইরে এলেন।

সত্যেনবাবু বললেন, 'বেয়ান, ঝট করে রেডি হয়ে নিন। কত্তাকে খাড়া করেছি কোনও রকমে।'

মহামায়া মৃদু গলায় বললেন, 'শরীরটা আজ তেমন জুতের নেই।'

'শরীর ?' সত্যেনবাবু হই হই করে হেসে উঠলেন, 'শরীর ঠিকই আছে বেয়ান। মনটা গোলমাল করছে। সেই মনের দাওয়াই মিলবে এখুনি। আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায় ?'

'উপাদেয় কীর্তন। জীবনে হয়তো আর শোনার সৌভাগ্য হবে না। নিন, নিন, গেট রেডি।'

মহামায়া ধরা ধরা গলায় বললেন, 'বউমা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করো।'

সত্যেনবাবু বেয়াইয়ের কাছে এসে বসলেন। প্রকাশবাবু জামা-কাপাড় পরে ফেলেছেন। পেট জ্বলছে। গলা শুকনো। ঠোঁট খস্‌খসে। ছাত্রজীবনে শিবরাত্রির উপবাস করেছিলেন একবার। সেই স্মৃতি মনে পড়ল। রাতের দিকে কাহিল অবস্থা। নির্জলা উপবাস। পুজোয় বসে আচমনের নামে কোষাকুষি থেকে ঢোঁকে ঢোঁকে গঙ্গাজল গিলতে লাগলেন। আজ যেন সেই শিবরাত্রির উপবাস।

সত্যেনবাবু বললেন, 'চলুন, এবার পুজোয় সকলে মিলে, মধুপুর কি শিমুলতলা ঘুরে আসি।'

মনে মনে ভাবলেন, ততদিনে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। আজ ঘুরছি। কাল শয্যা নেবো। পরশু খাবি খাবো। পরের দিন পরপারে।

শর্মিলা বাবার জন্যে চা আর জলখাবার নিয়ে এলো।

'বেয়াইমশাই আপনার ?'

'আজ্ঞে, আজ আমার উপবাস, আপনি গ্রহণ করুন।'

'ও, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই উপবাস। আজ কি বার ? শনিবার। ভালো, খুব ভালো। আমারও খুব ইচ্ছে করে একটা কিছু পালন করি। করি করি করে করা আর হয় না।'

'এটা ঠিক ধর্মীয় নয়। বলতে পারেন স্বাস্থ্যের জন্যে। উপবাসে শরীর আর মন দু'টোই খুব শুদ্ধ হয়। লাগাতার উপবাসে নির্বাণ লাভ হয়।'

'এ আপনার কার কথা, বুদ্ধদেবের ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সত্যেনবাবু ট্যাঁপা-ট্যাঁপা খাস্তা-কচুরি খাচ্ছেন। বড় প্রিয় জিনিস তাঁর। প্রকাশবাবুরও প্রিয়। কে যে বস্তুটি আবিষ্কার করেছিলেন ? তাঁর নামে একটি মঠ দেওয়া উচিত।

সত্যেনবাবু কচুরির তারিফ করে বললেন, 'আপনার সামনে বসে খাচ্ছি, আর নিজেকে কেবলই মনে হচ্ছে বিধর্মী।'

'ও সব ভাববেন না। আহারের সঙ্গে ধর্মের কোনোও যোগ নেই।'

কথায় কথায় আহারাদি শেষ হলো। মহামায়া একটি লালপাড় শাড়ি পরেছেন। কপালে সিঁদুরের গোল টিপ। মুখটা খুব শুকনো লাগছিল বলে ছোট্ট এক খিলি পান পুরেছেন। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ফর্সা টকটকে রঙ। টিকোলো নাক। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে বাগবাজারের মা জগদ্ধাত্রীর কথা মনে পড়ে।

প্রকাশবাবু স্ত্রীকে দেখে মনে মনে তারিফ করেই, মন থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন। স্বার্থপর ! এব নাম অনশন ! মুখে পানের খিলি ! দুপুরে সরবত-টরবতও চলেছে বোধহয়। হেঁসেল যার হাতে, তার আর ভাবনা কি। রাগ থিতোলে অভিমান হয। প্রকাশবাবুর ভেতরে অভিমানেব বান ডেকে গেল। দুপুরে আর একবার খোশামোদ করলেই অনশন ভঙ্গ হয়ে যেত। সব রাগেরই শেষ পরিণতি, আর একবার সাধিলেই খাইব। এতবড় অহঙ্কারী মেয়েমানুষ গোঁ ধরে বসে রইল। অঃ, রোজগেরে ছেলের অহঙ্কারে দেমাকে মাটিতে যেন পা পড়ছে না ! বুড়ো ব্যাটা মরলেও ছেলে সিংহাসনে বসিয়ে তা দেবে।

মহামাযা সত্যেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছেন। প্রকাশবাবু পেছন পেছন চলেছেন গুমরোতে গুমরোতে। এখন সন্দেহ হচ্ছে, সদাহাস্যময় ভোজনবিলাসী ওই বণিকটি কার টানে প্রায়ই ছুটে আসেন !

নীচ ভাবনা হলেও ভাবতে হচ্ছে।

গাড় নীল রঙের ঝকঝকে গাড়ি, গুমোরে যেন গুম মেরে আছে। সাদা উর্দিপরা চালক। পেছনের দরজা খুলে সত্যেনবাবু মহামায়াকে বললেন, 'উঠুন বেয়ান।'

প্রকাশবাবুর ভেতরটা রাগে কষকষ করছে। বেয়ানের খাতির দেখ ! বেয়াইটা যেন ফেউ ! বানের জলে ভেসে এসেছে।

সত্যেনবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'বেয়াইমশাই আসুন, আসুন।'

প্রকাশবাবু বেশ কঠিন গলায় বললেন, 'আমি সামনে বসব। আপনারা দু'জনে আরাম করে পেছনে বসুন।'

'না, না, হরপার্বতীকে পেছনে রেখে আমি চলব সামনে। আসুন, আসুন।'

প্রকাশবাবু আরও কঠিন গলায় বললেন, 'পেছনে বসায়, আমার একটু অসুবিধা আছে বেয়াইমশাই। আপনারা দুজনে বসুন, আমি সামনে যাচ্ছি। আর তাতেও যদি অসুবিধে হয়, আমি ফিরে যাই।'

সত্যেনবাবু গাড়ির খোলা দরজায় হাত রেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহামায়া ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। এগিয়ে গেলেন বাড়ির দরজার দিকে। সিঁড়ির কাছাকাছি এসে আর পারলেন না। সিঁড়ির হাতলে মাথা রেখে

কান্নায় ফুলতে লাগলেন। এই চওড়া, লালপাড় শাড়ি, গহনা, জর্দাপান, পালঙ্ক, সবই একটা মানুষের মর্জি। যখন খুশ-মেজাজে তখন তুমি আমার সোহাগের স্ত্রী। মেজাজ বিগড়ালেই মানসিক নির্যাতন! ঠিক ওই কথাটাই মনে এলো মহামায়ার—স্ত্রী হলো প্রয়োজনের পিকদান।

সত্যেনবাবু তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলেন, 'কি হলো বেয়ান! নেমে এলেন কেন? কাঁদছেন কেন?'

মহামায়া কোনওক্রমে বললেন, 'আমি যাবো না।'

প্রকাশবাবু দু'পা দূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সত্যেনবাবু সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েদের মনে দুঃখ দেন কেন? আপনি পণ্ডিত মানুষ, এইটুকু বোঝেন না, যে সংসারে মেয়েরা হাসতে পারে না, সে সংসারের কখনও উন্নতি হয় না। মরুভূমি হয়ে যায়।'

মহামায়া ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলেন। পেছন পেছন উঠে এলেন সত্যেন আর প্রকাশ। প্রকাশের মনে খুব লেগেছে। বড় নীচ হয়ে গেছেন তিনি। অপমানিত মহামায়ার করুণ মুখ বড় দাগ কেটেছে মনে। সারা জীবন অনেক টর্চার করেছেন। নির্যাতন করে এক ধরনের আনন্দ পেয়েছেন। 'আমি এক ঘৃণ্য স্যাডিস্ট।'

ধীরে ধীরে পা থেকে চটি খুললেন। ডান হাতে তুলে নিলেন একপাটি চটি। সত্যেনবাবু অবাক হয়ে মানুষটিকে দেখছেন। লম্বা বারান্দা ধরে মহামায়া এগিয়ে চলেছেন পায়ে পায়ে।

প্রকাশবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।'

সত্যেনবাবু আতঙ্কের গলায় বললেন, 'ছি ছি ছি, সে কি কথা!'

'জুতো, জুতোই তোমার দাওয়াই।'

নিজের গালে পটাপট জুতো মারতে লাগলেন।

'এ কি, এ কি করছেন আপনি? সত্যেনবাবু হাত চেপে ধরে সামলাতে পারছেন না। শরীরে অসুরের শক্তি এসে গেছে।

'জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দাও। এই নিন আর একপাটি। পটাপট মারুন।'

মহামায়া দ্রুতপায়ে ঘুরে এলেন, 'এ কি করছ তুমি? এ কি পাগলামি!'

ক্ষিপ্ত প্রকাশবাবু নেচে উঠলেন, 'মারো, মারো, পটাপট মারো। ডাকো প্রশান্তকে, ডাকো বউমাকে। সবাই মিলে পেটাও। এই অত্যাচারী বুড়োটাকে জুতোও, জুতোও। জুতিয়ে সিধে করো।'

মহামায়া স্বামীকে জাপটে ধরলেন। হুহু করে কাঁদছেন আর বলছেন, 'তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে?' মহামায়ার শীতল আলিঙ্গনে প্রকাশবাবুর শরীর ক্রমশ শিথিল হয়ে এল। শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠেছে। ঘোর লেগে গেছে। মহামায়াকে আর মহামায়া বলে মনে হচ্ছে না। বহুকাল আগের এক অনুভূতি ফিরে আসছে। উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল। টাইফয়েড হয়েছে। দাওয়ায়

বসিয়ে মাথায় জল ঢেলে, মা বুকে জড়িয়ে ধরে, ধীরে ধীরে ঘরের দিকে নিয়ে চলেছেন।

মহামায়া ধীরে ধীরে স্বামীকে খাটে শুইয়ে দিলেন। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, 'ইস ডান গালটার কি অবস্থা করেছে।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'আমি একটু জল খাবো।'

শর্মিলা দরজার কাছে। মহামায়া বললেন, 'বউমা, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও।' ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে। সত্যেনবাবু একপাশে বসে স্বামী-স্ত্রীর অপূর্ব লীলা দেখছেন। শর্মিলা ফ্রিজ খুলে জলের বোতল বের করে ভাবতে লাগল, শুধু জলে তো অনশন ভঙ্গ হয় না। ফলের রস দিতে হয়। এক বোতল আঙুরের রস আছে। গোটা চারেক মুসোম্বি আছে। প্রশান্ত একটা ক্রাশার কাম মিক্সার কিনে এনেছে কাল। আজই তার উদ্বোধন হোক।

মিক্সার চলছে ঘির ঘির করে। মুসোম্বির নরম শরীর থেঁতো হচ্ছে। দলা পাকাচ্ছে। রস বেরোচ্ছে। শর্মিলার হঠাৎ মনে হলো—এরই নাম সংসার। যত চটকাবে তত রস বেরোবে। সব যেন ঘানির সরষে। পেষাই না হলে তেল বেরোয় না।

সুন্দরী লেন

'এত রাত হলো?'

'রোজই তোমাকে এক কৈফিয়ত দিতে আমার ভালো লাগে না। আমি পারব না দিতে।'

শেষ কথাটা যতটা সম্ভব কর্কশ গলায় বললে শিখা। পাশের বাড়ির ঘড়িতে রাত বারোটা বাজছে। সারা পাড়া নিস্তব্ধ। একটু আগে রাতের শান্তি এঞ্জিনের শব্দে, হেডলাইটের রেখায় চিরে দিয়ে গেছে একটা ট্যাক্সি। আবার ধীরে ধীরে অন্ধকার জোড়া লেগে এসেছে। অন্ধকারে এর ওর রকে শুয়ে থাকা গোটা কয়েক ধামসা কুকুর মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে। অন্ধকারের শূন্যতায় সময় সময় ওরা প্রেতের উপস্থিতি টের পায়।

উত্তর কলকাতার বুকের ওপর পড়ে আছে এক চিলতে লাজুক গলি। মোটেই সুন্দর নয়। তবু কোথাও এক জায়গায় রসিকতা করে নাম লিখে রাখা হয়েছে 'সুন্দরী লেন'। বাবু কলকাতার রমরমার দিনে এই গলি যেখানে বাঁক নিয়ে বিডন স্ট্রিটে পড়ছে, সেই বাঁকের মুখে বিশাল এক বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে বসবাস করতেন সুন্দরী দাসী নামে এক বদান্য মহিলা। দান, ধ্যান, পূজাপাঠ,

হরিনাম সংকীর্তন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রসেবা ইত্যাদি পুণ্যকর্মের অক্ষয় স্মৃতি রেখে শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। প্রথম জীবনে সেকালের কোনও এক উদার বাবুর রক্ষিতা ছিলেন। তিনিই তাঁর প্রাণের মানুষটিকে এই ইমারত উপহার দিয়েছিলেন। তখন এই অঞ্চলে এত বাড়িঘর ছিল না। গোটা তিন বাগান বাড়ি ছিল। সে সব এখন আর নেই। মাঠময়দান করে খুপরি খুপরি বাড়ি হয়েছে। গায়ে গায়ে। আলো ঢোকে না। বাতাস ঢোকে না। সুন্দরি সুন্দরি দাসী একটি গলি। সেই বিশাল ইমারতের লাগোয়া রাধা-মাধবের মন্দিরটি আজও আছে। টিংটিং করে আরতি হয়। সেবিকা মধ্যবয়সী একজন মহিলা। মহিলার অতীত নেই। বর্তমানে তিনি রাধামাধবের পদাশ্রিতা। এই মন্দিরের একপাশেই সেবিকার বসবাসের ব্যবস্থা।

শিখা প্রথমে ডান পা তুলে ডান পায়ের উঁচু হিল-জুতো উঁচু র‍্যাকে রাখল। একটা চেয়ারে বসে রুদ্র শিখাকে লক্ষ্য করছে। বাঁ পায়ের ওপর ভর রেখে বাঁ হাতে ঘরের দরজার ফ্রেম ধরে শরীরের টাল সামলাচ্ছে। ডান পা-টা উঁচু করার সময় বাঁ পায়ের ওপর শায়া সমেত শাড়ির অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। ধবধবে সাদা পা বেরিয়ে পড়েছে। সুন্দর সুগঠিত পা। যে পা বাজনার তালে তালে রাতের পর রাত মঞ্চে নাচে। পায়ের ওপর যে দেহকাণ্ডটি সেটি নানা ছন্দে দোলে, দোমড়ায় মোচড়ায়। ডান পা নামিয়ে শিখা বাঁ পা তুললে জুতো রাখার জন্যে। মেঝেতে শক্ত কাঠের গোড়ালির খটখট শব্দ হলো ! আজ চার পাঁচ বছর হলো এই দেহ আর এই মনের সঙ্গে রুদ্র ভীষণ পরিচিত। তবু শিখার এইভাবে জুতো রাখার ভঙ্গিতে রুদ্র কাবু হয়ে গেল। বুকের আঁচল সরে গেছে একপাশে। একটা হাত তোলা থাকায় পাতলা ব্লাউজের আবরণ ভেদ করে একপাশের বুক বিদ্রোহী হতে চাইছে। ভরাট কাঁধে টান টান হয়ে আছে ভেতরের জামার ফিতে। রুদ্র জানে শরীরটাকে শিখা খুব যত্নে রাখে। শরীরটাই তার নেশা। রোজ সকালে ঘণ্টা দুই ব্যায়াম করে। আসন, ফ্রি হ্যান্ড, দোমড়ানো মোচড়ানো। মাঝে মাঝে কোমর আর নিতম্বের মাপ নেয়, ওজন নেয়। মুখের জন্যে আবার বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থা। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, গোলাপ জল, নানা রকমের প্রলেপ। হরেক রকম দেশী-বিদেশী বইয়ের দামী দামী উপদেশ।

শিখা ঘরে এসে টেবিলের সামনে আয়নার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে কান থেকে পাথরের দুল খুলছে একে একে। মুখটা একবার ডানদিকে ফিরল, একবার বাঁ দিকে। রুদ্র একই মুখ দুটো দেখছে। একবার আসল মুখ আর আয়নায় তার প্রতিফলন। একটা সোজা দিক আর একটা উল্টো দিক। ধারালো সুন্দর মুখ। টানা টানা চোখ। সব সময় একটু রাগী রাগী। যখন হাসে তখনও যেন রাগ যায় না। প্রেমের চরম মুহূর্তেও রুদ্র লক্ষ্য করেছে কেমন যেন উদাস ভাব। ভেতরে এমন একটা কঠিন প্রাণী আছে যে ভাঙে না, গলে না, টলে না। সমর্পণ জানে না। নিবেদন জানে না। শিখার

দেহের ওপর সব কিছু খেলা করে একসময় ক্লান্ত হয়ে তারা নিজেরাই সরে পড়ে। উদাসীনতা যেন শিখার হাত ধরা। বুদ্র লক্ষ্য করেছে, একমাত্র শিখা যখন নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তার মুখে কোমল ছায়া ঘন হয়ে আসে। দৃষ্টিতে প্রেম আসে। হাতের আঙুল দেখছে। পায়ের গোড়ালিতে পাথর ঘষছে। বুকের খাঁজে তোয়ালে চেপে ধরছে। চুল উঁচু করে ঘাড় মুছছে। চোখে সরু করে কাজল টানছে। আড়াল থেকে দেখেছে বুদ্র, তখন তাকে প্রেমিক বলেই মনে হয়। চোখের মণিতে হাসির ঝিলিক।

শিখা ঘরে এসেছে। গুনগুন করে গান গাইছে। ঘরের বাতাসে ভাসছে দামী বিলিতি সুবাস। শিখাকে দেখে বুদ্রর মনে হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি প্লাস্টার অফ প্যারিসের একটি ভাস্কর্য নীল সিল্কের শাড়ি পরে এই মধ্যরাতে মধ্য উত্তর কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বুদ্রর হিংসে হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে। আবার ভীষণভাবে কাছে পেতেও ইচ্ছে করছে। বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে যেভাবে পেয়েছিল কয়েক বছর। এখন আর উপায় নেই। দিন বদলে গেছে। প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। অনেক বড় উমেদার জুটে গেছে এখন। আম কাটলে বা কাঁঠাল ছাড়ালে যেভাবে নীল নীল ডুমো ডুমো মাছি ছেঁকে ধরে শিখার এখন সেই অবস্থা।

বুদ্র জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কে ছিল সঙ্গে?'

শিখার সংক্ষিপ্ত উত্তর 'কেউ একজন ছিল নিশ্চয়।'

'ভালোভাবে কথার উত্তর দিতে পারো না?'

'না, পারি না।'

'দিন দিন খুব বেড়ে যাচ্ছো তুমি।'

'দিন দিন সব কিছুই বাড়ে। বয়স বাড়ে। লোক বাড়ে।'

'আজ খেয়েচো।'

'খেয়েচি।'

'কতটা?'

'ঠিক ততটা যতটায় গা গরম হয়।'

বুদ্র চিৎকার করে উঠল, 'শিখা।'

শিখা ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'ওপরে যাও। আমি কাপড় ছাড়বো।'

'কেন, আমার সামনে লজ্জা করছে?'

'লজ্জা নয়। তোমাকে আনন্দ দেবার সামান্যতম ইচ্ছা আমার নেই। তুমি পাশের ঘরে যাও।'

'যে হাজারখানেক দর্শকের সামনে উলঙ্গ হতে পারে, সে আমার সামনেও পারবে।'

'মুখ সামলে কথা বলবে।'

'এতদিন হাত আর পা সামলে রেখেছিলুম, এবার সেটাও চলবে।'

'চালিয়ে দেখতে পারো।'

রুদ্র ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললে, 'চরিত্রহীন।'

শিখা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'নপুংসক।'

একটা বড় ঘর, একটা বসার ঘর ছোট মত, রান্নাঘর আর তার সঙ্গেই চৌকো মত একটা জায়গা যেটাকে ইংরেজীতে ডাইনিং স্পেস বলে বাড়িঅলা গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। বসার ঘরে তিনটে কোচ, একটা সেন্টার টেবিল। টেবিলের তলায় দু'হাত বাই তিন হাত মাপের এক চিলতে কার্পেট। সংসারে শান্তি না থাক ঘর সাজাবার কেতায় যেন ত্রুটি না থাকে। আধুনিক জীবনের এই হলো ধরম।

রুদ্র একটা কোচে বসে পা-দুটো জোড়া করে সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর টানটান করে ছড়িয়ে দিল। কি একটা ম্যাগাজিন ছিল নিচে মুখ থুবড়ে পড়ল। রুদ্র গ্রাহ্যই করল না। দুকান দিয়ে উত্তাপ বেরোচ্ছে তার। শিখা আজকাল সুযোগ পেলেই পুরুষত্বের খোঁটা দেয়। ব্যঙ্গ করে পৌরুষ নিয়ে। এ এক নতুন কায়দা। অপদস্থ করার নতুন পদ্ধতি। মনস্তাত্বিক নিপীড়ন। এই একটা জায়গায় রুদ্র হেরে যায়। শিখার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। প্রেমিক রুদ্র ডাকাত হতে পারে না। তার ভেতরে একটা মেয়েলী ভাব আছে। নরম, কোমল। কথা বলে ধীরে। মানুষের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে পারে না। শিখা একসময় তাকে ভালবেসেছিল এই সব গুণের জন্যেই। বলতো তোমার মুখটা কি মিষ্টি ! চোখ-দুটো কি সুন্দর ! কোনো পাপ নেই। সেই সব দিন কোথায় চলে গেল। কত তাড়াতাড়ি সব বদলে যায়। দিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনটাও কোথায় চলে যায়।

রুদ্র শুনতে পাচ্ছে শিখা বাথরুমে ঢুকেছে। জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। তখন থেকেই কি একটা গান গাইছে গুনগুন করে। আজ ভীষণ ফুর্তিতে আছে। পয়সাঅলা প্রোডিউসার ধরেছে। মঞ্চ থেকে বাঙলা ফিল্ম। বাঙলা থেকে হিন্দি। স্বপ্ন দেখছে শিখা। টাকা থাকলে অনেককে স্বপ্ন দেখান যায়। রুদ্রর পয়সা থাকলে রুদ্রও দেখাতে পারত। তবে শিখাকে নয়, অন্য কাউকে। স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, বাপ-ছেলে, পৃথিবীতে এই ধরনের কিছু সম্পর্ক আছে যার চেয়ে তিক্ত সম্পর্ক নেই। খুব কাছের অথচ গরলে ভরা।

শিখা বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। ওপাশ থেকে বহু রকমের খুটখাট শব্দ ভেসে আসছে। শিখা ভুলেও একবার এ-ঘরে আসছে না। শোবার ঘরের দরজা বন্ধের শব্দ হলো। রুদ্র উঠে দাঁড়াল। অসহ্য। অসহনীয় ব্যাপার। ভেবেছে কি ?

ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। পায়ের পাতায় আর গোড়ালিতে ক্রিম ঘষছে শিখা। সংক্ষিপ্ত বেশবাস। অন্য সময় হলে, দু'বছর আগে হলেও রুদ্র কি করতে বলা শক্ত। তবে ঘরের আলো হয়ত নিবে যেত। একটা হুটোপাটির শব্দ। মাঝে মাঝে খিল খিল হাসি। আদরের তিরস্কার—আঃ, কি হচ্ছে।

শিখার এই সব ভাবভঙ্গি আর ছলাকলা তার আর ভালো লাগে না। যখন প্রেম ছিল, ভালবাসা ছিল তখন শিখার সবকিছু ভালো লাগতো ! তার তাকানো, কথায় কথায় মাইরি বলা। আচমকা পিঠে চড় মারার অভ্যাস। বুদ্র হয়তো চিঠি লিখছে আচমকা এসে হাত নাড়িয়ে দিয়ে খিল খিল হাসি। পিঠের ওপর ঝুলে পড়ে কুট করে কান কামড়ে দেওয়া।

বুদ্র বললে, 'কি হলো ? খাওয়া-দাওযা হবে না ?'

গুনগুন গানের ফাঁকে শিখা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'আমার খাওযা হয়ে গেছে।'

'অ, তোমার হলেই হয়ে গেল, আমার কি হবে ?'

'খেযে নাও। মনুর মা তো সব চাপা দিয়েই রেখে গেছে।'

'সব তো ঠাণ্ডা জল।'

'গ্যাস আছে। জ্বেলে গরম করে নাও। তোমাব তো পক্ষাঘাত হয়নি।'

'কিভাবে কথা বলছ শিখা ?'

'তোমার সঙ্গে এর চেযে ভালভাবে কথা বলা যায না।'

'আমি এতই ঘৃণ্য !'

'অনেকটা কেঁচোর মত।'

'তুমি কি চাইছ শিখা ?'

'তোমার ভাযায একটু বেশি রকম উড়তে চাইছি। হযেছে ? উত্তর পেয়েছ ! যাও, এখন নিজের জায়গায় যাও। আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমার ঘুম পেয়েছে।'

শিখা মাথার ওপর দু'হাত তুলে শরীর মুচড়ে হাই তুলল। ইচ্ছে করে এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে বুদ্রর শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে।

শিখা আজকাল এই রকম করে। বুদ্র যাতে দগ্ধে দগ্ধে মরে। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যায়। অপমানে কুঁকড়ে থাকে। সেই দিনগুলোর কথা শিখার মন থেকে মুছে যাওয়া শক্ত। নিজের উন্নতির জন্যে, তরতর প্রমোশনের জন্যে বুদ্র শিখাকে বহুবার টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অফিসের বড়কর্তাকে ডেকে এক কাজের অছিলায নিজে সরে পড়ত। খুব সোজা হিসেব। কত নোংরামিই না শিখাকে সহ্য করতে হয়েছে। তখন বড় অসহায় ছিল। আজ আর সেদিন নেই। আজ সে ওই নীচ, নোংরা লোকটাকে লাথি মারতে পারে। নোংরা ব্যাধিতে ভুগছে। দেহের ক্ষিদে দিন দিন বাড়ছে। মেটাবার ক্ষমতা নেই। শয়তান। শয়তান এখন সতীপনার উপদেশ দিতে আসে। চাকরি-বাকরি সব খুইয়ে বসে আছে। চারশ বিশ করে দু'একশো রোজগার করে ! মাঝে মাঝে অপমানিত হয়, ঝাড় খায়। বুদ্রই তাকে খেলতে শিখিয়েছে। খেলাতে শিখিয়েছে। বহু পুরুষকেই সে খেলায়, বুদ্র তাদের মধ্যে একজন। আয়নার দিকে ঘুরে বসে শিখা বুকে পাউডার ছড়াতে লাগল ! বুদ্র কুকুরের মত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুক।

চেনে বাঁধা কুকুর। লোকটা এত বড় পাজি, শিখাকে বিয়ের পর মা-বাবাকে ভুলে গেল। ছেড়ে চলে এলো। মা যখন মৃত্যুশয্যায় রুদ্র তখন শিখাকে নিয়ে গোপালপুরে ফুর্তি করছে। বৃদ্ধা যখন মারা যাচ্ছেন রুদ্র তখন প্রচণ্ড মদ্যপান করে শিখার নগ্ন বুকে মুখ ঘষছে। বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত। রুদ্র ভুলেও সে পথ মাড়ায় না।

রুদ্র শিখাকে আয়নায় দেখতে দেখতে বললে, 'আজও তুমি খেয়েছ?'

'কেন, আজ ড্রাই-ডে না কি?'

রুদ্র প্রচণ্ড ধমক দিল, 'শিখা।'

শিখা সুর করে বললে, 'বাবা বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর।'

'তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।'

'একসময় তুমিই তো আমার মাত্রা ঠিক করে দিয়েছিলে গুরু। দুটো বড়, অ্যান্ড ইউ লুক ভেরি সেক্সি। সেইটাই সামান্য একটু বেড়েছে। কখনও তিন, কখনও চার অ্যান্ড আই লুক মোর সেক্সি। এ বিট মোর সেক্সি। আমার গাল গোলাপী হয়। আমার দেহ জ্বলতে থাকে ফসফরাসের মত। ওরা তাই বলে গো। একটু আগে শক্তি আমার ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে তাই বলেছিল। বলেছিল, অ্যামেরিকায় জন্মালে আমি মেরিলিন মনরো হতে পারতুম।'

রুদ্র গর্জন করে উঠল, 'কে শক্তি?'

'ওমা! শক্তিকে চেন না। সাতটা হিট ছবির প্রডিউসার। শক্তি আমাকে নায়িকা করবে।'

'আমি তাকে খুন করবো।'

'খুন করবে? আহা বাছারে! জেলে যাবার শখ হয়েছে গোপালের।'

শিখাকে মারার জন্যে রুদ্র তেড়ে গিয়েছিল। মাঝপথেই থেমে যেতে হলো। হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। চোখে অন্ধকার দেখছে। বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে। জিভ আর গলা শুকিয়ে কাঠ। চেয়ারের পেছন ধরে সামলে নিল। সেই অবস্থাতেই শুনতে পেল শিখা বলছে,

'আমার মত রোজ রাতে তোমার পার্টির পয়সায় একটু করে স্কচ খাও না গো, সঙ্গে চিকেন তন্দুর। তুমি তো লাইসেন্স পাইয়ে দিতে পারো। কত রকমের লাইসেনস। সিমেন্টের, লোহার, মদের দোকানের, গাড়ির, মেয়েছেলে নাচাবার, তোমার অভাব কিসের?'

রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে এক-পা এক-পা করে দরজার দিকে এগোচ্ছে। চোখের সামনে সবই ঝাপসা। তারই মধ্যে দেখছে শিখা শরীরের সব কিছু খুলে ফেলেছে। কানে আসছে চটুল কণ্ঠ—'কাম, কাম মাই ডারলিং; কাম, আই অ্যাম রেডি।'

রুদ্রর মাঝে মাঝে মনে হয়, একদিন গলা টিপে শেষ করে দেয়। যখন জেগে থাকে তখন সম্ভব হবে না। বাইরে থেকে শরীর স্বাস্থ্য দেখলে মনে

হবে না বুদ্র অসুস্থ। ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। গেছে নিজের দোষে। মদ, সিগারেট, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা। স্নায়ু বলে আর কিছু নেই। একটু উত্তেজিত হলেই কাঁপতে থাকে থরথর করে। ইসিজি করিয়েছিল, হার্টের অবস্থা শোচনীয়। রক্তে চিনি এসেছে। শিখা যখন ঘুম আর অ্যালকোহলে বেহুঁশ থাকে সেই সময় খুব সহজেই করা যায় ; কিন্তু নিদ্রিত শিখা এমনই লোভনীয় এমনই আকর্ষণীয়, তাকালেই থমকে দাঁড়াতে হয়। মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাগানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতে খোদাই করা, স্নানরতা ভেনাস, ক্লান্ত হয়ে পাথরের বেদি থেকে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

ও ঘরের আলো নিবে গেল। জোর শব্দে দরজা বন্ধ হলো। ঘরের নয়, যেন মনের দরজা বন্ধ হলো। সেই শিখা আর এই শিখা ! বুদ্র ভাবে, কিভাবে দিন বদলায় ! চরিত্র বদলায়। শিখাকে তো সে পাপের জগৎ থেকেই তুলে এনেছিল ভালবাসা দিয়ে। গাঁট ছড়া বেঁধে নিয়ে এসেছিল প্রথমে গগন হালদার লেনের বাড়িতে। কে না জানে উন্নতির জন্যে ক্ষমতাশালী মানুষকে কিছু-না-কিছু দিতে হয়। খোদ ঈশ্বর ওই আকাশে, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর বহর নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করছেন। মন্দিরে মন্দিরে তাঁর চৌকি। পেলা দাও, মানত করো, মাথা ঠোকো, উপোস করো, তবে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন। ক্ষমতাশালী মানুষ হলো নিজের এলাকার ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্যে পুজো তো দিতেই হবে। যে পুজোর যে নৈবেদ্য। কোথাও মদ। কোথাও অর্থ। কোথাও একটু নারীসঙ্গ। কাজ বাগাবার জন্যে যাকে যা দেবার তা দিতে হয়।

কেন ? তুমি জানো না ! ওই যে অত বড় চিত্রাভিনেত্রী, প্রতি ছবিতে যিনি এখন পনের লাখ টাকা ফি নেন, সেই অভিনেত্রী প্রথম কয়েক বছর কার রক্ষিতা ছিলেন ! তুমি জানো না ! তুমি পড়ো নি ফিল্ম্ ম্যাগাজিনে। এখন তিনি বিরাট মহিলা। দেশে বিদেশে নাম। প্লেনে চেপে লন্ডন। রয়াল অ্যালবার্ট হলে এ দেশের প্রতিনিধি হয়ে ভারতীয় কনসার্টের উদ্বোধন করেছেন। এখন তাঁর কি ভীষণ দাপট ! কে আর বলতে সাহস পায়, আপনি তো একসময় ইয়ে ছিলেন।

বুদ্র উত্তেজনায় উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে। ঘরে পায়চারি করছে।

প্রথম যখন সরকারী চাকরিতে বহাল হতে গেলুম, বললে ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে হবে। কিরকম পরীক্ষা। সরকারী সার্জেন একপ্রকার প্রায় উলঙ্গই করে ছাড়লে। নিয়ম। প্রথা। পেন্ট নামাও বলায়, আমি প্রতিবাদ করেছিলুম শিখা। পেণ্ট নামাবো মানে ? বুড়ো ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, হয় যা বলছি তাই করুন নয় তো সরে পড়ুন। এই চাকরিতে ঢোকার আগে পেণ্ট খুলতেই হবে মশাই। আপনার পিতাও খুলেছিলেন। আপনার পুত্রকেও খুলতে হবে।

ওই যে সরল সরকার। সামান্য মেট্রিক পাশ করে আজ কত বড় চাকরি করছে ! গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যায়। কি সুন্দর বাড়ি করেছে। চামরী গাইয়ের

মত বউ। কি করে হয়েছে তুমি জান না শিখা! পাড়ার সবাই জানে। সরল সরকারের বউই সরল সরকারের লক্ষ্মী। সবাই জানে সে কাহিনী। তুমিও জানো সরলের বউ একদিন সরলের অফিসে গিয়েছিল স্বামীর খোঁজে। খবর পাঠিয়ে বসে আছে ভিজিটার্স রুমে। এমন সময় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্মল সেনগুপ্ত রিসেপসানিস্টকে বোর্ডে না পেয়ে ফায়ার করার জন্যে তেড়ে বেরিয়ে এলেন নিজের বাতানুকূল অনুপম প্রকোষ্ঠ ছেড়ে। রিসেপসানে ঢুকেই সরলের বউকে একা বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'হোয়্যার ইজ শি?' সরলের বউ সঠিক কোনও উত্তর দিতে না পারলেও সাহস করে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললে, 'অ্যাজ শি ইজ ক্যারিং, শি হ্যাজ গন টু ভমিট।'

সেনগুপ্তর চোখ কান দুটোই জুড়িয়ে গেল। সরলের বউয়ের তখন ভীষণ চটক।

সেনগুপ্ত নরম গলায় বললে, 'হু আর ইউ?'

'সরল'স ওয়াইফ।'

ব্যাস, জিনিসটা সেইদিনই জমে গেল। রিসেপসান থেকে সোজা বড় কত্তার চেম্বারে। সেখান থেকে বার, রেস্তোরাঁ, রেস্তোরাঁ বার ঘুরতে ঘুরতে সোজা হোটেলে। হোটেলে নানারকম দুরূহ ইন্টারভিউ-এর পর 'সরল'স ওয়াইফ' সায়েবের পি-এ। একটু বেশী খাওয়া-দাওয়ার ফলে শরীরটা ইদানীং আবার রমণীদের মত হয়েছে। তা হোক। প্রথমে সেনগুপ্ত কব্জা করেছিল, এখন মহিলা সেনগুপ্তকে কব্জা করেছে। আহা, এই তো দুনিয়ার নিয়ম। গিভ অ্যান্ড টেক। প্রথমে মানুষ মদ ধরে, তারপর মদে মানুষ ধরে। সরলের বউ চালাক, সরলও উদার। যেভাবেই হোক আমাদের বাঁচতে হবে। এ বাজারে পয়সা ছাড়া বাঁচা যায় না। তুমিও জানো, আমিও জানি। সেই তো নিজের স্বার্থে তোমাকে শরীর ভাঙাতে হলো। আমাদের দুজনের স্বার্থে যখন একটা আধবুড়োকে খেলাতে বললুম তখন এমন সতীপনা করলে, পুরো পরিকল্পনাটা তো কেঁচে গেলই, আমারও বারোটা বেজে গেল।

রুদ্র এত কথা একসঙ্গে কখনও ভাবতে পারে না। ইদানীং পারছে। শিখা তার সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি ওই এক ইম্প্রেসারিও দিনের পর দিন চোখের সামনে একটু একটু করে ভোগ করবে আর রুদ্র সব শেষে ছিবড়েটি কোলে নিয়ে, হরি দিন তো গেল করবে, তা হয় না। তা হতে পারে না। শিখাকে একদিন বলেছিল, বেরিয়ে যাও। শিখা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, বেরোতে হয়, তুমিও বেরোও। এ ফ্ল্যাট আমার। আমি ভাড়া দি।

এক বিছানায় বহুকাল শোয় না দু'জনে। সেই দিন শেষ উঠে চলে এসেছিল রুদ্র, যেদিন শিখা পা দিয়ে ঠেলে তার পা সরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তুমি কাছে এলে আমার গা ঘিনঘিন করে। মনে হয় গায়ের ওপর গিরগিটি চলে বেড়াচ্ছে।

রুদ্র বলেছিল, তুমি আমার বউ, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমাকে লাথি মারছ, লাথি মেরে সরিয়ে দিতে চাইছ।

শিখা সেদিন একটু বেশি ঘোরে ছিল। বলেছিল, আমার লাথিব দাম জানো! কলকাতায় এমন লোক আছে যে আমার এক-একটা লাথির জন্যে হাজার টাকা দেবে। বেশি স্বামীগিরি ফলাতে এসো না। নিচে নেমে শোও। তোমার ওই আদর টাদর অসহ্য লাগে। তোমাদের মত ঘেয়ো পুরুষদের জন্য তো পাড়া আছে। পাঁচ টাকা, পাঁচশো টাকা সবরকমই পাবে।

রুদ্র সেই থেকে বিছানা আলাদা করে নিয়েছে।

রুদ্র হঠাৎ হেসে ফেলল। সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্যে সে কি-না করেছে। মাকে মেরেছে। বাপকে ছেড়েছে। ভাইকে তাড়িয়েছে। অসৎ উপার্জনে উপহার কিনেছে। আর দিনের পর দিন দিওয়ানা হয়ে ঘুরেছে। ঘুরছে। না আর নয়। রুদ্র উঠে পড়ল। ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে হবে এখন।

শিখা সংসার-টংসার দেখা অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছে। রান্নাঘরের চেহারা দেখলে যেন কান্না পায়। এলোমেলো। অগোছালো। সব ওলট-পালট। ইঁদুর ছুটছে। টিকটিকি ঘুরছে থালার ওপর। বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ ভেপসে আছে বদ্ধ ঘরে। কে বলেছিলেন—সুন্দর শরীরে সুন্দর মন বাস করে! ভুল! সম্পূর্ণ ভুল কথা।

রুদ্র একটা জানলা খুলে দিলো। নিচেই সুন্দরী লেন, অন্ধকারে পাক খেতে খেতে চলে গেছে আরও অন্ধকারে মাতাল পথিকের মত। দূরে শ্যামসুন্দরের মন্দির। মিটি মিটি আলো জ্বলছে এখনও। রুদ্র পথের দিকে, প্রায় ভেঙে-পড়া মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। মায়ের কথা মনে পড়ছে। শৈশব থেকে যৌবন, কত উৎপাত সহ্য করে গেছেন মহিলা। বাবাকে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে, পুরনো রংচটা একটা ছাতা বগলে, বাড়ি বাড়ি টিউশানি করে ফিরছেন বৃদ্ধ। সেই বয়েস, যে বয়েসে মানুষ ছেলের রোজগারে সামান্য শাকান্ন খেয়ে, শান্তিতে ভগবত চিন্তায় জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখে। ভাইটা ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে।

সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটা। আর দায়ী তার কাম। তার লোভ। তার ভোগবাসনা। রুদ্র ফিরে তাকাল ঘরের দিকে। সে একটা নেংটি ইঁদুর। ধরা পড়েছে শিখার ইঁদুর কলে। এই কল থেকে বেরোতে হবে মনের জোরে। শিখাকে সে মারতে পারবে না। শিখাকে সে ছাড়তেও পারবে না। এরই নাম কি ভালবাসা!

রুদ্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনে একটা ফালি টেবিল। এলোমেলো বাসনপত্তর। টেবিলের তলায় একটা কেরোসিনের টিন। আজ কি বার! কত সাল! রুদ্র খেয়াল করার চেষ্টা করল। বছর কিরকম ঘন, পোড়া মোবিলের মত একটু একটু করে গড়াচ্ছে! আর কি কিছু হবে! ফিরে আসবে জীবনের সুখের দিন। অমলিন শৈশব। স্বপ্ন দেখার কৈশোর। প্রেমের যৌবন।

কে এক নিশাচর বিশ্রী রকম কাশতে কাশতে চলে গেল। দূর থেকে তার ভীষণ কাশির শব্দ ভেসে আসছে এখনও। একটু পরেই আবার সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে সরু তারের মত ফিনফিনে বাতাস ঢুকছে খোলা জানলা দিয়ে। একটা সসপ্যানের ওপর ইঁদুর উঠেছিল। প্যানটা নেচে উঠল। অদৃশ্য কোণ থেকে একটা টিকটিকি কিটকিট করে উঠল ।

সুন্দরী লেন এখন একেবারেই অচৈতন্য। গভীর, গভীর নিদ্রায় ! এমনকী আজ কুকুরগুলোও ডাকতে ভয় পাচ্ছে। রাধামাধব মন্দিরের টিমটিমে আলোটাও নিবে গেছে। সেবিকা সামনের রকে একটুকরো তেরপলের ওপর শুয়ে আছেন। আজকাল সহজে ঘুম আসতে চায় না। এপাশ, ওপাশ করতে করতে একটু যা-ও বা এলো, দেখতে দেখতে ভোর। উঠে পড়ার তাগিদ।

সেবিকা শুযে আছেন সামনের আকাশের দিকে চোখ রেখে। সতের নম্বর বাড়ির জানলা খোলা। এত রাতেও আলো জ্বলছে। শিল্পীর বাড়ি। শিল্পীদের রাত নেই। মেয়েটা কোনওদিন শেষ রাতেও ফেরে। ঘুম আসে না সেবিকার। রাধামাধব ! তুমি কত কি-ই না দেখালে প্রভু। এ পাড়ায় এখন এমন মানুষ আছে যে মাঝে মাঝেই রাত নিশুতি হলে তার কাছে আসে কু-প্রস্তাব নিযে। সেবিকা মনে মনে হাসেন, আর তার রাধামাধবকে বলেন—বাঁশীটি আড়ে নিয়ে বাঁকা হয়ে আছে প্রভু। পৃথিবীর কিছুই তুমি দেখছ না। একেবারে এলে দিয়েছ। কোথায় মন্দিরে আসবে তোমার খোঁজে, না ছুটে এসেছে দেহের খোঁজে। মানুষের মুখে আগুন।

সতের নম্বর বাড়ির খোলা জানলায় আলোটা হঠাৎ খুব জোর হয়ে উঠল। বাবা এত রাতে উনুনে আগুন পড়ল। এরপর রান্নাবান্না, তারপর খাওযা ! ভোর হয়ে যাবে যে রে। অভিনয় করিস বলে সবই কি অভিনয় ! তেলচিটে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে। বিশ্রী পোড়া গন্ধ। সেবিকা তেরপল ছেড়ে উঠে বসলেন, হায় ঈশ্বর। এ তো উনুনে আগুন নয়। আগুন লেগে গেছে সারা ঘরে। সাপের জিভের মত লকলকিয়ে উঠছে। সারা ঘরে জড়াজড়ি করছে। সর্পমৈথুনের মত। আগুনের আভায় অন্ধকার গলি কাঁপছে।

সকালেই পুলিশ এলো। ওয়্যারলেস লাগানো একটা জিপ। একটা কালো ঢাকা ভ্যান। অনেক লোকলস্কর। গলিটা একেবারে ভরে গেল। অফিসার-ইন-চার্জ মন্দিরের সেবিকাকে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছিল বলুন।'

'আমি দেখলুম ?'

'কি দেখলেন ?'

'জীবনে যা দেখি নি। তখন অনেক রাত। কত রাত তা বলতে পারব না। ওই যে সতের নম্বর বাড়ি। ওই যে জানলা খোলা। এ পাড়ার সবাই ওই বাড়িটাকে বলে নাচমহল। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছিল। আমার তো ঘুম আসে না ভাই। এই এইখানটায় এক টুকরো তেরপল বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে

দেখছি—আলো জ্বলছে। কে একজন দাঁড়িয়ে রইল জানলায়, অনেকক্ষণ ধরে। দেখছি শুয়ে শুয়ে। তন্দ্রামত এসেছে। হঠাৎ মনে হলো চোখের সামনে একটা আলো কাঁপছে। এত আলো। তাকিয়ে দেখি আগুন। ওই ঘরটা যেন জ্বলে উঠেছে। লকলকে শিখা হিলহিল করে নাচছে সারা ঘরে।'

'তারপর ?'

'তা আমি ভাবলুম আগুন লেগে গেছে। আগুন আগুন বলে চিৎকার করলুম। কে শুনবে। গভীর রাতে মেয়েছেলের গলা। হঠাৎ, আকাশ বাতাস কাঁপানো আর একটা চিৎকারে আমি ভাই অবশ হয়ে গেলুম। মেয়েছেলের রাত-চেরা গলা—বাঁচাও। তারপর দেখি কি, সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি মেয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে এই দিকে। আর পেছনে ছুটে আসছে দুটো জ্বলন্ত হাত, সামনে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত এক মানুষ। আমি এমন দৃশ্য জীবনে দেখি নি। মেয়েটা ছুটছে আর চিৎকার করছে—বাঁচাও বাঁচাও। জ্বলন্ত মানুষ প্রায় ধরে ফেলে আর কি। আমি বলছি, জয় রাধা-মাধব বাঁচাও, জয় রাধা-মাধব বাঁচাও। তেরপলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলুম সেই মানুষটার দিকে। পড়ে গেল। পড়ল আর উঠল না। তেরপলের তলায় ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পুড়ে একেবারে অঙ্গার হয়ে গেল।'

'কোথায় সেই মেয়ে ?'

'আমার পুজোর কাপড়টা ওকে পরিয়ে দিয়েছি। সেই থেকে বসে আছে গুম মেরে। মেয়েটা পাথর হয়ে গেছে।'

এই সুন্দরী লেনের অনেক ইতিহাস।

সেই সুন্দরী দাসীর জুড়ি গাড়ির ঘোড়া একবার ক্ষেপে গিয়ে হরেন সাঁতরার মেয়েকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল। সেই মৃত্যু সুন্দরীর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের সেই শুরু। রুদ্রের পুড়ে মরায় পাড়া আবার জেগে উঠল কিছু দিন। এ খুন, না আত্মহত্যা ! থানা পুলিশ খুব হলো। শেষে ঢেউ উঠল, ঢেউ পড়ল। ঘটনা হারিয়ে গেল, ঘটনার স্রোতে।

শুধু রাধামাধবের মন্দিরটি বেশ ঝকঝকে নতুন হয়েছে। পেছনের দিকে একটা থাকার ঘর হয়েছে। কেউ বলে শিখা পুলিশের ভয়ে সেবিকা কিঙ্করী হয়েছে। তা নাহলে স্বামী-খুনের অপরাধে জেল হতো। প্রবীণা সেবিকা বলে, 'শিখা, যে যা বলে বলতে দে। প্রথম প্রথম অনেকেই আমাকে বলত। আমার সম্পর্কে রটিয়েছিল, ও তো একটা বেশ্যা।'

মানুষের মুখ আর নদীর স্রোত, আপনি বন্ধ না হলে বন্ধ করা যায় না। শিখাই শুধু জানে শিখার কথা। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এক জ্বলন্ত পুরুষ। এক-একবার, বাতাসের সুরে ডাকছে—শিখা, আর মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুন আর নীল ধোঁয়া। অনেকেই প্রশ্ন করেছিল—তোমার স্বামী আগুনে পুড়ছে। তুমি দেখছ। নেভাবার চেষ্টা না করে তুমি ছুটে পালালে কেন ? এর নাম ভালবাসা ! শিখা কোনও

উত্তর চদিতে পারে না। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করে—বুদ্র জ্বলতে জ্বলতে তাকে আলিঙ্গনে বাঁধতে চাইছে। ভালবাসার আলিঙ্গন নয়, মৃত্যুর আলিঙ্গন। শিখা ছুটছে। রাত্রিবাস ছিঁড়ে পড়ে গেছে শরীর থেকে।

শিখা বলতে পারে না, স্বামী কে ? সবাই তো কামনার জ্বলন্ত আগুন। নারীর বিধিলিপি সেই আগুনে তিলে তিলে মরা।

মিলিটারি সিন্দুক

তিপ্পান্ন নম্বর বাড়ির সামনে রিকশা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় একটা বাঁদর ঝুলছিল। সাট করে নেমে একটু ভেতরে রাখা একটা চেয়ারের পেছনে উঠে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচোতে লাগল। আজকাল বাঁদর পোষার রেওয়াজ হয়েছে। নিজেদের চেনা সহজ হবে বলে। মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন। যাহা ছিলেন তাহাই আছেন।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে মেটাতে ঘাড ঘুরিয়ে প্রসূন বললে, 'এ বাড়িতে এটা আবার কার আমদানী।' রিকশার হর্নের শব্দে মেজকত্তা বেরিয়ে এসেছিলেন—উত্তরটা তিনিই দিলেন, 'সেজকত্তার আমদানী। জানই তো রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। চলে এসো, চলো এসো, ভেতরে চলে এসো। তোমার জন্যে আমরা সব হাঁ করে বসে আছি।'

প্রসূন ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকছে। ঢুকতে ঢুকতে বলছে, 'তেড়ে এলে কামড়ে দেবে না তো ! যে রকম দাঁত খিঁচোচ্ছে ?'

'ঠাকুরের নাম নিযে চলে এসো। কামড়াবে না, তবে গালে কি ঘাড়েটাড়ে আঁচড়ে দিতে পারে। তেমন হলে চুন আছে লাগিয়ে দেওযা হবে।'

'বাবা সে তো বড় সাংঘাতিক কথা। আমি বরং চলেই যাই। আপনারা যা পারেন করুন।'

মেজর সঙ্গে বাঁদরটার ইতিমধ্যেই বেশ খাতির হয়ে গেছে। গলার চেনটা টেনে ধরে বললেন, 'আমি ধরে আছি, তুমি ঝট করে ভেতরে চলে যাও।'

আজ এই বাড়িতে একটা ব্যাপার হবে। হেলাফেলার ব্যাপার নয়। এই বাড়িতে বিশাল একটা সিন্দুক আছে। সেই সিন্দুকটা আজ খোলা হবে সকলের সামনে। সকলে মানে—এই বাড়ির পাঁচ ভাই, পাঁচ বউ, দুই বোন আর দুই জামাই। ইতিমধ্যেই তের জনের একটি বিশাল দল, বড় ঘরের মেঝেতে থেবড়ে থেবড়ে বসে পড়েছে। প্রসূন এসে গেছে। এইবার তালায় চাবি পড়বে।

সিন্দুকটার একটা ইতিহাস আছে। মিলিটারি সিন্দুক। সিন্দুক আবার মিলিটারি হয় কি করে ? এ বাড়ির কর্তা ছিলেন আর্মি অফিসার। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন অমৃতসরে কামান দাগছিলেন সেই সময় সিন্দুকটা তিনি ব্রিজ কম্পিটিশানে জিতেছিলেন। মিলিটারিতে সব ধেড়ে ধেড়ে ব্যাপার। ভলি চ্যাম্পিয়ানকে হয়তো একটা কামানই উপহার দিয়ে দিলে। ফুটবল চ্যাম্পিয়ানকে তুলে দিলে একটা প্যাটন ট্যাঙ্ক। যা ব্যাটা, রিটায়ার করার পর বাড়ি নিয়ে যা। দেশে গিয়ে সপরিবারে চড়ে হাওয়া খেতে বেরোবি।

এত বড় সিন্দুক সচরাচর চোখে পড়ে না। পুরো একটা পরিবার ভেতরে ঢুকে পিকনিক করতে পারে। যেমন আয়তন তেমনি মজবুত গঠন। শাবল মারলেও ভাঙবো না। চারপাশে মসৃণ স্টিলের পাত। আষ্টেপৃষ্ঠে লোহার গুল বসানো বিপর্যয় এক ব্যাপার। সিন্দুক না বলে দুর্গ বলাই ভালো।

এই সিন্দুক কর্তার সঙ্গে সারা ভারত ঘুরেছে। কাবুল-কান্দাহারে গিয়ে আখরোট, পেস্তা, বাদাম, খেজুর, কিসমিস গর্ভে ধারণ করেছে। দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গিয়ে পোরা হয়েছিল তেঁতুল। চট্টগ্রামে গিয়ে হয়েছিল সুপুরির গুদোম। ঐতিহাসিক সিন্দুক। এক স্বদেশীকে আবার এর ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বেশ কিছুদিন। তিনি এর মধ্যে বসে বসে অঙ্ক কষতেন। পরে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। মন্ত্রী হয়ে এ বাড়ির কর্তাকে রিপাবলিক-ডের কুচকাওয়াজ দেখার পাশ দিয়েছিলেন।

কর্তা যথাসময়ে বললে ভুল হবে, সময়ের কিছু আগেই জরুরী তলব পেয়ে ওপরে চলে গেলেন। সেই তলব এলো মাঝরাতে সোজা হৃদয়ে ; তখন পৃথিবীর সব পোস্ট-অফিস বন্ধ। রেখে গেলেন জাঁদরেল স্ত্রী আর পুত্র-কন্যা। স্ত্রী বেশ কিছুদিন সংসার-সমরাঙ্গনে কুচকাওয়াজ করলেন। যে সব ছেলেরা বিয়ে না করে প্রেম করে বেড়াচ্ছিল তাদের প্রেম চটকে দিয়ে মনোনীতা পাত্রীর পাত্রস্থ করে দিলেন। মায়ের মনোনয়নে তারা মুগ্ধ। প্রেমের বউ আর সরাসরি পিঁড়ে থেকে উঠে আসা বউয়ে তারা বিশেষ তফাৎ দেখতে পাচ্ছে না। সবাই এক। সেই পণ্ডিতমশাইয়ের গল্পের মত—তদ্রূপ, তদবর্ণ, তদগন্ধ। বাড়তি যা, সকলেই আসার সময় বাপের বাড়ি থেকে পরিমাণ মত জিনিসপত্র গুছিয়ে এনেছে। কেউ বেশি, কেউ কম।

মা ঠাকরুণ এই চিড়িয়াখানাটিকে বেশ ম্যানেজ করছিলেন। সবাই বলত, ক্ষণপ্রভার বাঙালী-সার্কাস। নাম ছিল ক্ষণপ্রভা। দেখা গেল প্রভা মেলাচ্ছে না, ক্রমশই বাড়ছে ; তখন পিতামাতার দেওয়া নামের ভ্রম সংশোধন করে ক্ষণ শব্দটি খসিয়ে দেওয়া হলো। প্রভা নামেই তিনি বাকি জীবন ভারতভূমে বিচরণ করে গেলেন। সবাই বলেন, স্বামীর চেয়ে তাব পার্সোন্যালিটি হাজারগুণ বেশি ছিল। কোনওক্রমে অবস্থাটা যদি খোদার ওপর খোদকারি করে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত, অর্থাৎ তিনি যদি স্বামী হতেন তাহলে ফিল্ড মার্শাল হয়ে রিটায়ার করতেন

অবশ্যই। এক ডজন কর্তাকে ধরলে তেরজনের অতালিম প্রাপ্ত একটি ব্যাটেলিয়ানকে তিনি যে কায়দায় চালাতেন তা কোনও জবাব নেই—লা জবাব।

সেজবউ এখন তার স্বামীকে বলে, তোমাদের গোঁফদাড়ি ছাড়া আর কোনও পুরুষের লক্ষণ নেই। এ বাড়ির শেষ পুরুষ ছিলেন মা, তোমরা সব কটা মেনি বেড়াল। ছাপকা ছাপকা লুঙ্গি পরে ভুঁড়ি বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কথাটা উঠেছিল—ইলেকট্রিকের সাপ্লাই লাইন কাটা নিয়ে। বিল জমা পড়েনি বলে লাইন কেটে দিয়ে গেল সি-ই-এস-সির পাওনাদার। এ ঘটনা ছেলেদের আমলেই ঘটল। মেজর ওপর দায়িত্ব ছিল বিলের পাওনা মেটাবার। ভাগাভাগির সংসার। এক ভাই মেটাবে ট্যাক্স। এক ভাই রিপেয়ার করাবে যেখানে যা কিছু ভাঙবে চুরবে। এক ভাইয়ের ঘাড়ে লোক-লৌকিকতা, অতিথি আপ্যায়ন। লাইন কেটে দিয়ে যাবার পর মেজ অমায়িক হেসে বলেছিল—ভুলে গিয়েছিলুম। মেজবউ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করেনি এ কথা। মেজর কৃপণ বলে যৎসামান্য বদনাম আছে। ক্ষণপ্রভার জীবৎকালেও একবার এই ঘটনাই ঘটেছিল। মেজবাবু বিল হাপিস করে দিয়েছিলেন। ইলেকট্রিকের লোক এলেন লাইন কাটতে। ক্ষণপ্রভা এমন তেড়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন, ঠিক আছে টাকা মিটিয়ে দিন। ক্ষণপ্রভা বললেন, দুশো ছাপ্পান্ন টাকা কি মুখের কথা, আমরা কি কালোটাকার কারবারি যে পাশ বালিশের খোল থেকে নোট বেরোবে। কাল সকাল এগারোটার সময়ে তোমাদের দপ্তরে টাকা জমা পড়বে। যদি না পড়ে তখন তোমাদের কাঁচি এনো। ক্ষণপ্রভা সকলকেই তুমি বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর ওই চাঁপাফুলের মত রঙ, স্পষ্ট উচ্চারণ, চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে সাপ্লাইয়ের লাইন-কাটা পার্টি বললে, আমরা তাহলে আসি। ক্ষণপ্রভা বললেন, দাঁড়াও। তারপর এই বিখ্যাত সিন্দুক খুলে বের করলেন ততোধিক বিখ্যাত নারকেল নাড়ুর কৌটো। জিনিসটা তিনি অতি উপাদেয় বানাতেন। ক্ষীরটির দিয়ে সে এক পাগল করা ব্যাপার। ক্ষণপ্রভার হাতের রান্নার লোভে জামাইরা প্রায়ই ল্যাংল্যাং করে সব কাজ ছেড়ে ছুটে আসত। আর এই আকর্ষণেই মনে হয় স্ত্রীদের খুব ন্যাওটা। শোনা যায় বড় জামাই নাকি বউয়ের কথায় ওঠবোস করে। কান ধরে এক পায় সারারাত খাড়া থাকতে পারে। ছোট অতটা নয়। তার কিছুটা 'এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটি' আছে। তবে অষ্টপ্রহর খুব নীতা নীতা করে।

প্রসূন ঘরে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? তোমার জন্যে আমরা সবাই হাঁ করে বসে আছি।' প্রসূন কারণ বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নীতা বলে বসল, 'কি চড়িয়ে এলে বুঝি ?'

প্রসূন ভেংচি কেটে বললে, 'হ্যাঁ, তুমি তো আমাকে সব সময় চড়াতেই দেখছ।'

'না চড়ালে পান খেয়েছ কেন ?'

'কি আশ্চর্য, পান খাওয়ার সঙ্গে পান করার কি সম্পর্ক রে বাবা ?'

'খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাবা। তোমার তো আবার টেনসান সহ্য হয় না। আমি মরলে তুমি আগে দৌড়বে বোতলের সন্ধানে।'

বড় জামাই সন্দীপ বললে, 'আমাদের পাড়ার পটলদার মত। বউ খাবি খাচ্ছে। ডাক্তার বললেন, লাস্ট স্টেজ। আর বোধহয় মিনিট পাঁচেক। পটলদা বিছানার পাশ থেকে হাওয়া। ঘণ্টা চারেক পরে ফিরে এলেন টলতে টলতে। হাতে ফুলের তোড়া। জড়ানো গলায় সে কি আবৃত্তি।

সন্দীপ আবার আবৃত্তির হিরো। আজকাল আবৃত্তি শ্রুতিনাটক খুব চলছে। একালের ভাষায় পাবলিক খুব খাচ্ছে। সন্দীপের একটু কবি কবি মেয়েলি চেহারা। এইরকম একটা ঘরভরা জমায়েত সহজে ছেড়ে দেবে। পটলদার আবৃত্তি নিজেই শুরু করে দিল ঃ

> কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
> সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যত দূর
> শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
> 'যেতে আমি দিব না·তোমায়'। ধরণীর
> প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ত তীর
> ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
> 'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।'

সবে—

সন্দীপের স্ত্রী গীতা মুখে জর্দাপান ঠুসে একপাশে বসেছিল গম্ভীর মুখে। আজকের নাটকে সে-ই মুখ্য চরিত্র। ডানগাল থেকে বাঁ গালে পান ঠেলে, ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'তুমি কি পুরোটাই আবৃত্তি করবে ?'

সন্দীপ থতমত খেয়ে বললে, 'আমি কেন করব। পটলদা করেছিলেন,' সন্দীপ একেবারে গ্যালপিং ট্রেনের মত সিগন্যাল টিগন্যাল না মেনে চালিয়ে দিল ঃ

> এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত ছেয়ে
> সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
> গভীর ক্রন্দন—'যেতে নাহি দিব'।

হায়

> তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

গীতা বললে, 'পটলদার বাবা।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আজ মোটেই হাসির দিন নয়। দীর্ঘ এক বছর সকলেই ভীষণ উৎকণ্ঠায় আছে। অনেক জল্পনা কল্পনা, স্বার্থের লোভের টানাপোড়েন আজ শেষ হবে। যেই সিন্দুকের ডালা খোলা হবে, অমনি বেরিয়ে পড়বে সব মালমশলা। প্রভার যাবতীয় সম্পদ। কারুরই স্পষ্ট ধারণা নেই, কি আছে, কি থাকতে পারে। তবে আছে। বেশ কিছু আছে। থাকতেই হবে।

সাবেক কালের অনেক কিছু থাকার কথা। কাঁসার ভারি ভারি বাসন। সেযুগের সব ফলাও ডিজাইনের গহনাপত্র। রুপোর বাসন। সোনার পিলসুজ। এক বছর ধরে, এক-একজনের কল্পনা অনুসারে রকমারি সব জিনিস সিন্দুকে ঢুকে পড়েছে। লোভে সব চোখ চকচক করছে। উৎকণ্ঠায় বুকের ধুকপুকুনি সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এতদিন খোলা হয়নি, সে তবু ছিল ভালো। আজ একেবারে মুখোমুখি। কে ভাগ করবে! কিভাবে ভাগ হবে? মহা সমস্যা। অসম্ভব টেনসান। মা মারা যাবার মিনিট পনেরো আগে চাবিটি বড় মেয়ে গীতার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—'রাখ তোর কাছে। ঠিক এক বছর পর খুলবি। তার আগে নয়।' সকলকে কেন এমন ঝুলিয়ে রেখে গেলেন কে জানে। রীতিমত নাটক! গত এক বছর রোজ রাতে জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রী মশারির ভেতর ঢুকে ঘুম না আসা পর্যন্ত ক্ষণপ্রভার নিত্য শ্রাদ্ধ করছে। মৃত্যুর পর মানুষের একবারই শ্রাদ্ধ হয়। ক্ষণপ্রভার মত এমন দৈনিক শ্রাদ্ধ কজনের হয়। আর জীবিত শ্রাদ্ধ হয়েছে বড় মেয়ে গীতার। অ্যা হ্যা, সোহাগের বড মেয়ে। মাকে কি দিয়ে বশ করেছিল কে জানে! আমরা যেন সব বানের জলে ভেসে এসেছি।

নীতা এখনও ভুলতে পারেনি। স্বামীর ওপর তার বিশ্বাস নেই। আজ লড়াইয়ের দিন। রেগুলার ফাইট করে মাল আদায় করতে হবে। আজ একটু সাদা চোখে থাকলে হতো না? নেশা করে পান চিবোতে চিবোতে ঢুকলেন। পেটে দু'পাত্তর পডলেই একেবারে দরাজ দিল, রাজা হরিশচন্দ্র, প্রয়াগের মেলায় রাজা হর্ষবর্ধন। তখন যদি কেউ বলে তোমার বউকে দিয়ে দাও, বাবু অমনি একগাল হেসে বলবেন—নেবে? বেশ তো নিয়ে যাও না। মায়ের একটা হার ছিল, সাত-আটটা দামী পাথর বসানো পেন্ডান্ট। যতদূর মনে পড়ে পুনায় 'আর্মি বলে' মা একবার পরে বাবার সঙ্গে নাচতে গিয়েছিল। খুব ছোট ছিল। তবু চোখের সামনে মায়ের সেই রূপ ভাসছে। এক-একটা রাত ভোলা যায় না। ওই এক রাতেই জীবন নাটকের টিকিটের দাম উসুল হয়ে যায়। সেই আলোর রাত। সুন্দর শহর। বাবা ড্রিঙ্ক করতেন, তবে মাত্রা রেখে। আর খেলেই বাবার ধারালো মুখ টকটকে লাল হয়ে যেত। সিনেমার নায়কের মত দেখাত। সিল্কের শাড়ি পরা মা। পিঙ্ক শাড়ি, পিঙ্ক ব্লাউজ। আঙুলের হীরে বসানো আংটি। গলায় পেণ্ডান্ট। পায়ে সাদা জুতো। মায়ের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কম নয়। তারা কিন্তু মায়ের শরীর ভাঙতে পারেনি। আশ্চর্য কায়দায় মা যৌবন ধরে রেখেছিলেন অনেকদিন। বার্ধক্যে দেখতে হয়েছিল সাধিকার মত।

নীতা বললে, 'কই, তুমি আমার মুখের কাছে হাঁ কর তো।'

প্রসূন বললে, 'কেন, অবিশ্বাস করছ। তোমার সব ভালো, ওই একটাই মারাত্মক রোগ। আমাকে বিশ্বাস করো না।'

'তোমাকে বিশ্বাস। তুমি যে মাল, তা যে জানে সে জানে। মনে নেই, তোমার জন্যে মাকে আমার শেষ দেখা হলো না।'

'আমার জন্যে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমার জন্যে।'

'তুমি তো ইভনিং শোতে অনুরাধা দেখতে চলে গেলে।'

'কেন গেলুম? তোমার জন্যেই তো গেলুম। তুমি এখানে না এসেই ধাপ্পা মেরে দিলে। কন্ডিশান অনেক ইমপ্রুফড্। মিথ্যেবাদী, চিটিংবাজ, অফিস আর বার, বার আর অফিস, এই তোমার জীবনের সার হয়েছে।'

'বার বার করে আমাকে জেরবার করে দিলে।'

সেজগিন্নি বললে, 'কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সময় চলে যাচ্ছে। আজ আবার টি. ভি-তে খুব ভালো বই দিয়েছে।' মেজগিন্নি আর মনের ইচ্ছে চেপে রাখতে পারলে না। ইচ্ছে অনেকটা, ইচ্ছে মানেই আশা, আশা অনেকটা আমাশার মত। চাপতে চাপতে আর চাপা যায় না। উরেব্বাপ বলে বের করে দিতে হয়। শাসন মানে না।

মেজগিন্নি বললে, 'রুপোর বাসনের সেটটা মা কিন্তু আমাকে দিয়ে গেছেন।'

বাস, আর যায় কোথায়? ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল।

সেজগিন্নি বললে, 'তোমাকে দিয়ে গেছেন। সেকথা কে শুনেছে! কে সাক্ষী আছে?'

মেজকর্তা বললে, 'আমি সাক্ষী আছি। মা বললেন, বিয়েতে তুইই সবচেয়ে বেশি ঠকেছিস। কিচ্ছু পাসনি। কাঁসার আর রুপোর বাসন তোরা নিস।'

ছোটকর্তা বললে, 'বাবা, এ যে দেখি বাবার বাবা। তুমি আবার কাঁসাটি যোগ করে দিলে। তোমার কাজ আছে গুরু।'

মেজগিন্নির চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ফোঁস করে উঠল, 'তুমি বিয়েতে সবচেয়ে বেশি ঠকেছ। আমার বাবা হুড়কি দিয়ে বিয়ে দিয়েছে! বেইমান কোথাকার! ফি বছর একবার করে শ্বশুর বাড়ি যাবে, আর দেঁড়েমুসে সব নিয়ে আসবে। আজ বিশ বছর ধরে শুষছ। তবু তোমার হয় না। এবার কিছু পেলে না তো বড়দার সাইকেলটা নিয়ে চলে এলে।'

ছোট ভাই বলে উঠল, 'স্টপ স্টপ। দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ।'

মেজকর্তা, মেজগিন্নির দিকে কষকষে একটা দৃষ্টি হেনে গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রসূন বললে, 'চলে গেল যে? কোরাম হবে তো?'

মেজগিন্নিও কর্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

প্রসূন বললে, 'যাঃ, জোড়ে খসে গেল। দু'জনের কি মিল মাইরি! একেবারে চখাচখি।'

নীতা দাবড়ে উঠল, 'চুপ করো, ভদ্রসমাজে মাতলামি করো না।'

'যাঃ বাবা, মাতলামি হয়ে গেল। দুটো মাত্র জিন খেয়ে এসেছি। আমি কটা পর্যন্ত স্ট্যান্ড করতে পারি জানো?'

'জেনে দরকার নেই। তুমি চুপ করো।'

সেজকর্তা বললে, 'এখন তাহলে কি হবে? মানভঞ্জন পালা।'

ওপাশের ঘরে দড়াম করে খিল তোলার শব্দ হলো। মেজগিন্নির গোঁসা হয়েছে। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছে। দরজা দেবার সময় খেয়াল করেনি, মেজকর্তাও ঘরে রয়েছে। জানলার পাশে টুলের ওপর বসে আছে চুপ করে। বসে বসে ভাবছে, বিশ বছরেও শরমার স্বভাব পাল্টাল না। সম্পর্ক যেন রেডিওর ওয়েভ ব্যান্ড। কাঁটা একচুল এপাশ ওপাশ হলেই স্টেশান কেটে যায়।

শরমা উপুড় হয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। মেজ ফিরে তাকাল। শরমাকে যখনই সে এইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তখনি তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এতখানি বয়স হলো তবু গেল না। জয় করা গেল না, গেল না। সব ঝাড়ফুঁক ভুলে ছুটে যেতে হয়। মেজ ধীরে ধীরে টুল ছেড়ে উঠে শরমার দিকে এগিয়ে গেল। কোমরের খোলা অংশে হাত দিতেই শরমা চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল। স্বামীকে দেখে আবার কাটা কলাগাছের মত বিছানায় উল্টে পড়ল।

মেজ আদুরে গলায় বললে, 'মাথা মোটা। কবে যে আমার বউটার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হবে? আরে বোকা তোমার জন্যে জমি তৈরি করছিলুম। এইটুকু বুদ্ধিও তোমার ঘটে নেই। সব মাটি করে দিয়ে চলে এলে। মা কেন আমাদের দেবেন? তার তো একটা কারণ থাকবে। জোরদার কারণ। হাঁউ হাঁউ করে সব বারোটা বাজিয়ে দিলে। গাধা কি আর গাছে ফলে!'

মেজ বউয়ের পিঠের উপর ঢলে পড়ল। ভীষণ ভালবাসা এসে গেছে। আর লাগাম টেনে ধরে রাখা যাচ্ছে না নিজেকে। এমন সময় দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা। সেজর গলা, 'কি তোমরা আসবে, না আমারই যা পারি করে নোব।'

মেজগিন্নি স্বামীকে পিঠ থেকে পিঁপড়ের মত ঝেড়ে ফেলে তড়াক করে উঠে বসল। বসেই বললে, 'তার মানে আমরা কি মরে গেছি?'

সেজ বললে, 'মরো নি। এত তাড়াতাড়ি মরবেই বা কেন? রেগে গেছ। বিষয়সম্পত্তির ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে আর কি! বয়েসে যা হয়। বৈরাগ্য!'

মেজগিন্নি স্বামীকে বললে, 'কি বেড়ালের মত গায়ের সঙ্গে লেপটে আছ। এই কি সোহাগের সময়। চলো চলো শকুনিরা সব বসে আছে।'

মেজকর্তা জোড়ে সভাস্থলে প্রবেশ মাত্রই প্রসূন বললে, 'খেলা তাহলে শুরু হোক। হাফ টাইম হয়ে গেছে।'

সেজগিন্নি সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'মা আমাকেও একটা জিনিস আলাদা করে দিয়ে গেছেন।'

'কি জিনিস!' সমস্বরে সকলের প্রশ্ন।

মেজগিন্নি প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'সোনার পিলসুজ? আছে না কি?' কর্তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁগা, আমাদের সোনার পিলসুজ ছিল?'

মেজকর্তা নাকে নস্যি ঢোকাচ্ছিল। জোরে নাক টেনে বোকা বোকা মুখে বলল, 'কি জানি!'

শবমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, 'তুমি জানটা কি? নস্যি, ঘুম, আর দাবা। একটা সোনার পিলসুজের দাম জান?'

ছোটগিন্নি বললে, 'তা এত লোক থাকতে মা পিলসুজটা তোমাকে দিলেন কেন?'

সেজগিন্নি সাধিকার মত হেসে বললে, 'আমি একটু পুজোপাঠ করি তো, মা তাই বলেছিলেন ও জিনিস তোমারই কাছে মানায়। আমাদের তিনপুরুষের পিলসুজ।'

মেজগিন্নি বললে—'অ, পুজোপাঠ তুমি একাই করো। তুমিই এ ফ্যামিলির একমাত্র মীরাবাঈ। রোজ এ বাড়ির সন্ধ্যে দেখায় কে? বিশ বছর ধরে শাঁক বাজাচ্ছে কে?'

মেজকর্তা নাকি নাকি সুরে স্ত্রীকে সাপোর্ট করল, 'দ্যাকো না? যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। এ বাড়িতে দীক্ষা তো শুধু তোমারই হয়েছে। কত বড় গুরুর শিষ্য তুমি।'

সেজগিন্নি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—'দীক্ষা হলেই সব হয়ে গেল। দীক্ষা তো আজকাল করপোরেশনের টিকে দেবার মত। এক-এক লট ধরে আর দাগ দেয়। কোনওদিন তো পাঁচ মিনিটের জন্যেও জপধ্যান করতে দেখি না।'

মেজগিন্নি সুর করে বললে, 'দেখবে কি করে, আমি যে অজপা করি।'

প্রসূন বললে, 'বাবা সে আবার কি? সিন্দুক থেকে কি বেরোবে জানি না, তবে তোমাদের ভেতর থেকে যে সব মাল বেরোচ্ছে।'

সেজগিন্নি বললে, 'আমরা স্বামী পরমানন্দের বংশধর। আমাদের রক্তে ধর্ম বিজবিজ করছে।'

সন্দীপ বললে, 'এ ভাবে তো হয় না। শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে।'

প্রসূন বলল, 'আমার ভাই একটা জিনিসেই লোভ। নীতার মুখে শুনেছি, দেখিনি কোনও দিন। শ্বশুর মশাইয়ের একটা রুপোর "পেগ মেজার" ছিল। ফ্রান্সের তৈরি। তোমরা কেউ মালমশলা খাও না। তোমাদের কারুর কাজে লাগবে না, ওটা ভাই আমাকে দিও।'

'হ্যাঁ দেওয়াচ্ছি।' নীতা হুঙ্কার ছাড়ল। 'এতকাল বাইরে বাইরে হচ্ছিল, এইবার বাড়িতে বোতল ঢুকবে। ছুতো পেয়ে যাবে। তোমার বোতল আমি ঘুচিয়ে দোব।'

'বোতলের সঙ্গে তোমার এমন ভাসুর ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক কেন? এও এক ধরনের অ্যালারজি।'

সন্দীপ হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বললে, 'সকলেরই সময়ের দাম আছে। আপনারা যা শুরু করেছেন তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

ছোট ভাই বললে, 'সিন্দুক খোলার আগে আমি জানতে চাই ভাগাভাগিটা কি-ভাবে হবে। কে করবে, কেন করবে, কি জন্যে করবে। মা আমাকে একটা স্কুটার কিনে দেবেন বলেছিলেন। বলেছিলেন, টাকা রাখা আছে। আমার বারো থেকে চোদ্দ হাজার টাকা চাই। আজই চাই, এখুনি চাই।'

মেজভাই বললে, 'এ সব কথা তুই কাকে বলছিস ? কে তোকে দেবে ?'

'এই তো পথে এসো। আমারও তো সেই একই প্রশ্ন, কে দেবে, কি বেসিসে দেবে। সিন্দুক তো আর দেবে না।'

প্রসূন বললে, 'সব বের করে একটা লিস্ট করা হোক। তারপর নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় এসে ভাগাভাগি করে নিলেই হয়।'

সেজ বললে, 'সে ধরনের বোঝাপড়ায় আসতে হলে শুধু লিস্ট করলেই চলবে না, প্রত্যেকটা জিনিসের ভ্যালুয়েশান করতে হবে। সব জুড়ে যত টাকা হবে, সেইটাকে এইবার সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।'

মেজ বললে, 'সমান মানে ! সমান ভাগ হবে কেন ? গীতা আর নীতা একটা পার্সেন্টেজ পাবে। ওদের তো সব বিয়ে হয়ে গেছে।'

গীতা বললে, 'বিয়ে হলেই হয়ে গেল। মা-বাপের বিষয় সম্পত্তিতে মেয়েদেরও সমান অধিকার।'

মেজ অদ্ভুত একধরনের হেসে বললে, 'বলে বটে, তবে কোনও মেয়েই সেভাবে দাবি করে না। আর করবেই বা কেন, তাদেরও তো একটা চক্ষুলজ্জা, ভদ্রতা আছে।'

নীতা বললে, 'আমাদের নেই। আমরা সমান ভাগ চাই।'

ছোট বললে, 'ব্যাপারটা তাহলে কোর্টকাছারির দিকেই চলল। সেই ভালো। সিন্দুকটা তাহলে না খোলাই ভালো।'

সন্দীপ বললে, 'কোর্টকাছারি ? সে তো বিশবাঁও জলে গিয়ে পড়া। তার চেয়ে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে তার নির্দেশ মতো ভাগাভাগি করে নেওয়াই ভালো।'

ছোট বললে, 'নির্বাচন মানেই তো ভোট। ভোট মানেই রাজনীতি। এ বাড়িতে একমাত্র আমিই অ্যাকটিভ পলিটিক্স করি, বাকি সবাই তো মেনিমুখো ম্যাদামারা। নেতা হতে হলে আমাকেই হতে হয়।'

মেজ বললে, 'এ তোর রাজনীতি নয়। এসব ব্যাপারে চিরকাল যা হয়ে আসছে তাই হবে। বড় যে সেই নেতা হবে, তার কথা মতই সব হবে। শাস্ত্র কি বলে জানিস, পিতার অবর্তমানে নেকস্ট যে ছেলে বড় সে-ই পিতার মত। বড়দা নেই। আমি আছি। তার মানে আমিই এখন পিতার মত। আমি সিন্দুকটা খুলব। যখন খুলব তখন ঘরে কেউ থাকবে না। এক-এক করে সব বের করে সাজিয়ে আমি ডাকব, তখন সবাই আসবে। আমি আমার খুশিমত এক-এক করে যাকে যা দোব, তাইতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে সরে পড়বে।'

'আহা রে!' নীতা সুর করে বলে উঠল। 'কি আনন্দ মেজদা! আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। পিতার অবর্তমানে তোমার আব পিতা হয়ে কাজ নেই। আমরা অনাথই থাকতে চাই। তাইতেই আমাদেব আনন্দ।'

মেজগিন্নি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মামলা হাতে নিযে জাঁদরেল ব্যারিস্টারের মত এগিয়ে এলো। গম্ভীব মুখে বললে, 'ঠাকুরঝি বিষয় সম্পত্তি বড, না সম্পর্ক বড? মেজদা তোমাদের চেযে অনেক বড, তার একটা মানসম্মান আছে। সকলের সামনে তুমি তাকে এইভাবে অপমান কবলে?'

নীতা বললে, 'বেশ করেছি। মেজদা দেশে গিযে ধানজমি বিক্রি কবে এলো। সেই টাকা কোথায়?'

'সে টাকা তোমার মেজদা গুনে গুনে সব মাযেব হাতে তুলে দিযেছে।'

'ছটা ডিসি ফ্যান বিক্রি কবার টাকা কোথায় গেল?'

'সে টাকাও মাকে দেওযা হয়েছে!'

'এই বাডি তৈবির পর পাঁচ হাজাব ইঁট, বিশ বস্তা সিমেন্ট বেঁচেছিল। সেই ইঁট-সিমেন্ট বিক্রিব টাকা কোথায গেল?'

'সব মাযের হাতে তুলে দিযেছিল।'

নীতা খিল খিল কবে হেসে বললে. 'ভালো টেকনিক। মা তো নেই, সবই এখন মাযেব কাছে। প্রমাণেব আব কোনো উপায নেই।'

প্রসূন বললে, 'কি ছোটলোকমি হচ্ছে নীতা। তোমার তো লোভ ছিল না। হঠাৎ লোভী হযে উঠলে কেন?'

'তুমি থামো? বেশি বোকো না, তোমাব দামী নেশা চটকে যাবে।'

মেজগিন্নি বললে. 'তোমাব বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'মেজদা যদি দিযেই থাকে সব টাকা, তাহলে সিন্দুকে থাকবে।'

মেজকর্তা বেশ বড এক টিপ নস্যি টেনে বললে, 'সেটা আমাদেব জানার কথা নয়। সে জানবে মাযেব পেযারেব মেযে গীতা। যত প্রাণেব কথা ওর সঙ্গেই হতো।'

মেজ একটা চাল চালল। পুরো সন্দেহটা ঘুবিযে দিতে চাইল বোনেব দিকে। সিন্দুকের চাবি গীতার কাছে। গীতা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সে টাকা সিন্দুকে নেই। আছে ডানকুনিতে।'

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'ডানকুনিতে? সেখানে কে আছে?'

মেজব মুখ শুকিযে গেল। স্ত্রীর দিকে করুণ চোখে তাকাল।

গীতা বললে, 'ডানকুনিতে কে আছে? মেজদার তিন কাঠা জমি আছে।'

প্রসূন বললে, 'তাই নাকি। মেজদা তাহলে ল্যান্ডলর্ড।'

ভাইয়েরা গুঞ্জন কবে উঠল, 'মেজদা, তুমি জমি কিনেছ? কই আমাদের জানাওনি তো?'

মেজ আমতা আমতা করে বললে, 'জানিসই তো চিরকালই আমি প্রচারবিমুখ। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে পারি না।'

' ছোট ভাই বললে, 'তা আব জানি নে। একেই বলে সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটাব।'

মেজগিন্নি বললে, 'কেউ যদি নিজেব টাকায় জমি কেনে, কিছু বলাব আছে। কেউ মদ খেয়ে টাকা ওড়াচ্ছে আর কেউ সঞ্চয় করে কবে তিন কাঠা জমি কিনেছে। অন্যাযটা কি হয়েছে! এতে হিংসে কবাব কি আছে।'

নীতাকে ঠেস মাবা হলো। নীতা না বেগে বললে, 'হিংসে নয়, সন্দেহ। আজকাল জমি কেনা সহজ নয়। মেজদাব যা বোজগাব তাতে সংসার চালিয়ে দুম করে জমি কেনা যায় না।'

মেজকর্তা হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, 'টাকাটা যদি মেরেই থাকি, বেশ কবেছি। কাব বাপের কি?'

সন্দীপ বললে, 'হোল ব্যাপাবটা ক্রমশই নোংবামিব দিকে চলে যাচ্ছে।'

ছোট ভাই বললে, 'তা তো যাবেই। জাযগা-জমি, বিযয-সম্পত্তি খুব একটা পবিষ্কাব জিনিস নয।'

সন্দীপ বললে, 'গীতা, তুমি চাবিটা ফেলে দাও। আমরা এইবাব চলে যাবো। তোমাব এত ইনটারেস্ট কিসেব। এই পিঠে-ভাগ তোমাব ভালো লাগছে?

সেজভাই বললে, 'পালালে চলবে না। মাল ভজিয়ে দিয়ে যেতে হবে। তা না-হলে আমাদের সন্দেহ হবে!'

গীতা বললে, 'কিসেব সন্দেহ!'

'মাল না মিললেই মনে হবে তুই ঝেড়ে দিয়েছিস?'

'না মিললে। মানে, কিসের সঙ্গে মেলাবে? ক্যাটালোগ আছে?'

'লেখা নেই, তবে মাথায আছে। আমাদেব প্রত্যেকেব মাথায আছে। এই ছিল, ওই ছিল, যেমন শুনেছি মাযেব একটা হীরেব আংটি ছিল। একজোড়া নীলা-বসানো সোনাব সাপ-তাগা ছিল।'

প্রসূন বললে, 'এ সব কেউ দেখেছে কোনও দিন?'

'এ তো দেখাব জিনিস নয, শোনার জিনিস, কানাকানিব জিনিস।'

'তাহলে কানেই থাক না, চোখে দেখার প্রয়োজনটা কি? সিন্দুকটাকে আরও ভালো কবে সিল কবে চাবিটা গঙ্গায বিসর্জন দেওয়া হোক।'

ছোট বউ বললে, 'সেই ভালো। এই নিয়ে অনেকদিন ধরে জল ঘোলা হচ্ছে। মন কষাকষি, মুখ ভাব, বাঁকা-চোরা কথা।'

সন্দীপ বললে, 'আর একবাব ইন্টারভ্যাল হোক, আমরা এক কাপ করে চা খেয়ে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নি।' সকলেই একমত, বেশ তাই হোক। সেজ আর ছোট বউ চা করতে চলে গেল। মেজকর্তা বললে, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, সেই নকশাল আন্দোলনের পর থেকে ছোটরা আর বড়দের তেমন মানতে চায় না। বয়েসের সম্মান দেশ থেকে উধাও। মূর্তির মাথা কাটছে, শিক্ষকদের ধরে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাছা খুলে দিচ্ছে। আমি সেই কারণেই

ধাবদেনা করে সেই ডানকুনিতে একটুকরো জমি কিনে ফেললুম। খাই-না-খাই, শেষজীবনটা শান্তিতেই থাকা যাবে বাবা।'

প্রসূন বললে, 'ভালো করেছেন। এ বাড়িতে গ্যাঞ্জাম ক্রমশ বাড়বে। সকলের সংসার বড় হতে শুরু করেছে।'

'আবে ভাই, এখনই বাথরুমে লাইন লাগাতে হয়।'

সন্দীপ বললে, 'এ বাড়ির অংশটা কি করবে!'

'ভাইদেব মধ্যে যে কিনতে চায়, তাকে বেচে দেবো!'

'যদি না চায়।'

'চাইতেই হবে। নয়তো বাইরের ভাড়াটে ঢুকে পড়বে।'

'আপনাব অনেক প্যাঁচপোঁচ জানা আছে, মেজদা।'

মেজকর্তা প্রশংসা ভেবে মুচকি মুচকি হেসে জোরে জোরে নস্যি টানতে লাগল। কাপ কাপ চা এনে হাতে হাতে ঘুরে গেল। ঘর উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ। এইবার সিন্দুক খোলা হবে। গীতার হাতে সোনালী রঙেব সেই লোভনীয় লম্বা চাবি দুলছে! চাবি আড়াই পাক ঘুরলেই খুলে যাবে সিন্দুকের জগৎ। দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষাব অবসান।

গীতা জানলার ধার থেকে সিন্দুকের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে বললে, 'আমি তাহলে খুলছি এবার।'

সকলে টান টান। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। মেজকর্তা নস্যির দীর্ঘতম টানটি সমাপ্ত করে পাজামার পিছনে আঙুল মুচছে। গীতা সিন্দুকের মাথাটা তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছিল!

মেজ বললে, 'ঝাড়াঝাড়ি পরে হবে।'

সেজ বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খোলার পর ঝাড়াঝাড়ি, ঝাড়পিঠ তো হবেই।'

সময়টা ভারী সুন্দর। সূর্য সবে অস্ত গেছে! আকাশ লাল! পাখি ফিরছে বাসায়। এই রকম সময়েই ক্ষণপ্রভাও ফিরে গিয়েছিল তাঁর আবাসে। মায়ের কথা এদের আর তেমন মনে পড়ে না। মা এখন সিন্দুক।'

গীতা সিন্দুকটাকে প্রণাম করতে করতে বললে, 'এ ঝাড়াঝাড়ি, সে ঝাড়াঝাড়ি নয়। এ হলো ধুলো ঝাড়া। তোমরা কেউ ধুলোটাও তো ঝাড় না।'

প্রসূন বললে, 'ধুলো ঝেড়ে কি হবে! ঝাড়তে হলে সোনাদানাই ঝাড়া ভালো।'

সন্দীপ বললে, 'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।'

গীতা চাবি ঢোকাচ্ছে। সবাই চুপচাপ। চাবি ঘুরছে। এক, দুই, আধ। ডালাটা জীবন্ত প্রাণীর মত লাফিয়ে উঠল। ক্ষণপ্রভার ঘুম ভাঙছে।

গীতা সকলের দিকে তাকিয়ে অনুমতি নিল, 'খুলি তাহলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি কেন?' আর ধৈর্য নেই। এক বছরের ধৈর্যের বাঁধ এইবার ভেঙে পড়েছে। ডালাটা বেশ ভারি। খোলার সময় তিনটি কব্জা, তিনটে

চড়াইয়েব মত তিনবার কিঁচ করে উঠল। অদ্ভুত একটা পুরনো গন্ধ হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। প্রাচীনের গন্ধ আছে। ডালাটা সম্পূর্ণ সোজা হবার সময় আর একবার শব্দ হলো। ক্ষণপ্রভার কণ্ঠস্বরের মত—'কি রে, তোরা ভালো আছিস?'

দুই জামাই ছাড়া আর সবাই ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে গেল সিন্দুকের কিনারায়। চারটে ধার নেমে গেছে গভীরে। অন্ধকার ছলছল করছে।

কে একজন বললে, 'টর্চ, একটা টর্চ।'

কে একজন বললে, 'টর্চ লাগবে না। ওই দেয়ালের আলোটা জ্বেলে দাও।'

গীতা এই ফাঁকে কখন সরে এসেছে। তিন ধারে ছেলে আর বউয়েরা গুঁতোগুঁতি করছে।

মেজ বললে, 'কই কি-আছে? কিছুই তো দেখছি না।'

সেজ বললে, 'একটা টিনের বাক্স পড়ে আছে তলায়' নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল।

মেজ বললে, 'উঁহু উঁহু, আমি তুলবো, আমি। সব কিছুরই একটা শাস্ত্র আছে।'

মেজ ক্ষিপ্রগতিতে নিচু হলো। মাথাটা ঠুকে গেল ডালায়। সামনে তেমন চুল নেই। অন্য সময় হলে এই লাগাতেই উঃ করে উঠত। এখন আর দেহবোধ একেবারে নেই বললেই চলে।

মেজ দুহাতে মাঝারি মাপের চৌকো একটা টিনের বাক্স তুলে আনল। 'টফি' ছিল কোনওকালে। ঢাকনায় নিষ্পাপ একটি শিশুর হাসি হাসি মুখ।

সমস্বরে সকলের প্রশ্ন, 'কিছু আছে? কিছু আছে? খোলো খোলো।'

ধীরে ধীরে মরচে পড়েছে। ঢাকনা সহজে খুলছে না। মেজ স্ত্রী-কে বললে, 'তোমার আঙুলে তো বড় বড় নখ।'

সবাই হই হই করে উঠল। 'আমাদেরও নখ আছে, আমাদেরও নখ আছে।'

মেজগিন্নির হাতে বাক্স। একমুখ হেসে বললে, 'আমার নখ সবচেয়ে বড়!' মেজগিন্নি বাক্সটা নিজের কোলে ফেলে বাক্সর ঢাকনা খুলেই ভয়ে 'ওমা' করে উঠল। চারপাশ থেকে ঘিরে এলো সবাই। ভেতরে নীল একটুকরো ভেলভেট। তার ওপর পাশাপাশি পড়ে আছে দুপাটি বাঁধান দাঁত। হাসছে। ক্ষণপ্রভার দেহহীন খিল খিল হাসি।

জেনারেটার চলতে চলতে থেমে গেলে যে ধরনের অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা নেমে আসে, সারা ঘর সেই রকম থমথমে। জেলির মত সব থক-থকে মুখ। মেজগিন্নির, কোলে বাক্স। সেই বাক্সে নীল ভেলভেটের ওপর দু'পাটি সাদা দাঁত অনন্তের হাসির মত ঝকঝক [illegible]